ছোটদের নাট্যসম্ভার



প্রথম খণ্ড

ছোটদের নাট্যসম্ভার

পরিবেশনা
মডেল পাবলিশিং হাউস
২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭০০ ০৭৩

প্রথম প্রকাশ : ফাল্গুন ১৩৮৬। প্রকাশক : সমবায় প্রকাশনী। পরিবেশনা : মডেল পাবলিশিং হাউস, ২এ, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট, কলিকাতা-৭৩। মুদ্রাকর : জি. শীল, ইম্প্রেসন প্রবেলম, ২৭এ তারক চ্যাটার্জী লেন, কলিকাতা-৫। প্রচ্ছদ ও অলংকরণ : খালেদ চৌধুরী। পঁচিশ টাকা।

CHOTODER NATYA SAMBHAR
(a collection of drama for Juvenile)
Rs. 35.00 only

সম্পাদনা

জ্যোতিভূষণ চাকী

সমীর চট্টোপাধ্যায়

আমাদের ছোট্ট বন্ধুরা

নাটক কে কে করতে চাও ?

এ প্রশ্নের জবাবে কোনো ক্লাসে সবাই হাত তোলে, আর সে হাত তোলা শুধু সম্মতিসূচক 'মাইম' থাকে না, তার সঙ্গে থাকে সমস্বর 'আমি স্যার' ধ্বনি। তাই না? আমরা ওকথা খুব ভালো করে জানি, কারণ আমরা দুজনেই শিক্ষক—অর্থাৎ তোমাদের খুব কাছে থেকে তোমাদের জানবার বোঝবার সুযোগ পাই। কোনো অনুষ্ঠানের জন্যে ছোট্ট ছোট্ট মাঝারি বড়ো বিভিন্ন দৈর্ঘ্যের নাটক বা নাট্যনকসা যে কত জরুরি তা আর বলবার নয়। এই প্রয়োজনবোধ থেকেই আমরা তোমাদের জন্যে এই নাট্য-সংকলনের কাজে হাত দিয়েছি। পুরনো আর নতুন লেখকদের নাটক নিয়েই। 'ছোটদের নাট্যসম্ভা'রের দুটি খণ্ড পরিকল্পিত।

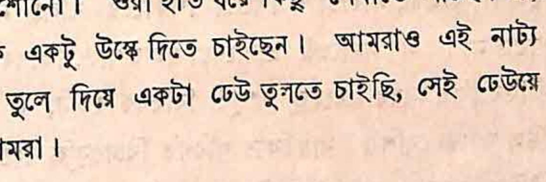
নাটক লেখা অবস্থায় তো আলো নেভানো-দীপ। অভিনয়েই আলো।

দুটি ওয়ার্নিং বেল্‌ই পড়ে গিয়েছে। অডিটোরিয়মের আলো নিভল, ঐ সিন্ উঠছে, ষ্টেজের আলো জ্বলল। এবারে শুরু হবে নাটক। কী রোমাঞ্চ! তাই না? যে যা আসলে নয় সে তাই হয়ে উঠেছে। হাসছে, কাঁদছে, আমরাও হাসছি কাঁদছি। কিছুক্ষণের জন্য ভুলে যাচ্ছি সব, ঐ নাটকের চরিত্র-গুলোর সঙ্গে এক হয়ে যাচ্ছি। নাটক যে আমাদের এত ভালো লাগে তার কারণ এ আমাদের ভেতরের জিনিস একেবারে স্নায়ুতে মজ্জাতে মিশে আছে। চার পাঁচ লক্ষ বছর আগে, যখন মানুষের মুখে কথাই ফোটেনি তখনও মানুষ অভিনয় করেছে। একদল সেজেছে শিকারী আর কেউ বা সেজেছে বাইসন, বাইসনের চামড়াটা পড়ে নিয়েছে সে। পালানোর চেষ্টা করছে বাইসন, কিন্তু শিকারীরা তাকে ঘিরে নাচছে। (এই নৃত্য এবং নাট্য কথাদুটো কিন্তু খুব ঘনিষ্ঠ)। তারপর, বর্শা দিয়ে তাকে মারবার অভিনয়। বাইসন-সাজা মানুষটিও মাটিতে পড়ে চিৎ-পটাং। সেই আদিকাল থেকে আজকের দিন পর্যন্ত নাট্যধারা বয়ে এসেছে। সে ধারা পুষ্ট হয়েছে নানা মানুষের ভাবনা চিন্তা আর প্রয়োগ কৌশলে।

এই প্রচণ্ড ঘোরালো মাধ্যমটাকে তোমরা পড়াশোনার সঙ্গে অনায়াসে জড়িয়ে ফেলতে পার। ক্লাসে পড়া হচ্ছে 'মেজদা'। দরকার কী নীরস রিডিং আর ইমপর্ট্যান্ট পোর্শন দাগানোর। চরিত্রগুলোকে রূপ দিতে উঠে দাঁড়াও। যতীনদা আসুক, আসুক ছিনাথ বহুরূপী। শুরু হোক মেজদার গোঙানি। ভট্‌চাজ মশাইকে জড়িয়ে চোর চোর বলে চেঁচাক দারোয়ান। নাটক উঠুক জমে। মনের উপর সংলাপগুলো কেটে বসে যাবে, মুখস্থ করার দরকারই হবে না। আমরা নাটককে করে তুলতে চাই spontaneous বা স্বত-উৎসারিত। বাইরে ঝড়-জল, বেরুবার উপায় নেই। ক্ষতি কী? ভাইবোন, বাবা-মা মিলেই একটা ছোট্ট নাটক করে ফেল না কেন? বিষয়? হাত বাড়ালেই বিষয়। চোখ কান খোলা থাকলে প্রতিমুহূর্তেই নাটক, আর বিচিত্র সংলাপ।

আমরা যে নাটকগুলো তোমাদের উপহার দিলাম সেগুলো কিছু উদাহরণ মাত্র। তোমরা অনুপ্রাণিত হয়ে নিজেরাই নাটক লেখ এই আমরা চাই। একটু বেশি আগেই বলে রাখি তোমাদের লেখা নাটক নিয়েও একটা সংকলনের কথা ভেবেছি আমরা।

নাটকে লেখো, নাটক দেখো, নাটক করো। এই নাটক বা নাটকের নানা অঙ্গ নিয়ে যাঁরা ভাবেন এই রকম কয়েকজনের সঙ্গে তোমাদের মুখোমুখি করিয়ে দিচ্ছি। তাঁরা কী বলেন শোনো। ওরা হাত ধরে কিছু শেখাতে যাচ্ছেন না, তোমাদের কল্পনা শক্তিকে একটু উস্কে দিতে চাইছেন। আমরাও এই নাট্য সম্ভার তোমাদের হাতে তুলে দিয়ে একটা ঢেউ তুলতে চাইছি, সেই ঢেউয়ে ময়ূরপঙ্খী নাও ভাসাবে তোমরা।



মঞ্চ

খালেদ চৌধুরী

প্রাগৈতিহাসিক মানুষের জীবনে নাচ ও গান এসেছিল, তার আনন্দ প্রকাশের তাগিদে। কোন অতিকায় পশুকে শিকার করে, প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইয়ে জিতে মানুষ তার নিজের শক্তির গর্বে উৎফুল্ল হয়ে উঠত। সেই আনন্দকে ধ্বনি ও ছন্দে প্রকাশ করতে গিয়ে সে নৃত্য-গীতের সম্পদ আবিষ্কার করেছিল। ছন্দ রক্ষার তাগিদে সে ক্রমে ক্রমে পাথর ঠুকে আওয়াজ করতে শেখে, পশুর শিঙ দিয়ে শিঙা বানায়, পশুচর্মে ভেরী বা ড্রাম বানায়। পশুর অন্ত্র শুকিয়ে দড়ির মত পাকিয়ে ছিলায় পরিয়ে টঙকার দিয়ে তারের যন্ত্র আবিষ্কার করে। এই নৃত্য-গীতে সমগ্র সমাজই অংশগ্রহণ করত, আনন্দে সকলেই ভাগ নিত। তখনও অংশগ্রাহী ও দর্শকের ভেদ স্পষ্ট হয়নি। কিন্তু অনুমান করা যায়, তখনও দর্শক ছিল। বৃদ্ধেরা, নারীরা ও শিশুরা শিকারের বলিষ্ঠ নাচে অংশ গ্রহণ করতে পারত না। সব সমাজেই প্রবীণেরা সমাজপতি, বিশেষত আদিম সমাজে নিয়ম নীতির বিধিনিষেধ যেহেতু সম্পূর্ণ বিধিবদ্ধ হয়নি, সেইহেতু প্রবীণদের ক্ষমতা ছিল আরো বেশি। বার্ধক্যের পরিণত বিচারবুদ্ধি দিয়ে এরা সমাজ শাসনের নীতির সঙ্গে সঙ্গেই ইস্থেটিক বা সৌন্দর্যতত্ত্বের নীতিও নির্ধারণ করেছেন। এরাই হয়তো প্রথম নৃত্যের পদপাতকে নিয়ম বদ্ধ করে আদিম কোরিওগ্রাফি এনেছেন, ব্যক্তিগত এবং সমষ্টিগত দেহ সঞ্চালনে ভয় বা জয়ের আনন্দের নির্দিষ্ট প্রতিরূপ এনেছেন, নৃত্য পরিকল্পনায় ইস্থেটিক চিন্তা এনেছেন। এই প্রবীণেরা এরই মধ্য দিয়ে নিজেরাও সমালোচকের দৃষ্টি আয়ত্ব করেছেন। এইভাবেই আদিম গোষ্ঠিগত অনুভূতির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশ কালে রিচুয়াল্‌স্‌ এ পরিণত হয়ে ক্রমে শিল্পের আকার পেয়েছে। এই সমগ্র বিবর্তনই কিন্তু অনুমান সাপেক্ষ। অবশ্য প্রায় একই ধরনের আর একটি বিবর্তনের ঐতিহাসিক নজির আছে, গ্রীসে ডায়োনিসিয়াক রিচুয়াল থেকে অপেরার বিবর্তনে। জানা গেছে, মদ ও ফলনের দেবতা ডায়নোসিয়াসের উপাসনায় বিকৃতি আসে, সমাজবিধির মাত্রা লঙ্ঘিত হয়। তখন প্রবীণেরা হস্তক্ষেপ করে রিচুয়ালকে আরো কঠিন নিয়মে

বাঁধেন। তাঁরাই এতে সাধারণের প্রবেশ নিষিদ্ধ করে দেন, এই উপাসনার আচার অনুষ্ঠানে কেবল নির্দিষ্ট উপাসকেরাই অংশ গ্রহণের অধিকার পান, সাধারণ মানুষ দর্শক হয়ে পড়েন। এইভাবেই একটা পর্বে অংশগ্রাহী ও দর্শকের ভেদ স্পষ্ট হতে থাকে। অংশগ্রাহী ও দর্শকের মধ্যে এই ভেদ সৃষ্টির ইতিহাসে কত ঘটনা ঘটেছে, তা আমাদের জানা নেই। অনুমান করা যায়, শিকারজীবী জীবনযাত্রায় পশুপালন ও কৃষিকর্মের অনুপ্রবেশ ঘটবার সঙ্গে সঙ্গেই সমাজে শ্রম বণ্টন আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে। সমাজে যারা কৃষিকর্মে নিযুক্ত যাঁরা পশুপালনে ব্যস্ত, যারা এখনো শিকারে যান, এই প্রত্যেকটি শ্রেণীর নৃত্য এবার নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট হয়ে যায়। শিকারীদের নৃত্যে কৃষকেরা দর্শক হয়ে পড়েন কৃষকদের নৃত্যে শিকারীরা দর্শক হয়ে পড়েন। দর্শকদের সংখ্যা বেড়ে যায়। শুধু তাই নয়, এক শ্রেণী দর্শকরূপে অন্য শ্রেণীর নৃত্যের বৈশিষ্ট লক্ষ্য করেন, নিজেদের নৃত্যের স্বাতন্ত্র্য সম্পর্কেও সচেতন হয়ে ওঠেন। এই আত্মসচেতনতার পথেই কলা-কৌশলের মূল্য স্বীকৃতি পায়। মশালের আগুনে দেহ ও ছায়ার কম্পোজিশানে নৃত্যের চরিত্র গভীরতা পায়, দর্শকের চোখও প্যাটার্ণ ও ছন্দবোধ আসে।

অংশগ্রাহী ও দর্শকের মধ্যে এই ভেদ প্রতিষ্ঠা হতেই অংশগ্রাহীদের পক্ষে যেমন দেখানো ও শোনানোর দায় এসে পড়ে, তেমনি দর্শকদের দিক থেকেও দাবি উঠতে থাকে, তাঁরাও ভালোভাবে দেখতে চায় না। তখনই প্রথম উপলব্ধি আসে এক পাল মানুষ সার সার দাঁড়িয়ে থাকলে তার সামনের ঘটনা ভালোভাবে দেখতে পায় না। ভালোভাবে দেখানো শোনানোর এই তাগিদে এবার চিন্তা চলতে থাকে।

কোন সাধারণ ঘরোয়া জমায়েতে শ'খানেক লোক যখন ছোট ছোট গোষ্ঠিতে ভাগ হয়ে গিয়ে কথা বলতে থাকেন, তখন যদি কোন বিশেষ ব্যক্তি বিশেষ কোন কথা তাঁদের সবাইকে শোনাতে চান, তাঁকে স্বভাবতই কণ্ঠস্বরের সাধারণ পর্দা থেকে খানিকটা উচুতে গলার পর্দা চড়াতে হয়। এই উচ্চতর স্বর সমভাবেই সমকালে সবারই কানে পৌছে তাঁদের সতর্ক করে তোলে। ধ্বনির ক্ষেত্রে কোন বিশেষ ধ্বনির প্রতি মনোযোগ আকর্ষণের এই পন্থা যদি ফলপ্রসূ হয়, তবে দৃশ্যের ক্ষেত্রেও তা প্রযোজ্য হবে না কেন? অর্থাৎ স্বরের স্তর উঁচু পর্দায় তুলে যদি লোকের কান পাওয়া যায়, তবে দৃশ্যবস্তুকেও উঁচুতে স্থাপন করলেই লোকের চোখ পাওয়া যাবে না কেন? শুধু তাই নয়, ভিড়ের মধ্যে গলা চড়িয়ে কেউ কিছু বললেই লোকে স্বভাবতই তাকে খুঁজে বের করার চেষ্টা করে। তখনই যদি বক্তা উঁচু কিছুর ওপর দাঁড়িয়ে পড়েন, লোকের চোখ ও কান দুইই তাঁর

দিকে যায়। লক্ষ্য করলে এও দেখা যায়, একই উচ্চতার এক সারি বাড়ি দেখতে দেখতে হঠাৎ একটা উঁচু বাড়ি এসে পড়লে আমাদের নজর সেইদিকেই যায়। গলার পর্দার উচ্চতা বা জমির স্তরের উচ্চতা, দুইই মানুষকে আকর্ষণ করে। উঁচু জমি থেকে উঁচু পর্দায় কথা বললে সমস্ত লোকের মন টানা যায়।

গ্রামের সামাজিক জীবনে ঢোল শোহরতের রেওয়াজ ঐ একই চিন্তা থেকে। গ্রামের অভ্যস্ত ও পরিচিত অসংখ্য শব্দ থেকে ভিন্ন ও উচ্চতর এই ঢোলের আওয়াজ লোককে টেনে আনে। লোক জড়ো হলে ঢুলি তার ঘোষণা শোনায়। কোন মেলায় অসংখ্য শব্দ-দৃশ্যের ভিড়ে আমরা হারিয়ে যাই, মনকে বিশেষ কোন জায়গায় এনে দাঁড় করাতে পারিনা। গ্রামে দৈনন্দিন শব্দ-দৃশ্যের ভিড়ে সাধারণ গ্রামের মানুষের মনও ঐ একই রকম বিক্ষিপ্ত। আরো জোরালো অস্বাভাবিক কোন শব্দই তার বিক্ষিপ্ত মনকে কোন এক কেন্দ্রে সংযত করতে পারে।

দৃষ্টি আকর্ষণে উঁচু জমির উপযোগিতার সঙ্গে একটি অতি পরিচিত রীতিও জড়িয়ে আছে। নির্বিশেষ থেকে বিশেষ পরিচয়ে উচ্চতর আসনের রীতি রাজ-সভা থেকে জমিদার বাড়ি অবধি সর্বত্রই চলে আসছে। সামাজিক মর্যাদার সঙ্গে সঙ্গে আসনের উচ্চতার তারতম্যে অভ্যস্ত মানুষের চোখ পুরনো অভ্যাসবশেই উচ্চতর আসনের অধিকারীর দিকে যেতে বাধ্য।

মঞ্চকে জমি থেকে উঁচুতে তোলা কোথায় কার আবিষ্কার জানা নেই। গ্রীক থিয়েটারে আদি কাঠের মাচান ইল্‌কিল্যুসের নাটকাভিনয় কালে ভেঙে পড়লে খৃষ্টপূর্ব ৩৪০ থেকে ৩৩০ অব্দের মধ্যে যে পাথরের মঞ্চ প্রতিষ্ঠা হয়, ভূমি থেকে তার উচ্চতা ছিল ১২ ফুট-দর্শকদের প্রথম সারি মঞ্চ থেকে ৩০।৪০ ফুট দূরে। খৃষ্টপূর্ব ৫৮ অব্দ নাগাদ রোমের পাথরের থিয়েটার মঞ্চের উচ্চতা ছিল ৫ কি ৬ ফুট, দর্শকদের প্রথম সারির দূরত্ব ১২ ফুট। গ্রীক থিয়েটারে মুক্তাঙ্গন মঞ্চকে তিনদিক ঘিরে পাহাড়ের ঢালু কেটে গ্যালারি থেকে লোকে একটা ব্যাপ্তির অনুভব পেত, অন্তরঙ্গ ভাবে দেখতে পেত না। কথাগুলো এসে প্রতিধ্বনিত হয়ে এসে শোনা যেত, অস্বাভাবিক শোনাত। কিন্তু ইতিমধ্যে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গেই ব্যক্তি মানুষের স্বাতন্ত্র্য সত্তার উদয় ঘটেছে। অন্তর্দর্শী মানুষ তখন অন্য মানুষেরও মনস্তাত্ত্বিক গভীরে প্রবেশ করার চেষ্টা করছে, মানুষকে আরো কাছ থেকে আরো খুঁটিয়ে দেখতে চাইছে। ওদিকে জীবনধারণ জটিলতর হয়েছে, মন আরো বিক্ষিপ্ত। সেই মনকে একই কেন্দ্রে সংযত করার তাগিদ আরো বেড়ে গেছে। ফলে জমি থেকে মঞ্চের উচ্চতা নিয়ে অবশ্য অন্যরকম বিতর্ক চলেছে। অতীতে দেখা গেছে, মঞ্চবেদী পেছন দিকে উঁচু সামনের দিকে ঢালু হয়ে নেমে

এসেছে, পেছন দিকের উচ্চতা ৬ ইঞ্চি থেকে এক ফুটের মধ্যে! হালে এই রীতি বর্জিত। আগেকার কালে ভাবী পাকাপোক্ত সেটের বদলে একালে দ্রুত অপসরণক্ষম সেট আসতেই দেখা যায়। ঢালু মঞ্চে হাল্কা সেট্‌ দাঁড় করাতে অসুবিধে হয়, সেট্‌ সামনের দিকে ঝুঁকে পড়ে উল্টে পড়বার ভয় থাকে। এখন আসনসারি উঁচুতে তুলে দিয়েই সাইট্‌ লাইন বা দৃষ্টি রেখা ঠিক রাখা হয়।

মঞ্চ থেকে দর্শকদের খানিকটা দূরে রাখার প্রয়োজন, অভিনয়ের ইলিউশান বা মঞ্চ মায়ার তাগিদে, যাতে অগংসজ্জার খুঁটিনাটি বা পোশাকের কৃত্রিমতা দর্শকের চোখে ধরা পড়ে তার রসগ্রহণে ব্যাঘাত না ঘটায়। আসনে উপবিষ্ট দর্শকের গড়পড়তা উচ্চতা ৪২ ইঞ্চি। তাই মঞ্চ নির্মাতারা বলেন, মঞ্চের উচ্চতা হবে তিন ফুট থেকে সাড়ে তিন ফুট। অনেকে অবশ্য আড়াই ফুটেরও পক্ষপাতী। একদিক দিয়ে আবার আমরা এরীণা থিয়েটারের পুরনো চিন্তার দিকে চলেছি, অর্থাৎ মঞ্চের থেকে খানিকটা উঁচু থেকে মঞ্চের দিকে তাকাতে চাইছি। এসব চিন্তাই আসলে অবশ্য সাইট্‌লাইন বা দৃষ্টি রেখা ও অডিবিলিটি বা শ্রবণসাধ্যতার কথা ভেবেই।

উচ্চতর আসনশ্রেণী থেকে নিচে মঞ্চের দিকে তাকালে, কিংবা অপেক্ষাকৃত নিচ আসনশ্রেণী থেকে উঁচুতে মঞ্চের দিকে তাকালে, উভয় ক্ষেত্রেই মানুষের স্বাভাবিক সম্পূর্ণ চেহারা বিকৃত হয়ে ধরা পড়ে—হয় অতিকায় নয় নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর। আধুনিক প্রেক্ষাগৃহে আসনশ্রেণী ও মঞ্চবেদীর উচ্চতার মধ্যে এমন এক ভারসাম্য রচনার চেষ্টা আছে, যাতে অভিনেতার আপাদমস্তক সমগ্র মূর্তি দর্শকের চোখে সমানভাবে ধরা পড়ে। তাতেই আধুনিক মানুষের থিয়েটারে শোনা ও দেখার তাগিদ সম্পূর্ণ পরিতৃপ্ত হতে পারে।

থিয়েটারে দর্শকদের সতত বিক্ষিপ্ত মনকে কেন্দ্রায়িত করার প্রয়াসে জমি থেকে উঁচুতে মঞ্চবেদীর প্রতিষ্ঠা প্রথম বড় পদক্ষেপ।

———

অভিনয়

অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায়

অভিনয় কি? এর উত্তরে আমি বলি ঘটনার অনুকরণ বা পুনরাবৃত্তি করাই ঠিক অভিনয় নয়, তাতে প্রাণ বা আত্মা যুক্ত করতে হবে। এই প্রাণটি যত বেশী ফুটবে, যত বেশী আলো দেবে ততই ভালো। নিছক অভিনয় বা শুধু ম্যানারিজম্ যে হাততালি পায় না তা নয়, তবে তা উঁচু-জাতের জিনিষ নয়। 'তারপর চাক্কতীমশাই' বলে নকুল মামা ঢুকলেন। ঐ রে নকুল মামা এসেছে, নকুল মামা এসেছে কী মজা—একটা গুঞ্জন পড়ে গেল। কিন্তু নকুল মামা যদি তাঁর অভিনীত চরিত্রটিতে একটু আলো ছড়াতে না পারেন, তার মানে ঐ ধরনের চরিত্রের আলোকে তার সমগোত্র চরিত্রকে না আভাসিত করতে না পারেন, তাহলে সে অভিনয়ে প্রাণ সঞ্চারিত হল এ-কথা বলা মুশকিল হবে। জীবনের গভীর থেকে যে যত মণিমুক্তা তুলে আনতে পারবে সে তত বড় শিল্পী। অভিনয়ের ক্ষেত্রেও তাই।

ঋত্বিক ঘটকের নাম তোমরা নিশ্চয়ই শুনেছ। তাঁর একটা লেখা আমার খুব ভাল লেগেছে। তিনি তাতে বলেছেন, ভাল লেখার কতকগুলো স্তর থাকে। এই ধরো একটা ডিটেকটিভ গল্প। গল্পটা ওপরের স্তরের জিনিষ। তার নিচের স্তরে থাকবে একটা মানবিক দ্বন্দ্ব। আর একটা স্তরে থাকবে ঐতিহাসিক বা সামাজিক কিছু দ্যোতনা। তার পরের স্তরে ব্যক্তিগত চেতনা, চিন্তাভাবনা। তারও পরের স্তরে থাকতে পারে, সেটা ঠিক কী তা নিশ্চিন্ত করে বলবার জিনিষ না। ভাল লেখার স্তরগুলো সবই আছে। সেক্সপীয়রের তা আছে বলেই তিনি বড়ো। অভিনয়ের ব্যাপারেও কে কতটুকু স্তর যুক্ত করতে পারছে সেটাই বড় কথা।

আমি অভিনয় করি বলে আমাকে ছোটরা অনেকেই জিজ্ঞেস করে, আপনি কি করে অভিনয়ে এলেন বা কী করে অভিনয়কে ভালবাসলেন। দেখ ছোটবেলায় তিনটে জিনিষের প্রতি আমার আগ্রহ ছিল প্রবল। প্রথমটি হল খেলা—যে সময়ে আমাদের কোন খেলোয়াড়ের কিক মারা বল পল্টনদের গোলে ঢুকলে দেখা

দিত বিপুল উত্তেজনা। দ্বিতীয়টি হল রাজনীতি—তখন গান্ধীজীর আন্দোলন চলছে 'করেঙ্গে ইয়ে মারেঙ্গে'। স্কুলে যেতে গেলে সত্যাগ্রহী ছাত্রদের ডিঙিয়ে যেতে হবে সেইসব সময়। তৃতীয়টি হল নাটক। ছোটবলায় মামা-বাড়িতে রিহার্সেল দেখতাম। একটা নাটকের কথা মনে পড়ে। কুরুক্ষেত্র। কেশব সেনের লেখা, ফার্ষ্ট সীন থেকে লাষ্ট সীন পর্যন্ত শুনতে শুনতে আমার সব মুখস্থ হয়ে গিয়েছিল। আমি মুগ্ধ হয়ে যেতাম। ভাবতাম, কখনও কি আমিও ঐ রকম কোন চরিত্রে নামব। একদিন পরিচালক অনন্ত হাজরা আমার দিকে তাকিয়ে বললেন, একে ভীমের চরিত্রে মানাবে। আমি তখন রোগা পটকা। তাই হাসির রোল উঠল। অভিনয়ের ততটা সুযোগ না পেলেও আবৃত্তিতে আমি পুরস্কার পেতে থাকলাম স্কুলে এবং তারপর কলেজে।

তারপর সেই কলকাতা। স্কুলে অনেক বিষয় পড়তে হয়। কলেজে বিষয় কম, বিশ্ববিদ্যালয়ে বিষয় হয়ে যায় একটা মাত্র। ঠিক তেমনি মফঃস্বল ছেড়ে যখন কলকাতায় এলাম তখন আমার তিনটে প্রিয় বিষয়ের একটি হয়ে এল প্রধান, তা হল নাটক। মনে আছে প্রবোধ বিকাশবাবু আমাকে উস্কে দিয়েছিলেন, যা গিয়ে দেখবি কী সব অভিনেতা—অহীন্দ্র চৌধুরী, শিশির ভাদুড়ী, ভাবতেই পারবি না। দেখলাম জানলাম, তারপর অর্জুনের ঐ 'নীলচক্ষু শুধু'র মতো থিয়েটারই হল আমার ধ্যানজ্ঞান, হল আমার নিশ্বাস-প্রশ্বাসের মতো। নাকটা যেমন আমার, হাতটা যেমন আমার থিয়েটারও তেমনি আমার।

আমি বুঝলাম থিয়েটার করতে লাগে দুটো জিনিষ—শরীর আর প্রবল উৎসাহ। শরীর মানে দুর্দান্ত স্বাস্থ্য। তোমাদের মনে হবে থিয়েটার হল ললিত কলা। তার সঙ্গে স্বাস্থ্যের সম্পর্ক কী? তোমাকে রিহার্সেল দিতে হবে না ঘণ্টার পর ঘণ্টা? গলা ভালো রাখতে হবে না? রাত জেগে পাঠ মুখস্থ করতে হবে না। ডাক পেলে গ্রামে গঞ্জে যেতে হবে না? যুদ্ধের অভিনয়ে বা যেসব জায়গায় ক্রমাগত আস্ফালন আছে, এমন সব চরিত্রের অভিনয়ে শক্তির দরকার নেই? তাই বলছিলাম, ভাল স্বাস্থ্য তোমার হতেই হবে। আর তা যদি তোমার না থাকে কিছুটা এগুবে বটে তবে ঐ মস্‌জিদ পর্যন্তই। ভালো অভিনেতাকে হতে হবে যোগীর মত। খাওয়া ঘুম সব তার কণ্ট্রোলের মধ্যে।

দুই নম্বর হল প্রবল উৎসাহ। আমি ইচ্ছে করলে লাইব্রেরিতে পড়াশুনা, বারবার রিডিং ইত্যাদি দিয়ে মস্ত একটা ফর্দ তৈরী করে দিতে পারি। কিন্তু তা দেব কেন? থিয়েটারের ব্যাপারে যদি তোমার প্রবল উৎসাহ থাকে, করণীয় কী কী তা তুমি আপনা থেকেই বুঝতে পারবে। দু-একটা বিষয় শুধু আমি

বিশেষ করে বলছি, রিডিংয়ের অভ্যাস ভাল করে করবে। উচ্চারণে ভাল না হলে সব মাটি। কোন্ উচ্চারণটা ঠিক, কেন ঠিক এসব জানতে হবে। তাছাড়া লাগে যেমন গলা সাধা আছে অভিনয়েও আছে তেমনি স্বর-সাধনা, তুমি গলাটা নামিয়ে আনলে বিশেষ ভাব প্রকাশের মধ্যে কিন্তু তোমার কথাটা শেষ সারির শ্রোতার কানেও যেন পৌঁছয়। স্বর-সাধনা ছাড়া তা কী করে সম্ভব বলো? শুধু ভয়েস আর চেহারা থাকলেই হবে না। চোখ-কান খোলা রাখতে হবে। শুনতে হবে গান দেখতে হবে ছবি। যে বিখ্যাত পেইন্টিং-এ ঔরঙ্গজেব কেমন করে বসে আছেন দেখেনি, তার কল্পনা উদ্দীপিত হবে কী করে? অহীন্দ্রবাবু আলমগীর করছেন, বসেছেন টুপি সেলাই করছেন। সমস্ত ইতিহাসটাকে তিনি যেন সামনে ধ'রে দিচ্ছেন।

অভিনেতাকে থিয়েটারের জুতো সেলাই থেকে চণ্ডীপাঠ সব জানতে হবে। তাপস সেন না হয় আলোটা দিলেন। কিন্তু তাকে তো ঠিকমত নিতে হবে। কতটা আলো নেব, ডায়লগের কোন অংশ নেব, কোন্ অংশ ছেড়ে যাব সে বোধ থাকা চাই অভিনেতার। এরকম অসংখ্য ব্যাপারে অভিনেতাকে সজাগ হতে হবে।

সত্যি কথা বলতে কী, ভাল অভিনেতার ঘুমোবার উপায় নেই। চরিত্রটাকে নিয়ে ভাবা, সংলাপ মুখস্থ করা, অন্যান্য সহ-চরিত্রের সঙ্গে নিজেকে অ্যাডজাষ্ট করা সবচেয়ে বড় কথা, কী করে অভিনয়কে ব্যঞ্জনাময় করে তোলা যায়—এসব নিয়ে তো ভাবতেই হবে। তাছাড়া পড়াশুনা আর দেখাশোনার পরিধিকেও বাড়াতে হবে।

আমি একজন অভিনেতাকে বলতে শুনলাম—আধুনিক কবিতা আমি পড়ি না। অবাক হলাম! আধুনিক কবিতা না পড়লে তিনি তো যুগের বেদনাটাকেই ধরতে পারবেন না। নাচগান, কবিতা, ছবি, চলচ্চিত্র এসব সম্বন্ধে তার প্রবল আগ্রহ থাকা চাই-ই। তার মানে দাঁড়াল, শ্রম আর উৎসাহ। ভাল অভিনেতা হবার ঐ হল ফর্মুলা।

সূচীপত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর । রোগীর বন্ধু
অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর । বৃক ও মেষ পালা
সুকুমার রায় । ঝালাপালা
মন্মথ রায় । কাজীর বিচার
সুনির্মল বসু । মুস্কিল আসান
নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায় । ভীম বধ
বিধায়ক ভট্টাচার্য । মহাপূজা
অন্নদাশঙ্কর রায় । জনরব
সমর চট্টোপাধ্যায় । অবন পটুয়া
শৈল চক্রবর্তী । যাদুকর
স্বপন বুড়ো । বৈশাখী পূর্ণিমা
মিহির সেন । বেপরোয়া বালিকা সঙ্ঘ
বরেন গঙ্গোপাধ্যায় । হিং টিং ছট
হাসি দাশগুপ্তা । পিঠে খাবার মজা
রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী । প্রমিথিউস বন্দী হলেন
হরলাল বর্দ্ধন । পুতুলের বিয়ে
বিজয় দেব । সিংহ ও মেষ শাবক
সমীর চট্টোপাধ্যায় । অঙ্ক মালার দেশে

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

রোগীর বন্ধু

রেলগাড়িতে দুঃখীরাম ও বৈদ্যনাথবাবু

বৈদ্যনাথ। (মাথায় হাত দিয়া) উ-উ-উঃ।

দুঃখীরাম। (দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া) হা—হাঃ।

কাতরভাবে বৈদ্যনাথের প্রতি নিরীক্ষণ

বৈদ্যনাথ। (দুঃখীরামের মনোযোগ দেখিয়া) দেখছেন তো মশায়, ব্যামোর কষ্টটা তো দেখছেন!

দুঃখীরাম। না, আমি তা দেখছি নে। আপনাকে দেখে আমার পুনর্বার ভ্রাতৃশোক উপস্থিত হচ্ছে। হাঃ-হাঃ।

নিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। সে কী কথা!

দুঃখীরাম। হাঁ মশায়! মরবার সময় তার ঠিক আপনার মতো চেহারা হয়ে এসেছিল—

বৈদ্যনাথ। (শশব্যস্ত হইয়া) বলেন কী।

দুঃখীরাম। যথার্থ কথা। ওই রকম তার চোখ বসে গিয়েছিল, গালের মাংস ঝুলে পড়েছিল, হাত-পা সরু হয়ে গিয়েছিল, ঠোঁট সাদা, মুখের চামড়া হলদে—

বৈদ্যনাথ। (আকুলভাবে) বলেন কি মশায়! আমার কি তবে এমন দশা হয়েছে? এ কথা আমাকে তো কেউ বলেনি—

দুঃখীরাম। কেনই বা বলবে? এ সংসারে প্রকৃত বন্ধু কেই বা আছে?

দীর্ঘনিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। ডাক্তার তো আমাকে বারবার বলেছে আমার কোন ভাবনার কারণ নেই!

দুঃখীরাম। ডাক্তার? ডাক্তারের কথা আপনি এক তিল বিশ্বাস করেন? ডাক্তারকে বিশ্বাস করেই কি আমরা অকূল পাথারে পড়িনি? যখন আসন্ন বিপদ সেই সময়েই তারা বেশি করে আশ্বাস দেয়, অবশেষে যখন রোগীর হাতে পায়ে খিল ধরে আসে, তার চোখ উল্টে যায়! তার গা-হাত-পা হিম হয়ে আসে, তার—

বৈদ্যনাথ। (দুঃখীরামের হাত ধরিয়া) ক্ষমা করুন মশায়, আর বলবেন না মশায়! আমার গা হাত-পা হিম হয়েই এসেছে। আপনার বর্ণনা সত্যসত্যই খেটে যাবে। (বুকে হাত দিয়া) উ উ উঃ!

দুঃখীরাম। দেখছেন মশায়! আমি তো বলেইছি—ডাক্তারের আশ্বাস বাক্যে কিছুমাত্র বিশ্বাস করবেন না। আচ্ছা একটা কথা আপন কে জিজ্ঞাসা করি—আপনি কি রাত্রে চিত হয়ে শোন্?

বৈদ্যনাথ। হাঁ চিত হয়ে না শুলে আমার ঘুম হয় না।

দুঃখীরাম। (নিশ্বাস ফেলিয়া) আমার ভায়েরও ঠিক ওই দশা হয়েছিল। সে একেবারেই পাশ ফিরতে পারত না!

বৈদ্যনাথ। আমি তো ইচ্ছা করলেই পাশ ফিরতে পারি।

দুঃখীরাম। এখন পারছেন। কিন্তু ক্রমে আর পারবেন না।

বৈদ্যনাথ। সত্যি না কি!

দুঃখীরাম। ক্রমে আপনার বাঁ—দিকের পাঁজরায় একরকম বেদনা ধরবে, ক্রমে পায়ের আঙুলগুলো একেবারে আড়ষ্ট হয়ে যাবে, গাঁঠ ফুলে উঠবে, ক্রমে—

বৈদ্যনাথ। (গলদঘর্ম হইয়া) দোহাই আপনার, আর বলবেন না। আমার বুক ধড়াস্ ধড়াস্ করছে।

দুঃখীরাম। আপনার এইবেলা সাবধান হওয়া উচিত।

বৈদ্যনাথ। উচিত তা যেন বুঝলাম, কিন্তু কী করব বলুন।

দুঃখীরাম। আপনি কি এ্যালোপ্যাথি মতে চিকিৎসা করাচ্ছেন?

বৈদ্যনাথ। হাঁ।

দুঃখীরাম। কী সর্বনাশ! এ্যালোপ্যাথরা তো বিষ খাওয়ায়, ব্যামোর চেয়ে ওষুধ ভয়ানক। যমের চেয়ে ডাক্তারকে ডরাই।

বৈদ্যনাথ। (শঙ্কিত হইয়া) বটে! তা কি করব? হোমিওপ্যাথি দেখাব?

দুঃখীরাম। হোমিওপ্যাথি তো শুধু জলের ব্যবস্থা।

বৈদ্যনাথ। তবে কি বদ্যি দেখাব?

দুঃখীরাম। তার চেয়ে খানিকটা আফিং তুঁতের জলে গুলে হরতেল মিশিয়ে খান না কেন?

বৈদ্যনাথ। রাম রাম! তবে কী করা যায় মশায়!

দুঃখীরাম। কিছু করবার নেই, কোনো উপায় নেই এ আপনাকে নিশ্চিত বলছি।

বৈদ্যনাথ। মশায় আমি রোগা মানুষ, আমাকে এরকম ভয় দেখানো উচিত হয় না।

দুঃখীরাম। ভয় কিসের মশায়? এ সংসারে তো কেবলই দুঃখ কষ্ট বিপদ! চতুর্দিকে অন্ধকার! বিষাদের মেঘে আচ্ছন্ন! হাহুতাশ ছাড়া আর কিছু শোনা যায় না। এখানে আমরা বিষধর সর্পের গর্তে বাস করছি। এখেন থেকে বিদায় হওয়াই ভালো।

নিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। দেখুন, ডাক্তার আমাকে সর্বদা আমোদ আহ্লাদ নিয়ে প্রফুল্ল থাকতে বলেছে। আপনার ওই মুখ দেখেই আমার ব্যামো

যেন হু হু করে বেড়ে উঠছে। আমাকে দেখে আপনার ভ্রাতৃ শোক জন্মেছিল, কিন্তু আপনার ওই অন্ধকার দড়ি ঝাড়া দিলেই দেড় ডজন পুত্রশোক ঝরে পড়ে। আপনি একটা ভাল কথা তুলুন। এটা কোন ষ্টেশন মশায় ?

দুঃখীরাম। এটা মধুপুর। এখেনে এ বৎসর যেরকম ওলাউঠো হয়েছে সে আর বলবার নয়।

বৈদ্যনাথ। (ব্যস্ত হইয়া) ওলাউঠো। বলেনকী! এখানে গাড়ি কতক্ষণ থাকে ?

দুঃখীরাম। আধ ঘণ্টা। এখানে পাঁচ মিনিট থাকাও উচিত না।

বৈদ্যনাথ। (শুইয়া পড়িয়া) কী সর্বনাশ !

দুঃখীরাম। ভয় করা বড়ো খারাপ। ভয় ধরলে তাকে ওলাউঠো আগে ধরে। লরি সাহেবের বইয়ে লেখা আছে—

বৈদ্যনাথ। আপনি আমাকে ছাড়লে আমার ভয়ও ছাড়ে। আপনি আমার হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়েছেন। আপনার ডাক্তার ডাকুন—আমার কেমন করছে।

দুঃখীরাম। ডাক্তার কোথায় ?

বৈদ্যনাথ। তবে ষ্টেশন মাষ্টারকে ডাকুন।

দুঃখীরাম। গাড়ি যে ছাড়ে-ছাড়ে।

বৈদ্যনাথ। তবে গার্ড্‌কে ডাকুন।

দুঃখীরাম। গার্ড্‌ আপনার কী করতে পারবে ?

দীর্ঘনিশ্বাস

বৈদ্যনাথ। তবে হরিকে ডাকুন। আমার হয়ে এল !

মূর্ছা

দুঃখীরামের উপর্যুপরি সুদীর্ঘ নিশ্বাস পতন ও গান—
'মনে করো শেষের সেদিন ভয়ংকর'

———

অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর

বৃক ও মেষ পালা

[কথামালা যাত্রা। মূল—গ্রীক ক্রীতদাস ঈশপ কথিত]

বিদ্যাধর : সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি
একই নিয়ম আসছে চলি।
চিত্রোদ্ঘাটন করেন এসে
দুষ্ট বৃকে শিষ্ট মেষে
চিত্র কথামালার দেশে।
কুরু যাত্রাং কুরু বলি
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি।

চিত্রকরের চিত্র দর্শানো

পাগলা ঝোরার নেকড়ে বাঘ,
চোখ রাঙিয়ে ফুলিয়ে নাক
ছাগলার পরে বিষম রাগ
করছে তো করছেই।
বাচ্ছা ছাগ কাঁচা ঘাস এক এক গ্রাস
খাচ্ছে তো খাচ্ছেই কুড় কুড় করি।
গুড়ু গুড়ু চলি বাঘও সে
বিনা দোষে শাসাচ্ছে তো শাসাচ্ছেই।

কড়া কথা বলি।
সত্য ত্রেতা দ্বাপর কলি।
[ছাগ ও বাঘের প্রবেশ]

ছাগের ঘাস-চর্বণ নৃত্য-গীত

কুড়্বা কুড়্বা কুড়্বা লিজ্জে
কাঠায় কুড়্বা কাঠায় লিজ্জে
ডালে পাতায় মুড়ায়ে লিজ্জে
লিজ্জে লিজ্জে ভিজ্জে ভিজ্জে,
গ্রাস গ্রাস ভিজে ঘাস চিবায়ে লিজ্জে।

বৃকের গজ্জল গাথা

বিড়ম্বে নাড়ম
আগড়ম বাগড়ম
যাত্রাং কুড়্ যাত্রাং কুড়্।
আগে দুষ্টং জনে তুষ্টং কুরু
পরে শিষ্টং জনে তৃপ্তং কুরু
কুড়্ বা কুড়্ কুড়্ বা কুড়্।

বাঘ : পর্বতের ঝরণায় জল পান করা দায়
তোর নোলায় স্রোত ঘোলায়—
জল একদম কর্দম,
অপরাধটা কি হল কম ?

ছাগ : আমি বারো মাস নীচে খাই ঘাস
উঁচাতে আপনি খান কাঁচা মাস
শুন হে ওহে মহাত্মন্
অধমে কেনে করেন ভর্ৎসন অকারণ ?

বাঘ ঃ অসম্ভব্যং ন বক্তব্যম্।

ছাগ ঃ ছেড়ে দেন জল ঘোলার বিবরণ
নামাল ধারার উজান গমন।
যুক্তিযুক্ত নয় এ কথন
শোনেন কথা হয়ে স্থিরাত্মন্।

বাঘ ঃ দোষ তোর নয় একটা,
রটালি আমার নামে কথা পাঁচটা।
মামার কাছে পাজি।
কে রাখে তোরে আজি ?
মস্তক ইস্তক শিং করিব চর্বণ
নাই তোর লজ্জা সরম একদম।
বুড়ো হয়ে কর ছুঁচার কীর্তন
এর শাস্তি থোড়া জাস্তি গর্দান কর্তন
রাখ নর্তন, ঘাস-চর্বণ।

ছাগ ঃ বুড়া নাহি হই ঝুটা যদি কই
বয়স হয়নি ছয় মাস বই,
পোরেনি এখনো এক সন।
নেই কেহ আপন জন।
ছাড়ান পাই—দোহাই হুড়ুহুম্বার।

ছাগের অনুনয়-গীত

হুকুমদার তেরি এক্তিয়ার
মারবে তুমি, মরবো আমি পাপটি হবে কার ?
গরী পরবার করেন বিচার,
ম্যায় তো বেকার।
মারবে মারো, রাখবে রাখো,

জুলুম করলে আছি লাচার।
ছাইলা মানুষ, মজবুদ নয় হাড়
শক্ত হয়নি ঘাড়,
শৃঙ্গে নেই ধার,
বছর হয়নি এখনো পার।
বুঝি না বিচার-বিপত্তি
হার-জিত নিষ্পত্তি
আদালতের হের-ফের ফের-ফার।

বাঘ : আরে দুরাত্মন্, তুমি কি কারণ
তৃণচয় না করে রক্ষণ
করে হরণ করেছ ভক্ষণ?
অকারণে যত তৃণচয় হল অপচয়
বল কি খেয়ে বাঁচে গজ-হস্তি হয়?
তৃণ নহিলে নয় গর্দভের পরাণ রক্ষণ,
কি হবে এই ক্ষণ?

ছাগের খেদ-গীত

বেচারা গরীবি অতি ক্ষুদ্র জীবি
রোষ করিলা মনিবি—
ও রে কি দোষ পাইলা?
করি চিরকাল গাছতলে বাস
আহার মাত্র চোরকাঁটা ঘাস
মোরে কি লাগি মেরে ফেলিবা?

বাঘ : চোখ যে রাঙাস ওরে পশ্বাধম
আস্পর্দ্ধা তোর নয়তো কম
কথার উপর কথা কোস্, রোস

কর প্রতীক্ষে, আজিকে শিক্ষে
দিচ্ছি বিলক্ষণ।

ছাগ : লিজ্জে লিজ্জে ভিজ্জে ভিজ্জে ভাই

বাঘ : কহিলি যা নয় তাই,
আমি কি ঘাস খাই ?
পাঁঠা ধরে কাঁচা মাস খাই
রেখে দে চীৎকার,
কি আর বিচার
চল ঝরণা পার

বাঘ : অনন্তপারম্ জলশুদ্ধিশাস্ত্রম
স্বল্পং তথায়ূর্বহবশ্চ বিঘ্নাঃ
ইতি বিচিন্ত ভব নিশ্চিন্ত
নাই বিচিন্ত ভব নিশ্চিন্ত
নাই কোন মতে এবার নিস্তার

ছাগ : দোহাই হুড়ুহুম্বার !

ছাগের গীত

কইতে কইতে আমার কথা
ফুরাবে কি ?
রইতে রইতে নটে শাকটা
মুড়াবে কি ?
হুড়ুহুম্বার মন্তর এবার
কুলাবে কি ?

[পেঁচালো শিং লড়ায়ে মেড়া হুড়ুহুম্বার সদর্পে
সতেজে সবেগে আসরে প্রবেশ]

হুড়ুহুম্বার হাম্বারব গীত

চ্যাং অ্যাং ওম্ ওম্বা,
দিন রাত ভাল লাগেন তিন সন্ধ্যা,
ঘ্যান্ ঘ্যান্ খ্যান্ খ্যান্ প্যান্ প্যান্ কত সয় বা।
অজাযুদ্ধে ঋষিশ্রাদ্ধে
শিশুতে বৃদ্ধে কত লড়বা
করিবা বহ্বারম্ভে লঘুক্রিয়া—যা চলিয়া।

বাঘ : ঘাড় মুড় কিলাই মো, হাড় গোড় চিবাই মো।
হুড়ুহুম্বা : যমবাড়ি তাড়াই মো, শিং ঝাড়ি ঢুঁসাই মো।
ছাগ : ও ম্যা হেঁট্যে চল রে পাঁচিল পার আর না।
হুড়ুহুম্বা : ফেলি চারি চারি পা।
ছাগ : রেখে বাড়াবাড়ি তাড়াতাড়ি দৌড় মার না।
সকলে : নীচে উপরে দিনে দুপুরে
যে পারি যেখানে
পাড়ি জামাই মো দৌড় ধরি মো।
হুড় হুড় দুড় দুড় ও হো
গুড় গুড় ক্ষুর ক্ষুর হো হো
বাঘ : ও হো হো মাজা ভাঙলো গো—

[বাঘের পতন ও মূর্চ্ছা]

[কোলা ব্যাঙের প্রবেশ]

চৌপট নৃত্য ও গীত

দুষ্টে আর শিষ্টে এমন প্রভেদ কিছুই নাই,
ব্যাঘ্রে আর মেষে শুধু নামের ফরক ভাই—
বাগে পেলে মেষও বাঘে করে না রেহাই।
মাতঙ্গ পড়িলে দ'য়ে পতঙ্গে প্রহার করে

হাতিকে ব্যাঙ লাথি মারে এ কথার মার নাই।

[প্রস্থান]

[পাঠক ও অধিকারীর প্রবেশ]

পাঠক : সব ভুড় করিলা হু অধিকাড়ি ছঃ যাত্রা মিটি করিলা।

অধিকারী : কেন, কেন, মাটি আবার কি হল ?

পাঠক : বিদোয়া সকড় লিখি গেলা—বাঘ মেষশাবকের বাপ তুলিলা। বাপ তুলিয়া ঐ অসহায় হুড়বল মেষ-শাবকেড় প্রাণসংহাড় কড়িল। হুড়ূহুম্বা কিমতি আইলা সখানে ? গড়প খরাপ কড়ি কিড় একি কাম কড়িলা হে মহাপ্রভু ?

অধিকারী : এ তো বিদ্যাসাগরের কথামালা নয়, এ হল ঈশপ ফেবুল !

পাঠক : এ সব ফে বুল ? আ, অ, ভল, ভল, তত পড়ে কি হইলা ?

অধিকারী : তার পরে আর কি ? হুড়ূহুম্বার প্রতাপে ছাগল চরে পাহাড়ের অতি উচ্চ স্থানে আর চুঁ খেয়ে কাবু বাঘ চরে পাহাড়ের নীচে মাজা-ভাঙ্গা।

পাঠক : ততপড়ে ?

অধিকারী : তার পরে একদিন—

বাঘ বলে, ভাই ছাগল
তোমার মতো নাই পাগল।
উচ্চে কেন চরিতেছ আর—
দৈববশে পা পিছলালে
হঠাৎ পড়িয়া ভাঙিবে ঘাড়,
এই ভয় হতেছে আমার।
চেয়ে দেখ নীচের ঘাস

মিষ্ট কেমন ডাগর ডাগর।

পাঠক : বাঘটা বড় চতুড়—এবাড় ধরিলা ছাগলাক্। ছাগল কি কহিলা কহ।

অধিকারী : ছাগল বলিল, আমি নীচে নামিব না মাপ কর। পর্বতের আড়াল বড় আড়াল—ছাড়িব না।

[উভয়ের প্রস্থান]

মাজা-ভাঙা বাঘের গীত

কোথা গেলে ভাই ছাগল
তোমার মত নাই পাগল
নেকড়ের ভয়ে উঠতে আছে উঁচু পাহাড়ে?
যদি পা পিছলায় হঠাৎ
হবে এক্কেবারে পপাৎ
ঝরণার জলে, নয় ভূমিতলে।

ছাগ : সেও ভাল, না পড়ি বাঘের কবলে!

বাঘ : পাগল, পাগল—বাঘ এ দেশে আছে?
হালুম্বা আমি হলুম হুড়ু হুম্বার খুড়ো
মাজা-ভাঙা বুড়ো।
নেমে এসো কাছে—
ছাগলাস্থ ঘৃতটা মালিস কর
কাঁচা ঘাস খেতে দেবো সুমিষ্ট ডাগর ডাগর!

ছাগ : আমি নীচে আর চরিব না মাপ কর।
পর্বতের আড়াল ছাড়িব না
ঘাস হোক না যতই বড়।

বাঘ : ভাই, আমার চলৎশক্তি নাই
ঝরণার জল এক পলা দাও তৃষ্ণাটা মেটাই।
যেই জন তৃষ্ণাতুরে জল দান করে

অন্তেতে বৈকুণ্ঠবাস পুণ্যবলে করে

ছাগ ঃ বৈকুণ্ঠে কাজ নেই
আকণ্ঠ বর্তে থাকি ভাই।
দূরে দূরে চরে চরে বারো মাস ঘাস খাই
খাই দাই শিং গজাই আর কাঁসি বাজাই
কুড়্ কুড় কড়্ কড়।

বাঘ ঃ যাঃ বেঁচে গেলি বড়!



সুকুমার রায়

ঝালাপালা

পাত্রগণ

পণ্ডিতমশায়, ঘটিরাম ও কেষ্টা : ছাত্র, পুলিস, দুলিরাম ও খেঁটুরাম : জমিদারের মোসাহেব, কেবলচাঁদ : ওস্তাদ, রামকানাই : জমিদারের ভৃত্য, কেদারকৃষ্ণ : জমিদারের মামা, জুড়ির দল

প্রথম দৃশ্য

পণ্ডিতমশায়ের বাড়ি

জুড়ির প্রবেশ ও গান

সখের প্রাণ গড়ের মাঠ
ছাত্র দুটি করে পাঠ
পড়ায় নাই রে মন
সবাই হচ্ছে জ্বালাতন !
অতি ডেঁপো দুকান কাটা
ছাত্র দুটি বেজায় জ্যোঠা
কাউকে নাহি মানে
সবাই ধরো ওদের কানে !
গুরুমশাই টিকিওয়ালা
নিত্যি যাবেন ঝিঙেটোলা
জমিদারের বাড়ি—
সেথা আড্ডা জমে ভারি !

[জুড়ির প্রস্থান

পণ্ডিতের প্রবেশ

পণ্ডিত। (স্বগত) রোজ ভাবি জমিদারমশাইকে বলে কয়ে তার বাড়িতেই একটা টোল বসাব। তা একটু নিরিবিলি যে কথাটা পাড়ব, সে আর হয়ে উঠল না। যে-সব বাঁদর জুটেছে, দুটো বাজে কথা বলবার কি আর জো আছে? এই জন্যেই বলি, ন্যায়শাস্ত্র যে পড়েনি সে মানুষই নয়—সে গরু, মর্কট!

নেপথ্যে ওস্তাদী গানের আওয়াজ

এই আবার চলল! এ এখন সারাদিন চলতে থাকবে! গলা তো নয় যেন ফাটা বাঁশ! গানের তাড়ায় পাড়াসুদ্ধলোক ত্রাহি ত্রাহি কচ্ছে—কাগটা পর্যন্ত ছাতে বসতে ভরসা পায় না—অথচ ভাবখানা দেখায় এমনি, যেন গান শুনিয়ে আমাদের সাতচোদ্দং তিপান্ন পুরুষ উদ্ধার করে দিচ্ছে। আ মোলো যা—

ঘটিরামের প্রবেশ

এত দেরী হল কেন? এতক্ষণ কি কচ্ছিলি?

ঘটিরাম। আজকে শিগগির-শিগগির ছুটি দিতে হবে।

পণ্ডিত। বটে! অনেকদিন পিঠে কিছু পড়েনি বুঝি। ছুটি কিসের?

ঘটিরাম। তাও জানেন না! ও পাড়ায় গানের মজলিস হবে যে! বড় বড় ওস্তাদ—

পণ্ডিত। না, না ছুটি পাবি নে যা! পড়ার সঙ্গে সম্পর্ক নেই, এসেই ছুটির খোঁজ।

ঘটিরাম। বাঃ ঝিঙেটোলার জমিদারবাবু আসবেন!

পণ্ডিত। লাটসাহেব এলেও যেতে পাবি নে। কেষ্টা কোথায়?

ঘটিরাম। জানি নে। ডেকে আনব?—ওরে কেষ্টা!

[প্রস্থানোদ্যম

পণ্ডিত। থাক্ থাক্, ডাকতে হবে না। ওখেনে বসে পড়্।

ঘটিরাম। 'অল ওয়ার্ক অ্যানড্ নো প্লে মেক্স্ জ্যাক্ এ ডাল বয়'—বালকদিগকে খেলিবার সুযোগ দেওয়া উচিত, কেন না কেবলই লেখাপড়া করিলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বালকদিগকে খেলিবার সুযোগ দেওয়া উচিত, কেন না, কেবলই লেখাপড়া করিলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়—ফুর্তিটুর্তি সব মাটি। কেন না, কেবলই লেখপড়া করিলে মনের স্ফূর্তি নষ্ট হয়—এই আমাদের যেমন হয়েছে। কেন না—

পণ্ডিত। ও-জায়গাটা পাঁচশোবার করে পড়তে হবে না। তোর অন্য পড়া নেই ?—ঐ যে পুলিসটা যাচ্ছে। ওকে একটু ডাকা যাক। এই পাহারাওয়ালা, ইদিকে আও।

পুলিসের প্রবেশ

দেখো, হামারা পাশের বাড়িমে দিনরাতভর এইসা ক্যাঁচক্যাঁচ করতা, নিদ্রার অত্যন্ত ব্যাঘাত হোতা হায়। ইস্‌কো কুছ প্রতিকার হয় না রে ব্যাটা ?

পুলিস। কেয়া বোলতা বাবু ?

পণ্ডিত। আহা এটা দেখি একেবারে নিরক্ষর মূর্খ! আরে পাশের বাড়িমে একঠো গানের ওস্তাদ হায় নেই ? উসকো একদম কাণ্ডজ্ঞান নেহি হায়, দিনরাত ভর কেবল সারে গামা ভাঁজতা হায়।

পুলিস। কেয়া হোতা ?

পণ্ডিত। আরে খেলে যা। (সুর করিয়া) সারে গাগা মাপা ধানি ধানি—এইসা কর্‌তা হায়।

পুলিস। হাম কেয়া করেগা বাবু। উ হমারা কাম নেহি।

পণ্ডিত। না, তোমার কাজ না। মাইনে খাবে তুমি আর কাজ করবে বেচারাম তেলি।

পুলিস। হাঁ বাবু।

পণ্ডিত। চেঁচাস কাহে? ফের পূজোর বকশিশ চায়গা তো এইসা উত্তম-মধ্যম দেগা, থোঁতা মুখ ভোঁতা কর দেগা।

পুলিশ। আরে পাগলা হায় রে, পাগলা হায়!

[পুলিশের প্রস্থান

পণ্ডিত। দেখ, ছোঁড়াটার আর সাড়াশব্দ নেই। ঘটে!

ঘটিরাম। অ্যাঁ—

পণ্ডিত। 'অ্যাঁ' কিরে বেয়াদব? আজ্ঞে বলতে পারিস নে? আধঘণ্টা ধরে 'অ্যাঁ' করতে লেগেছে! বলি, পড়ছিস না কেন?

ঘটিরাম। হ্যাঁ পড়ছিলাম তো।

পণ্ডিত। শুনতে পাই না কেন? চেঁচিয়ে পড়।

ঘটিরাম। (চিৎকার করিয়া)

অন্ধকারে চৌরাশিটা নরকের কুণ্ড
তাহাতে ডুবায়ে ধরে পাতকীর মুণ্ড—

পণ্ডিত। থাক্, থাক্, অতো চেঁচাস নে, একেবারে কানের পোকা নড়িয়ে দিয়েছে।

কেষ্টার প্রবেশ

কেষ্টা। লেখাপড়া করে যেই গাড়িচাপা পড়ে সেই। শুনলুম আজকে ও-পাড়ায় গানের মজলিস হবে।

পণ্ডিত। এতক্ষণে পড়তে এসেছিস?

কেষ্টা। 'আই গো আপ্, ইউ গো ডাউন'—সেই কখন এসেছি —এতক্ষণে কত পড়ে ফেললাম। 'আই গো আপ্, ইউ গো ডাউন'—

পণ্ডিত। যা, যা, আমি যেন আর দেখিনি, কাল আসিস নি কেন?

কেষ্টা। কালকে কি করে আসব? ঝড় বৃষ্টি বজ্রাঘাত!

পণ্ডিত। ঝড় বৃষ্টি কিরে? কাল তো দিব্যি পরিষ্কার ছিল।

কেষ্টা। আজ্ঞে, শুক্কুরবারের আকাশ, কিচ্ছু বিশ্বেস নেই। কখন কি হয়ে পড়ে!

পণ্ডিত। বটে। তোর বাড়ি কদ্দুর?

কেষ্টা। আজ্ঞে, ঐ তালতলায়। 'আই গো আপ, ইউ গো ডাউন।' 'আই গো আপ, ইউ গো ডাউন' মানে কি?

পণ্ডিত। 'আই'—'আই' কিনা চক্ষুঃ, 'গো'—গয়ে ওকারে গো —গৌ গাবৌ গাবঃ, ইত্যমরঃ। 'আপ' কিনা আপঃ—সলিলং বারি অর্থাৎ জল। গোরুর চক্ষে জল, অর্থাৎ কিনা গরু কাঁদিতেছে। কেন কান্দিতেছে? না 'উই গো ডাউন' কিনা 'উই' অর্থাৎ যাকে বলে উইপোকা—'গো ডাউন' অর্থাৎ গুদামখানা। গুদমঘরে উইধরে আর কিছু রাখলো না, তাই না দেখে, 'আই গো আপ্—গোরু কেবলি কান্দিতেছে—

ঘটিরাম। (বিকট হাস্য)

পণ্ডিত। ঘটে!

ঘটিরাম। অ্যাঁ—না, আজ্ঞে—

পণ্ডিত। ফের ওরকম বিটকেল শব্দ করবি তো পিটিয়ে সিধে করে দেব।

পণ্ডিতের নিদ্রাচেষ্টা

কেষ্টা। পণ্ডিতমশাই, ও পণ্ডিতমশাই—

ঘটিরাম। ঘুমুচ্ছে? (ঠেলিয়া) ও পণ্ডিতমশাই! কেষ্টা ডাকছে, কেষ্টা ডাকছে—

কেষ্টা। পণ্ডিতমশাই, এই জায়গাটা বুঝতে পাচ্ছি না।

পণ্ডিত। হুঁ, দেখি নিয়ে আয়, কোন জায়গাটা। সব বলে দিতে হবে! তোদের কিচ্ছু হবে না। 'ওয়ানস্ আই মেট্ এ লেম্

ম্যান্ ইন্ এ স্ট্রিট নিয়ার মাই হাউস্।' 'ওয়ান্‌স্ আই মেট এ লেম্ ম্যান্'—কিনা একদা এক বাঘের গলায় হাড় ফুটিয়াছিল। 'ইন্ এ স্ট্রিট'—সে বিস্তর চেষ্টা করিল। 'নিয়ার মাই হাউস'—কিন্তু সে হাড় বাহির হইল না। এই সোজা ইয়েটা বুছতে পাললি না ? (ঘটিরামের প্রতি] কি রে পালাচ্ছিস যে !

ঘটিরাম। না, পালাচ্ছি না তো। কেষ্টা এমনি গোলমাল কচ্ছে কিচ্ছু আঁক কষতে পাচ্ছি না।

পণ্ডিত। কি অাঁক দেখি নিয়ে আয়।

ঘটিরাম। আজ্ঞে এই যে! এই—চার সের আলুর দাম যদি দশ আনা হয় তবে আধ মণ পটলের দাম কত ?

পণ্ডিত। দেখি, চার সের আলু দশ আনা তো! তবে আধ মণ পটল—আহা, আবার পটল এল কোত্থেকে ?

ঘটিরাম। তা তো জানি না। বোধহয় পটলডাঙ্গা থেকে!

পণ্ডিত। দূৎ! একি একটা অাঁক হতে পারে? গাধা কোথাকার!

ঘটিরাম। তাই বলুন! আমি কত যোগ করলাম, ভাগ করলাম, শেষটায় জি-সি-এম্ পর্যন্ত করলাম, কিছুতেই হচ্ছিল না। বড্ড শক্ত, না ?

পণ্ডিত। মেলা বকিস নে, যাঃ!

ঘটিরাম। যাবো ? ছুটি ?

কেষ্টা। ছুটি—ছুটি—ছুটি—

পণ্ডিত। না, না, ছুটি-টুটি হবে না।

ঘটিরাম। হ্যাঁ ভাই, তুই সাক্ষী আছিস, বলেছেন যা!

কেষ্টা। হ্যাঁরে, আমাদের কিন্তু কোন দোষ নেই।

[ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রস্থান

পণ্ডিত। দেখলে কাণ্ডটা! এইসব হুজুকেই তো ছেলেগুলোকে

মাটি করলে। আর জমিদারমশাইয়ের আক্কেলটা দেখ—এখানে এসে অবধি দশভূতে পেয়ে বসেছে—দেখ দেখি, টাকা ওড়াবার জন্য শেষটায় কিনা গানের মজলিস! ছ্যা ছ্যা!

[পণ্ডিতের প্রস্থান

জুড়ির প্রবেশ ও গান

সাবধান হয়ে সবে অবধান কর রে।
ওহে শিষ্য গুণধর কোলাহল ছাড় রে॥
(আহা) কেনা জানে চণ্ডীবাবু ঝিঙেটোলার জমিদার।
(আহা) অনুরক্ত ভক্ত মোরা চরণে প্রণমি তার॥
(ওসে) বিক্রমে বিক্রমাদিত্য সর্বশাস্ত্রে ধুরন্ধর।
(আহা) সাক্ষাৎ যেন দাতাকর্ণ দানব্রতে ভয়ঙ্কর॥
(এরা) খাচ্চে দাচ্চে ফুর্তি কচ্ছে নিত্য তারি কল্যাণে।
(সেথা) চব্বিশ ঘণ্টা মারছে আড্ডা বখশিশাদি সন্ধানে॥
(সেথা) নিত্য নতুন হচ্ছে হললা লোকারণ্য মারাত্মক।
(সেথা) বাদ্যের ঘণ্টা খাদ্যের ঘটা অর্থের শ্রাদ্ধ অনর্থক॥
(আহা) একজন বড্ড সাদাসিধে ভেদ করে না আত্মপর।
(আর) টাকার লোভে বসে থাকে যত ব্যাটা স্বার্থপর॥
(ওরে) পণ্ডিতমশাই ব্যস্ত বড্ড চণ্ডীবাবুর হিতার্থ।
(দেখ) অন্নলুচি ধ্বংস করি কচ্ছেন সবায় কৃতার্থ।
(আহা) বিদ্যে জাহির কচ্ছে সবাই পোলাও কোর্মা ভোজনে।
(দেখ) যত রাজ্যের নিষ্কম্মার দল বাড়ছে সবাই ওজনে॥
(ওরে) অবিশ্রান্ত হুজুক নিত্য মুহূর্তেকো শান্তি নেই।
(আজ) পঞ্চবর্ষ অন্ত হৈল ক্ষান্ত দেবার নামটি নেই॥
(ওরে) কস্মিনকালে শুনি নাই রে এমন কাণ্ডকারখানা।
(ওই) খোসামুদে ভণ্ডগুলো আহ্লাদেতে আটখানা॥

(আহা) পুষ্পচন্দন বৃষ্টি হবে চণ্ডীবাবুর মস্তকে।
(দেখ) অক্ষয় পুণ্য সঞ্চয় হবে চিত্রগুপ্তের পুস্তকে ॥

দ্বিতীয় দৃশ্য

জমিদার বাড়ি

হুলিরাম ও খেঁটুরামের প্রবেশ

হুলিরাম। এত কাণ্ডকারখানা করা গেল, এখন ভালোরকম দু-একটা ওস্তাদ আসে তবে মজলিসটা জমে।

খেঁটুরাম। হ্যাঁ। বেশ তালে আছি দাদা! ভাবনা নেই, চিন্তা নেই, খাও দাও আর ফুর্তি কর।

হুলিরাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, যেরকম ঘি-দুধ চর্ব-চোষ্য চলছে, আর কটা দিন যেতে দাও না—আর চেনবার জো থাকবে না।

কেবলচাঁদের প্রবেশ

কেবল। আমি মনে কচ্ছিলুম আপনাদের মজলিসে আজ গুটি দশেক গান শোনাব।

খেঁটুরাম ও হুলিরাম। (পরস্পরের প্রতি) এ কে রে?

কেবল। সিকী! আপনারা কেবলচাঁদ ওস্তাদকে চেনেন না?

খেঁটুরাম। কোন জন্মে নামও শুনিনি—

হুলিরাম। চোদ্দপুরুষে কেউ চেনে না—

কেবল। হ্যাঁ, তা আপনারা গোপীকেষ্টবাবুকে চেনেন তো?

খেঁটুরাম। গোপীকেষ্ট?

হুলিরাম ও খেঁটুরাম। হ্যাঁ—নাম শুনেছি বোধ হচ্ছে।

কেবল। আমি গোপীকেষ্টবাবুর বাড়িওয়ালার খুড়শ্বশুরের জামাইয়ের পিসতুতো ভাই।

হুলিরাম। তাই নাকি!

খেঁটুরাম। সে কথা বলতে হয়—আসতে আজ্ঞা হোক মশাই—

ছুলিরাম। বসতে আজ্ঞা হোক মশাই—

খেঁটুরাম। কি নামটা বললেন আপনার ?

কেবল। কেবলচাঁদ।

ছুলিরাম। কি বললে ? বক্কেশ্বর ? তা বেশ, বকদাদা, আজ তোমার গান শোনা যাবে !

কেবল। তা বেশ, কি বলেন—গানটা আরম্ভ করলে হয় না ?

খেঁটুরাম। না, না ! এখনই কি দরকার ? সবাই আসুক আগে—

কেবল। এই সুর-টুরগুলো একটু গুছিয়ে নিতে হবে।

ছুলিরাম। আরে মশাই ! আমাদের কাছে 'গা'-ও যা, 'ধা'-ও তাই—সবই সমান।

কেবল। হ্যাঁ—গানগুলোর কি মুশকিল জানেন ? ওগুলো আমার স্বরচিত কিনা—তাই, গাইতে একটু সংকোচ বোধ কচ্ছি।

খেঁটুরাম। তা নাই-বা গাইলে—অন্য কিছু গাও না—

কেবল। আ মোলো যা। এরা আমায় গাইতে দেবে না দেখছি, আমার ভালো-ভালো গানগুলো—

কেষ্টা ও ঘটিরামের প্রবেশ

ঘটিরাম। আমরা গান শুনতে এলুম।

কেষ্টা। কই রে, লোকজন সব কই ? গাইবে কে ? আপনি বুঝি ?

কেবল। হ্যাঁ হ্যাঁ, তা এঁরা যখন নেহাত পেড়াপীড়ি কচ্ছেন তখন না গাইলে সেটা ভয়ঙ্কর খারাপ দেখাবে।

কেবলচাঁদ গুন গুন করিতে-করিতে সহসা সপ্তমে চিৎকার

খেঁটুরাম। রক্ষে কর দাদা, এ অত্যাচার কেন ?

হুলিরাম। মশাই, এটা 'ডেফ অ্যাণ্ড ডাম্‌ব' ইস্কুল নয়—আমাদের কানগুলো বেশ তাজা আছে।

কেবল। আজ্ঞে, সুরটা ঠিক আন্দাজ পাইনি—একটু চড়ে গিয়েছিল—না?

হুলিরাম। একটু বলে একটু?

খেঁটুরাম। রীতিমত তেড়ে এসেছিল।

কেবল। আচ্ছা, একটু নামিয়ে ধরি—

কেবলচাঁদের গান

আহা, পড়িয়া কালের ফেরে, মোরা কি হনু রে?
কোথায় ভীষ্ম কোথা দ্রোণ
কোথা কর্ণ ভীমার্জুন
কোথায় গেলেন যাজ্ঞবল্ক্য কোথায় বা সে মনু রে?
মাটির সঙ্গে মিশছে সবি
কেঁচোর মতো খাচ্ছে খাবি।
কেবল আপিস খাটি কচ্ছে মাটি নশ্বরপুষ্ট তনু রে—
ব্রাহ্মণের সে তেজ নাই
হ্যাঁ হ্যাঁ ব্রাহ্মণের সে—

কেবলচাঁদের মাথা চুলকানো

হুলিরাম। শিঙ নাই আর লেজ নাই—

কেবল। হ্যাঁ হ্যাঁ—

কেবলচাঁদের গান

ব্রাহ্মণের সে তেজ নাই
খাদ্যাখাদ্য ভেদ নাই
মনের দুঃখ কারে বলি মোরা কি হনু রে—
আহা, পড়িয়া কালের ফেরে মোরা কি হনু রে।

খেঁটুরাম। দাঁড়ান, একটু সামলে নি—অতো করুণ রস করবেন না।

খেঁটু ও তুলি ক্রন্দনোন্মুখ। কেষ্টা ও ঘটিরামের উচ্চহাস্য

খেঁটুরাম। তবে রে ছোকরা! তোরা হাসছিস কেন?

ঘটিরাম। বাঃ! হাসি পেলে হাসব না?

তুলিরাম। হাসি পাবে কেন? এখানে হাসবার কি হল?

খেঁটুরাম। ছ্যাবলামি পেয়েছিস? কথা নেই বার্তা নেই—হ্যাঃ-হ্যাঃ!

ঘটিরাম। কি রে কেষ্টা, হাসি পেলে হাসব না?

কেষ্টা। এই রে, পণ্ডিতমশাই আসছে—

ঘটিরাম ও কেষ্টা। এই রেঃ, এই রেঃ, এই রেঃ, পণ্ডিতমশাই আসছে—মার্টিং চকার—তোর র‍্যাপারটা দে তো।

ঘটিরাম ও কেষ্টার র‍্যাপার মুড়ি হইয়া উপবেশন। পণ্ডিতের প্রবেশ

পণ্ডিত। ভালো, ভালো! তোমরা মধ্যে মধ্যে বিশ্রাম নিতে পার না? নিত্যি-নিত্যি জমিদারমশাইকে বিরক্ত করাটা কি ভালো দেখায়?—ইকী! ক্যাবলাটা এখানে এয়েছে কি করতে? (তুলিরাম ও খেঁটুরামের প্রতি) আ মোলো যা! তোমাদের যত রাজ্যের ইয়ার-বকশী সব বুঝি জোটাচ্ছ একে-একে?

কেবল। দেখলেন মশায়? আমাকে অপমান কললে? আমায় ইয়ার-বকশী বললে, অমন কললে কিন্তু আমি গাইব না।

পণ্ডিত। তা নাই-বা গাইলে—কে তোমাকে মাথার দিব্যি দিচ্ছে? যা না গান! গানের ধমকে আমাদের পর্যন্ত পিলে চমকে ওঠে—তা, অন্যে পরে কা কথা!

ছাতা ও বিশাল পুঁটলি লইয়া রামকানাইয়ের প্রবেশ

রামকানাই। (ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রতি) আপনাদের কি হয়েছে? অমন করে বসে আছেন যে? কাশি? জ্বর? ন্যাড়া মাথা? ঠাণ্ডা লাগবে বলে?

পণ্ডিত। (ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রতি) কি হে, এখানে এসে হাজির হয়েছ? আচ্ছা, বেরিয়ে নাও তারপর—

রামকানাই কর্তৃক পণ্ডিতস্কন্ধে পুটলি স্থাপন

তুমি কি রকম মানুষ হে?

রামকানাই। কেন? বেশ দিব্যি মানুষটি।

পণ্ডিত। বলি চোখ দিয়ে দেখতে পাও না কি?

রামকানাই। চোখ দিয়ে দেখতে পাই না তো কি কান দিয়ে দেখতে পাই?

পণ্ডিত। না হে, তুমি বড় বাচাল—শাস্ত্রে বলেছে—

রামকানাই। না—শাস্ত্রে আমার সম্বন্ধে কিছু বলেনি—

পণ্ডিত। আহা, বলি, তোমায় তো কেউ এখেনে ডাকেনি?

রামকানাই। ডাকবে আবার কি? এ কি নিলেমের মাল পেয়েছে যে ডাকাডাকি করবে?

পণ্ডিত। হ্যাঁ, তবে অমন করে বসে থাকলে তো ভালো দেখায় না।

রামকানাই। ভালো দেখায় না কি হে? তোমাকে যে অশথ গাছের মামদো ভূতের মতো দেখা যায়, সে বেলা কি?

পণ্ডিত। আহা, বলি, যদি কিছু বলবার থাকে, তা ঝটপট বলে বাড়ি যাও না কেন?

রামকানাই। হ্যাঁ, তাহলে তুমিও আমার পুঁটলিটা সরাবার সুবিধা পাও।

পণ্ডিত। কি আপদ! বলি পুঁটলিটা রেখে যেতে বললে কে? নিয়েই যাও না কেন?

রামকানাই। মুটের পয়সা দেবে কে?

পণ্ডিত। হাঁঃ—মুটের পয়সা দেবে কে? মুটের পয়সা দেবে!

রামকানাই। উঃ! দূঃ! তোমার ময়লা চাদরটা আমার নাকের কাছে নেড়ো না।

জমিদারের প্রবেশ

খেঁটুরাম। সর সর জমিদারমশাই আসছেন।

ভুলিরাম। হ্যাঁ হ্যাঁ, সর, সর।

জমিদার। কি রে রামা কখন এলি? বেশ, বেশ, ভালো আছিস তো?

রামকানাই। (প্রণাম করিয়া) আজ্ঞে এইমাত্র আসছি—

পণ্ডিত। আপনার এই লোকটা ভারি উদ্ধত স্বভাব—কথা বলে যেন তেড়ে মারতে আসে।

জমিদার। ওরে রামা! বাবুদের কিছু বলিস-টলিস নে।

রামকানাই। যে আজ্ঞে।

জমিদার। ও আমার বহুকেলে পুরোনো চাকর কিনা—কারুর কথা-টথা বড় শোনে না। তবে লোকটা ভালো—দেশে গিছিল, আজ বহুকাল পরে এল।

খেঁটুরাম। ইনি হচ্ছেন কেবলচাঁদ ওস্তাদ—

ভুলিরাম। মস্ত গাইয়ে।

খেঁটুরাম। আশ্চর্য! যত ওস্তাদ এসেছিল ওর চেহারা দেখেই দে চম্পট।

ভুলিরাম। তা হবে না? এঁরই গান শুনে আমাদের নবাবসাহেব মূর্ছো গেছিলেন এরই গান শুনবার জন্য কিষাণবাবু তেতাল্লিশ মাইল পথ হেঁটে গেছিলেন—

খেঁটুরাম। একে সভায় রাখতে কত রাজা বাদশা হদ্দ হল।

ঢুলিরাম। কত টাকাকড়ির শ্রাদ্ধ হল।

খেঁটুরাম। কত ওস্তাদ গাইয়ে জব্দ হল।

পণ্ডিত। ওহে, বেশি বাড়িয়ে কাজ কি? আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—অলমতিবিস্তারেণ—বেশি বাড়াতে নেই।

খেঁটুরাম। আমি অনেক হাঙ্গামা করে তবে ওঁকে এনেছি।

ঢুলিরাম। তুই এনেছিস? দেখলেন মশাইরা, কাজ করব আমি, আর বাহাদুরি নেবেন উনি!

খেঁটুরাম। খবরদার!

ঢুলিরাম। চোপরও!

খেঁটুরাম। ফের!

পণ্ডিত। সমাশ্বসীহি, সমাশ্বসীহি জমিদারমশায়ের সামনে এমন গর্হিত আচরণ করতে নেই! আহা! সঙ্গীতশাস্ত্র-রসানভিজ্ঞ, সঙ্গীত আর ন্যায়শাস্ত্র বুঝলেন কিনা—অতি উপাদেয় জিনিস! আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—অদ্ভুত-তত্ত্বাবে চ্ঃ সে এক অত্যদ্ভুদ ব্যাপার—

জমিদার। তাহলে গান আরম্ভ হোক? ওস্তাদজি, আপনি মাঝে মাঝে আমাদের গান-টান শোনাবেন—

কেবল। হ্যাঁ, তা, শোনাব বৈকি—অবিশ্যি এর দরুন আমার সব কাজকর্মের বড্ড ভয়ঙ্কর ক্ষেতি হবে, কিন্তু তা হোক—

পণ্ডিত। আরে ছো, ছো! তুমি তো ভারি ছোটলোক হে। এই সামান্য কাজটুকু করতেও তোমাদের যত রাজ্যের আপত্তি! আজ যদি জমিদারমশাই আদেশ করেন, এখেনে একটা টোল খুলতে হবে—আমার একশো কাজ থাক, হাজার কাজ থাক, আমি অমনি টোল খুলতে লেগে যাব। কেন? না, এটা আমাদের কর্তব্য। আমাদের উচিত যে ওঁর খাতিরে কিছু ত্যাগ স্বীকার করি, হোকগে ক্ষেতি, তাতে কি? বিশ্বাস হচ্ছে না? রামা। যাও তো, এখুনি একটা

লোক পাঠিয়ে আমার জিনিসগুলো ধাঁ করে আনিয়ে দাও তো—চণ্ডী জমিদারমশায়ের সম্মান রাখতেই হবে।

জমিদার। কিন্তু এখেনে জায়গায় যে বড় অসুবিধে—

পণ্ডিত। কিচ্ছু না, কিচ্ছু না—ওর মধ্যেই সুবিধা করে নেব। বুঝলেন চণ্ডীবাবু, আপনি আমার জন্যে চিন্তিত হবেন না। রামা!

রামকানাই। আবার কেন?

পণ্ডিত। ঐ বাইরের বড় ঘরটায় আমার বন্দোবস্ত করে দাও তো।

রামকানাই। সেখেনে দেখলুম দুটি বাবু বসে আছেন।

দুলিরাম! হ্যাঁ, হ্যাঁ, আমার গাঁয়ের লোক। আপনার বাগানটা দেখলুম নষ্ট হয়ে যাচ্ছে—তাই ওদের বলে কয়ে এনেছি। ওরা এ বিষয়ে একেবারে একস্‌পার্ট। মাইনের জন্য ভাববেন না—পঞ্চাশ টাকা দিলেই হবে।

পণ্ডিত। যা! বাবুদের হটিয়ে দে। বলগে ওখেনে টোল বসবে।

দুলিরাম। সিকী! আমার গাঁয়ের লোক। হবুগ্রামের অপমান!

পণ্ডিত। আরে না, না—রামা, দেখিস যেন বাবুদের ধমক-ধামক করিস নে—জমিদার মশায়ের যাতে অখ্যাতি না হয়—মিষ্টি করে বলবি। আর দেখ্ (গলা নামাইয়া) নেহাত যদি না শোনো ঘাড়ে ধাক্কা দিয়ে দিস।

খেটুরাম। শোন্—ঘর-টর দিয়ে কাজ নেই—জিনিসপত্রগুলো এনে উঠোনে ফেলে রাখিস—

পণ্ডিত। আর দেখ্—ঐ শব্দকল্পদ্রুমখানা আনতে ভুল হয় না যেন—আর কয়েকখানা মূল্যবান বই আছে—

দুলিরাম। যেমন কথামালা ধারাপাত—

পণ্ডিত। সেগুলো হারায় না যেন—

কেবল। হ্যাঁ—সেই গানের কথাটা চাপা পড়ে গেল—

রামকানাই। হ্যাঁ, হ্যাঁ, গানটা হয়ে যাক—তারপর যাব এখন!

কেবল। এখানে বাজিয়ে কেউ নেই?

রামকানাই। আমি বাজাতে পারি—দাও তো পাখওয়াজটা—ধত্তেরে কেটে তাগ ঘ্ড়ান্ ঘ্ড়ান্ নাগে নাগে নাগে নাগে—নাগে দেৎ ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে ঘেঘে তেটে—কই! গান আসছে না বুঝি?

পণ্ডিত। ইকী! চাকরটা এরকম করে কেন?

জমিদার। পুরোনো লোক কিনা! রামা, তুই এখন চুপ কর—বাবুদের বাধা দিস নে।

রামকানাই। যে আজ্ঞে!

কেবলচাঁদের গান

তানানা তাইরে নারে—তারে না তাইরে
নারে—তারে না তাইরে নাইরে—না-তানা-ন্না—

রামকানাই। এই যা! তাল কেটে গেল।

কেবল। আর কেন? থামো না বাপু!

রামকানাই। কেন মশাই? থামব কেন? নাগেদেৎ ঘেঘেতেটে ঘেঘেতেটে ঘেড়ে নাগ তেরে কেটে দেৎ—দ্রেগে দ্রেগে দ্রেগে—

পণ্ডিত। ওহে, জমিদারমশায়ের সামনে অমন করতে নেই—আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—গত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ—বুঝলে কিনা।

জমিদার। রামা, তুই একটু কাজে যা—পুরোনো মানুষ কিনা!

ছলিরাম। হ্যাঁ, ওস্তাদজি—ঐ যে গাইলেন ওটা কি তাল বলছিলেন?

কেবল। ওটা—ওটা হচ্ছে মান্দ্রাজী একতালা।

খেঁটুরাম। সবে একতালা? আহা, যখন চৌতালায় উঠবে—তখন না জানি কেমন হবে!

রামকানাই। তখন সব কানে তালা লেগে যাবে।

পণ্ডিত। হ্যাঁ ওস্তাদজি, তাহলে আপনার গানটা শিগ্‌গির শেষ করে ফেলুন—আহা, অতি উচ্চাঙ্গের সংগীত!

রামকানাই। ভারি উচ্চাঙ্গ! সেই আমাদের একজন যা ইমন-কল্যাণের আলাপ করছিল—সেটা পুরোপুরি শিখতে পারি নি। যেটুকু শিখেছি শুনবেন? আ—আ—আ—কেউ কেউ কেউ।

জমিদার। রামা!

রামকানাই। যে আজ্ঞে।

[রামকানাইয়ের দ্বার পর্যন্ত প্রস্থান।

কেবলচাঁদের গান

কেবল। হায় রে সোনার ভারত—

ঘটি ও কেষ্টার উচ্চহাস্য

ঘটিরাম। হাসিয়ে দিলি যে?

কেষ্টা। হাসিয়ে দিচ্ছিস কেন রে?

ঘটিরাম। তুই তো আগে হাসছিলি—

কেষ্টা। যাঃ! আমি কখন হাসলাম—

কেবল। দেখলেন মশায়! গম্ভীর বিষয়, এর মধ্যে কি কাণ্ডটা কললে!

খেঁটুরাম। রামা! একে সটাং রাস্তা পার করে দিয়ে আয় তো—

রামকানাই। (ওস্তাদকে ধরিয়া) একে?

[ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রস্থান।

কেবল। এইও, ইসটুপিট বেয়াদোব, ভদ্রলোকের গায়ে হাত তুলিস্!

পণ্ডিত। ইকী! ইকী! কাকস্য পরিবেদনা, গতস্য শোচনা নাস্তিক!

জমিদার। রামা, তুই একটু কাজে যা দেখি—তুই আমার নাম ডোবাবি দেখছি।

[রামকানাইয়ের প্রস্থান।

কেবলচাঁদের আবার গান আরম্ভ

কেবল।

হায় রে সোনার ভারত দুর্দশাগ্রস্ত হইল
অবসাদ হিমে ডুবিয়ে ডুবিয়ে ধুলায়
পতিত রইল
যে দেশে শ্রেষ্ঠতার এত সব ভূরি ভূরি
প্রমাণ বর্তমান
আজকাল তাকেই কিনা—সব অবজ্ঞা
করিতেছে—
এবং দেখাচ্ছে সবাই মর্তমান
কোথা সেই তিরিশ কোটি আটানব্বই লক্ষ
সাড়ে চোদ্দ হাজার মাতৃভক্ত ভারত সন্তান
সহ্য হবে না হবে না তাদের হৃদয়ে
সবাই জাগো জাগো উঠে পড়ে লাগো দেশোদ্ধারে ব্রতী হও হে!

তুলিরাম। এই! সিডিশাস্!

পণ্ডিত। অ্যাঁ, কি বললে? রাজদ্রোহসূচক? অ্যাঁ?

খেঁটুরাম। তবে রে! সিডিশাস্ গান কচ্ছিস কেন রে?

তুলিরাম। জানিস, আমার মামাতো ভাই গবর্মেণ্টের চাকরি করে।

খেঁটুরাম। হ্যাঁরে, ওর মামাতো ভাইয়ের চাকরি ঘোচাবি কেন রে?

কেবল। আমি তো জানতুম নে—আমি তো জানতুম নে—

পণ্ডিত। জানতি নে কিরে? কেন জানতি নে?

পণ্ডিতের কেবলচাঁদকে প্রহার

কেবল। কী! মারলি কেন রে? ফের মার দেখি!

পণ্ডিতের কেবলচাঁদকে পুনঃ প্রহার

এবার মারবি তো একেবারে—

পণ্ডিতের কেবলচাঁদকে পুনঃ প্রহার

উঃ! এত জোরে মারলি কেন রে ইসটুপিট। দাঁড়া দেখাচ্ছি—

[কেবলচাঁদের পলায়ন

পণ্ডিত। যা না গাইলেন! গলা শুনলে ছত্রিশ রাগিণী ছুটে পালায়।

হুলিরাম। ওর পেটের মধ্যে ডুবুরি নামালে, গানের গ'টা মেলে কিনা সন্দেহ।

পণ্ডিত। তোমরা কোত্থেকে এ-সব আপদ জোটাও হে? জমিদার মশায়ের খ্যাতি প্রতিপত্তির দিকে কি তোমাদের একটুকুও দৃষ্টি নেই?

খেঁটুরাম। এই হুলিরামটাই তো যত নষ্টের গোড়া, যত রাজ্যের অঘামারা রোথো লোক ডেকে আনবে।

হুলিরাম। বিলক্ষণ। আমি ডেকে আনলাম? আমার সাতজন্মে ওর সঙ্গে আলাপ নেই।

খেঁটুরাম। এত করে বারণ কললুম, তবু ডেকে আনলে।

হুলিরাম। না, মশাই! ও নিজে ডেকে এনেছে, আমি আদবে কিছু জানি নে!

পণ্ডিত। জানো না তো জানো না—তা অত গরম হবার দরকার কি? আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—উগ্রত্বমগ্ন্যাতপসং প্রয়োগাৎ—

জমিদার। এবারে গরমটা কেমন টের পাচ্ছ বল দেখি—

খেঁটুরাম। আঃ! গরম বলে গরম! আগুন লাগে কোথা! উঃ!

ছুলিরাম। আমাদের বেড়ালটা সর্দি-গমি হয়ে মারা গেছে—

জমিদার। এ-সব বোধহয় সেই ধূমকেতুর জন্যে—

পণ্ডিত। হ্যাঁ, সিদিন আমাদের ওখেনে ধূমকেতুর ন্যাজ দেখা গিছিল—

ছুলিরাম। কার ন্যাজ কে জানে?

খেঁটুরাম। ওঁরই ন্যাজ হয়তো।

জমিদার। ধূমকেতুটা এসে কি কাণ্ডই কল্‌ল? ঝড়, বৃষ্টি, ভূমিকম্প—

খেঁটুরাম। প্লেগ, দুর্ভিক্ষ, বেরিবেরি—

ছুলিরাম। পানের পোকা, এলাহাবাদ একজিবিশান!

পণ্ডিত। আমি শুনেছি এ পানের পোকার খবরটা নাকি সত্যি নয়।

খেঁটুরাম। আলবাৎ সত্যি! নন্দলাল ডাক্তার স্বচক্ষে দেখেছে লোকে পান খাচ্ছে আর মরছে।

জমিদার। ঈস! বল কি হে? তাহলে তো কথাটা সত্যি বলতে হবে।

পণ্ডিত। হ্যাঁ—দুরবীন দিয়ে সে পোকা দেখা গেছে।

খেঁটুরাম। কলকেতার সায়েব ডাক্তার বলেছে তার ভয়ঙ্কর তেজাল বিষ।

ছুলিরাম। হ্যাঁ—আমি দেখিছি, সাদা মতন আবার ন্যাজ আছে। কার ন্যাজ কে জানে?

রামকানাইয়ের দ্রুত প্রবেশ

রামকানাই। এই রে সেই দাড়িওয়ালা। সেই দাড়িওয়ালা বাবুটা আমায় তেড়ে এসেছিল। উঃ!

সকলে। কি হয়েছে। কি হয়েছে?

রামকানাই। সেই বাইরের ঘরের বাবুরা—উঃ—আমায় বেদম

মারপিট করেছে। একজন ছাগলদাড়ি বাবু আছে, সে আমায় দেখেই হঠাৎ ছাতের সমান লাফ দিয়ে তেড়ে এসেছিল—উঃ!

পণ্ডিত। সিকী রে! তুই করেছিলি কি?

রামকানাই। আমি তো কিচ্ছু করি নি—আমি বললুম, এখানে ঢোল বসবে, বাবুরা যদি একটু অন্যত্তর যান, নেহাত যদি না যান, আপনাদের ঘাড়ে ধাক্কা দেওয়া হবে।

হুলিরাম। কি! ভদ্রলোককে এমনি করে ইনসাল্ট।

খেঁটুরাম। যত বড় মুখ নয় তত বড় কথা।

রামকানাই। আমি তো মিষ্টি করে বলেছিলুম—

খেঁটুরাম। ব্যাটা, তোমায় মিষ্টি জুতো না দিলে তুমি সিধে হবে না—

পণ্ডিত। আমার জিনিসপত্রগুলো কি কল্‌লি?

রামকানাই। ঐ যে, বাইরের উঠোনে ফেলে রেখেছি।

পণ্ডিত। দেখলেন মশাই, কাণ্ডটা দেখলেন?

রামকানাই। এই বাবুটি যে বললেন।

পণ্ডিত। যা, যা, যেখানে হয় শিগগির বন্দোবস্ত করে দে। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে এক জায়গায় এমনি লিখেছে—

রামকানাই। বলি ন্যায়শাস্ত্র শুনলে তো আর পেট ভরবে না! তোমরা কি এইখেনে বসেই রাত কাবার করবে নাকি? জমিদার-মশায়ের কি আর খাওয়া-দাওয়া নেই?

জমিদার। ওরে রামা, অমন করে বলতে নেই—বাবুদের মান্য করে কথা বলিস—আর পণ্ডিতমশাইকে কি চোখ রাঙায়?

রামকানাই। যে আজ্ঞে, প্রাতঃ প্রণাম পণ্ডিতমশাই!

পণ্ডিত। রামা, নেতাইবাবুর বাড়ি আমার দুই পোড়ো থাকে, তাদের খবর দিস তো।

[পণ্ডিত, খেঁটুরাম ও হুলিরামের প্রস্থান

জমিদার। রামা, দেখছিস তো কাণ্ডটা?

রামকানাই। আজ্ঞে হ্যাঁ—

জমিদার। উৎপাত যে বেড়ে চলল—কি করা যায়?

রামকানাই। আজ্ঞে, হুকুম পেলেই সব সাফ করে দি।

জমিদার। না, না, ওরা আপনা থেকে উঠে যায়, এমন কিছু করা যায় না? অথচ আমার নিন্দেটা না হয়।

রামকানাই। তাহলে ওদের ঘরে লঙ্কার ধোঁয়া দিলে হয় না?

জমিদার। দূৎ! এটাকে কিছু জিজ্ঞেস করাই ঝকমারি! যা, তুই এক কাজ কর—আমার মামার বাড়ি যা। সেখেন থেকে কেদার-মামাকে ডেকে আনবি—তাকে সব বলে কয়ে আনিস!

রামকানাই। যে আজ্ঞে—

জমিদার। মামা এলেই সব সিধে করে দেবে—উকিলে বুদ্ধি কিনা!

জুড়ির প্রবেশ ও গান

নাছোড়বান্দা নড়েন না।
উড়ে আসেন, জুড়ে বসেন,
মাথায় কেন চড়েন না।
নাছোড়বান্দা নড়েন না।
যাবার নামটি করেন না,
ধাক্কা দিলে সরেন না।
নাছোড়বান্দা নড়েন না।
কর্চ্ছে সবাই যা'চ্ছা তাই।
চাকর ব্যাটা দিচ্ছে গাল,
হাঁ করে সব খাচ্ছে তাই।
কর্চ্ছে সবাই যা'চ্ছা তাই।
আসছে যে কেউ পাচ্ছে ঠাঁই,

ইকিরকম হচ্ছে ভাই ?
কচ্ছে সবাই যা'চ্ছা তাই।

তৃতীয় দৃশ্য

জমিদার বাড়ি

কেদারকৃষ্ণ, জমিদার ও রামকানাই

কেদার। ডোণ্ট্ পরওয়ার ভাগ্নে। আমি সব ঠিক করে দিচ্ছি। তুমি বড় জোর দুটো দিন গা ঢাকা দিয়ে থাক। রামা।

রামকানাই। আজ্ঞে—

কেদার। তুই মেলা বুদ্ধি খরচ করিস নে—যা বলব তাই করে যাবি। আগে আমার বইগুলো আর খাতা পেনসিলটে বার করে রাখ। [রামকানাইয়ের প্রস্থান

ভাগ্নে, তুমি নাকে সরষের তেল দিয়ে ঘুমোও গিয়ে, আমি সব সাবাড় করে দিচ্ছি—কিছু গোল-টোল বাধলে সব দোষ আমার ঘাড়ে চাপিয়ে দিও—আমায় গাল দিয়ে একেবারে ভূত ছাড়িয়ে দিও।

[উভয়ের প্রস্থান

পণ্ডিত ও দুলিরামের প্রবেশ

পণ্ডিত। হ্যাঁ দেখ, কাল জমিদারমশাই বড় আপসোস কচ্ছিলেন, বলছিলেন, এই খেঁটুরামের উৎপাতে তাঁর আর সোয়াস্তি নেই—ওকে যত শিগ্‌গির পার অর্ধচন্দ্র দিয়ে বিদায় করে দাও—আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে, প্রহারেণ ধনঞ্জয়ঃ—বুঝলে কি না ?

দুলিরাম। হ্যাঁ, এ আর একটা মুশকিল কি ? এক্ষুনি ঘাড় ধরে—

খেঁটুরামের প্রবেশ

দাঁড়ান আমার গাঁয়ের লোক দুটোকে ডেকে আনি।

[দুলিরামের প্রস্থান

পণ্ডিত। হ্যাঁ দেখ, কাল জমিদারমশাই যা শেষটায় ওর জন্যেই তোমাদের সক্কলের অন্ন মারা যাবে। ওকে যদি তাড়াতে পার, আঃ—জমিদারমশাই যা খুশি হবেন!

খেঁটুরাম। ব্যস্ত হচ্ছেন কেন? সব কয়টাকে ভাগিয়ে দিচ্ছি, (স্বগত) তোমাকে সুদ্ধু।

পণ্ডিত। আর তোমার নিন্দেটা যা করে, কী বলব—এইমাত্র তোমার নামে যা নয় তা বলে গেল। রামা! ওরে রামারে! ঝট করে দুটো পান দিয়ে যা তো—রামাটা গেল কোথায়? ওহে, রামাকে একটু ডেকে দাও তো।

দুলিরামের প্রবেশ

খেঁটুরাম। না রে, ডাকিস নে।

দুলিরাম। রামা!—হয়তো বাড়ি নেই।

খেঁটুরাম। রামাটা ভারি দুষ্টু! এতক্ষণ হয়তো ছিল, যেই আপনি ডেকেছেন, অমনি হয়তো পালিয়েছে।

দুলিরাম। হয়তো অসুখ-টসুখ করেছে।

পণ্ডিত। তোমরা হয়তো-হয়তো করেই সব সারলে দেখছি! রামারে! রামা, জমিদারমশাই নীচে নামলে একটু খবর দিস তো, আমার একটু নিরিবিলি কথা আছে।

রামকানাইয়ের প্রবেশ

খেঁটুরাম। আ মোলো যা! আমারও নিরিবিলি কথা কথা আছে।

দুলিরাম। আমারও আছে—

রামকানাই। তোমরা বসে-বসে ভেরেণ্ডা ভাজো, তিনি আজ নীচে নামছেন না—তাঁর মামা এসেছেন যে। তাঁকে কিন্তু তোমরা চটিও না, ভারি বদমেজাজ আর রগচটা—এই যে তিনি আসছেন—আসুন—ইনিই কেদারকেষ্টবাবু, জমিদারমশায়ের মামা।

কেদারকৃষ্ণের প্রবেশ। সকলের অভিবাদন

পণ্ডিত। আসুন, আসুন—আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে নরানাং মাতুলক্রমঃ। আপনার ভাগ্নেটি—আহা! অতি চমৎকার লোক। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—

ছুলিরাম। নাঃ! আবার ন্যায়শাস্ত্র শুরু করল!

খেঁটুরাম। চল আমরা একটু ঘুরে আসিগে।

কেদার। এই লোক দুটোর চেহারা তো বড় সুবিধের নয়—

পণ্ডিত। তা সুবিধের হবে কোত্থেকে—হাজার হোক ছোটলোক। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—মিষ্টান্নমিতরে জনাঃ। আপনার ভাগ্নে তো কাউকে কিছু বলেন না—তাই ওরা আস্কারা পেয়ে গেছে। এমনি বেয়াদবী করে—কি বলব!

কেদার। বটে! তা আপনারা প্রতিকার করেন না কেন?

পণ্ডিত। কি করি বলুন? আপনারা থাকতে আমার তো কিছু বলা উচিত হয় না।

কেদার। এক কাজ করুন, এর পর যদি কিছু বাড়াবাড়ি করে, ঘাড়টি ধরে বার করে দেবেন।

পণ্ডিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তাই তো করা উচিত। আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—যা শত্রু পরে পরে।

কেদার। আহা, আপনার সঙ্গে কথা কয়েও সুখ আছে—কি পাণ্ডিত্য! আবার কি মিষ্ট স্বভাব। আমার এই ক'টা লেখা আছে, এগুলো আপনাকে একটু শোনাই—এমন সমজদার লোক তো আর সচরাচর জোটে না! অমানিশার গভীর তমসাজাল ভেদ করিয়া ঐ পূর্বদিকে তরুণ তপন ধীরে-ধীরে উঁকি মারছে। বিহঙ্গের কলকল্লোলে, শিশিরসিক্ত বায়ুর হিল্লোলে দিগদিগন্ত আমোদিত মুখরিত উচ্ছ্বসিত হইয়া, আহা, স্বভাবের সেই শোভা ভারি চমৎকার হয়েছে। হে নিদ্রিত মানব সকল। ঐ শুনো বাছুরগুলি ল্যাজ তুলিয়া হাম্বা-হাম্বা

ছুটিতেছে, তোমরা উত্তিষ্ঠত জাগ্রত। আহা, কবিরা তো সত্যই বলিয়াছেন, 'পাখি সব করে রব রাতি পোহাইল—'

পণ্ডিত। চমৎকার হয়েছে! আমার একটু কাজ আছে—এক্ষুনি কাজ আছে—এক্ষুনি যেতে হবে।

কেদার। একটু দাঁড়ান, এই জায়গাটা 'ভারি ইন্টারেস্টিং ঃ [কেদারকৃষ্ণের পুনরায় পাঠ] দিন নেই, রাত নেই, সকাল নেই, বিকাল নেই, রোদ নেই, বৃষ্টি নেই, শীত নেই, গ্রীষ্ম নেই—কেবল সেই এক কথা, সেই এক চিন্তা, সেই এক কল্পনা, এক জল্পনা, এক তন্ত্র, এক মন্ত্র।—কেমন ?—সমুদ্রের ফেনিলাম্বুরাশি নীলাম্বরাভিমুখে নৃত্য করিতে-করিতে নিত্য-নবোৎসাহে—কেমন ? ভাষার কেমন একটা সহজ ভঙ্গি আছে সেইটা লক্ষ্য করেছেন ?—সমুদ্রের ফেনিলাম্বুরাশি নীলাম্বরাভিমুখে নৃত্য করিতে-করিতে নিত্য নবোৎসাহে সেই একই স্বর, সেই একই ছন্দ, সেই একই সঙ্গীতকে ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত করিয়া তুলিতেছে—তাহার শেষ নাই, অন্ত নাই, বিরাম নাই, বিশ্রাম নাই, ক্লান্তি না, বিচ্ছেদ নাই—

পণ্ডিত। দাঁড়ান, আমার বড় তাড়াতাড়ি—ধাঁ করে এক্ষুনি আসব।

[পণ্ডিতের প্রস্থান

কেদার। হ্যাঁ, একেবারে ব্রহ্মাস্ত্র ঝেড়ে দিয়েছি—আচ্ছা, আবার ঘুরে আসুক—হাড় জ্বালিয়ে ছাড়ব!

[কেদারকৃষ্ণের প্রস্থান

নেপথ্যে খেঁটুরাম ও তুলিরামের কণ্ঠস্বর

খেঁটুরাম। দেখ, চোরের দশদিন আর সাধুর একদিন।

তুলিরাম। হ্যাঁ, হ্যাঁ, তুই তো সবই করবি, যা! যা!

খেঁটুরাম ও তুলিরামের প্রবেশ

খেঁটুরাম। দেখ, মেলা চালাকি করিস নে, কিছু বলি নে বলে ?

তুলিরাম। একদিন ধরে এইসা পিট্‌টি দেব—

খেঁটুরাম। দেখ, এ-সব আমি পছন্দ করি না কিন্তু—

তুলিরাম। দাঁড়া, আমার গাঁয়ের লোক তুটোকে ডেকে আনছি—

পণ্ডিতের প্রবেশ

পণ্ডিত। [তুলির প্রতি] ওহে, হস্ত থাকিতে কেন মুখে কথা বল, ঘা তু-চার লাগিয়ে দেও না—

খেঁটুরাম ও তুলিরামের লড়াই—পণ্ডিতের বাধা প্রদান

অ্যাঁ! মারামারি কচ্ছ ? এক্ষুনি ঘাড় ধরে বের করে দেব।

খেঁটুরাম। কি! উড়ে এসে জুড়ে বসেছেন, আবার কথার ভঙ্গি দেখ।

তুলিরাম। ঘাড় ধরবে ? আমার গাঁয়ের লোকতুটো গেল কোথায় ?

পণ্ডিত। তোমাকে বলি নি তো তোমাকে বলি নি!

খেঁটুরাম। তবে আমাকে বলেছ ?

খেঁটুরামের পণ্ডিতকে প্রহার

পণ্ডিত। ইকী! উঃ! ওরে রামা! রামারে। শিগগির ছুটে আয়, ওহে, উঃ! দেখ, আমাদের ন্যায়শাস্ত্রে বলেছে—উঃ!

কেদারকৃষ্ণ ও রামকানাইয়ের প্রবেশ

রামকানাই। তোমরা কি আরম্ভ করেছ বল দেখি ? দিনরাত কেবল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ?

খেঁটুরাম। কি আরম্ভ করেছিস বল দেখি ?

তুলিরাম। দিনরাত কেবল কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ ?

পণ্ডিত। আমাকে মারতে-মারতে একেবারে কালশিরে পড়িয়ে দিয়েছে।

কেদার। দেখ, আমার ভাগ্নে ভালোমানুষ, এ-সব সইতে পারে—কিন্তু আমার সহ্য হয় না। রামা!

রামকানাই। যে আজ্ঞে।

রামকানাইয়ের খেঁটুরাম ও ছুলিরামকে গলহস্ত

খেঁটুরাম। কী! ভদ্দোরলোকের ঘাড়ে ধাক্কা!

ছুলিরাম। চাকর দিয়ে ইন্‌সাল্ট্।

খেঁটুরাম। কী! এতবড় কথা! এক্ষুনি আমি রাগ করে বাড়ি চলে যাব। তোকে অপমান করেছে—কক্ষনো এখেনে থাকিস না—আচ্ছা থাক, এবার মাপ করা গেল। আর একবার করলে টের পাইয়ে দেব। আমার গাঁয়ের লোক ডুটোকে খবর দিচ্ছি।

[খেঁটুরাম ও ছুলিরামের গম্ভীরভাবে প্রস্থান, রামকানাইয়েরও প্রস্থান।

পণ্ডিত। দেখলেন তো! এর উপর তো আর ওষুধ চলে না!

কেদার। হ্যাঁ—তা আসুন—একটু কাব্যালাপ করা যাক।

পণ্ডিত। এই মাটি করেছে—আচ্ছা—আজ রাত্রে বেশ করে শোনা যাবে।

কেদার। না, রাত্রে তো সুবিধে হবে না—আমার চোখে খারাপ কিনা! শুনুন—ছেলেবেলায়, তখন আমার বয়স খুব কম ছিল—সাত বছর কি আট বছর হবে, কি বড় জোর নয় কি দশ কি এগারো। সেই সময় আমি একখানা বই পড়েছিলাম—আঃ, সে একখানা বইয়ের মতো বই বটে! এখনো যখন তার কথা মাঝে-মাঝে স্মৃতিপথে উদিত হয়, মন যেন একেবারে উৎসাহে আপ্‌লুত হয়ে যায়। শুনুন—চমৎকার বই, 'বোধোদয়'—শ্রীঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর প্রণীত—

পণ্ডিত। ও আমি পাঁচশোবার পড়েছি।

কেদার। পড়েছেন? কেমন! স্বীকার করুন, ভালো বই না? শুনুন—

কেদারকৃষ্ণের 'বোধদয়' পাঠ

পণ্ডিত। ঘ্যান-ঘ্যান করে মাথা ধরিয়ে দিলে—

ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রবেশ

ঘটিরাম। মাথা ধরেছে ? অ্যাঁ ?

কেষ্টা। আজ বুঝি আমাদের ছুটি ? অ্যাঁ ?

পণ্ডিত। যা! এখন ত্যক্ত করিস নে—

কেষ্টা। কিরে, তোকে মারল নাকি ?

ঘটিরাম। দূৎ! আমাকে মারবে কেন ? তোকে তো মারল।

কেষ্টা। হ্যাঁঃ! নিজে মার খেয়ে এখন—

ঘটিরাম। আমি দেখলুম তোকে মারল—

[ঘটিরাম ও কেষ্টার প্রস্থান

কেদার। হ্যাঁ, তারপর শুনুন—

পণ্ডিত। এ তো আচ্ছা বেল্লিকের হাতে পড়া গেল! ইকী মশায়! বলছি শুনব না—কেন খামখা বিরক্ত কচ্ছেন ?

কেদার। আহা! এইটে শুনে নিন—আমি ছেলেবেলায় একটা পোয়েট্রি লিখেছিলাম—তখন বয়েস অল্প। কিন্তু সে হিসেবে লেখাটা কেমন দেখুন—

কেদারকৃষ্ণের কবিতা পাঠ

একদা সকালে আমি খাইতেছিলাম ভাত
হেন কালে ধেয়ে আসে প্রকাণ্ড এক ব্যাঘ্র
ভয় পেয়ে সকলে তো থরহরি কম্পমান
চিৎকারিল কেহ সুকরুণ আর্তরবে

অথবা যেমতি

লটখটে গোরুর গাড়ি চলিবার কালে
প্রকাশে দারিদ্র্য নিজ বিচিত্র বিলাপে—
কেহ জপে রাম নাম—আমি হয়ে ক্রুদ্ধ
ডাকিলাম ভৃত্যকে—'হরে, ধেয়ে যাও দ্রুত
রাস্তার দরজাটা করে দাও বন্ধ—

আর নিয়ে এস ঝট করে তিনতলা হতে
আমার সে দু-নলা বন্দুক'—এইরূপে
বাখানিল সবে মোর উপস্থিত বুদ্ধি
কহিল সকলে, 'আজি মরিতাম নির্ঘাত
যদি না থাকিত ব্যাঘ্র পিঞ্জরের মধ্যে—'

পণ্ডিত। হাড় জ্বালালে দেখছি—

কেদার। (স্বগত) বকে-বকে গলা শুকিয়ে গেল—এখন রামাকে লেলিয়ে দি গিয়ে—

[কেদারকৃষ্ণের প্রস্থান

খেঁটুরাম ও হুলিরামের প্রবেশ

পণ্ডিত। যাও, যাও এখন আমায় ঘাঁটিও না, আমার মেজাজ ভালো নেই।

খেঁটুরাম। ওরে বাসরে, দুর্বাসা মুনির মেজাজ ভালো নেই!

হুলিরাম। দেখিস ঘাঁটাস-টাঁটাস নে—শেষটায় ব্রহ্মতেজে ভস্ম হয়ে যাবি।

রামকানাইয়ের প্রবেশ

রামকানাই। ওয়াক্—থুঃ—থু—থু—থু—ওয়াক্—

খেঁটুরাম। ইকীরে? ওরকম কচ্ছিস কেন?

রামকানাই। অ্যাঁ—থু—থু—কেরোসিন তেল খেয়ে ফেলেছি।

হুলিরাম। কেসোসিন তেল খেয়েছিস?

খেঁটুরাম। সিকি! কেরোসিন খেতে গেলি কেন রে?

রামকানাই। সখ করে কি আর কেউ কেরোসিন খায়? গায়ে লেখা ছিল—লেমন্ সিরাপ!

হুলিরাম। এখন একটা দেশলাইয়ের কাটি খেয়ে ফেল্—তাহলেই সব ল্যাঠা চুকে যায়।

রামকানাই। কি পণ্ডিতমশায়, আপনার ন্যায়শাস্ত্রে আর কিছু বলে-টলে নি?

খেঁটুরাম। (মশা মারিতে মারিতে) আর দাদা ন্যায়শাস্ত্র-টাস্ত্র ভালো লাগে না—বলি আজকাল মশাটা কেমন বল দেছি?

রামকানাই। বরাবর যেমন থাকে, ছোট-ছোট কালো মতন, উড়ে বেড়ায়—

খেঁটুরাম। আহা, বলি লাগে কেমন?

রামকানাই। তা কি করে বলব? কখনো ভাজাও করি নি, চচ্চড়িও খাই নি।

খেঁটুরাম। হ্যাঁ, বলি অত্যেচারটা দেখছ তো?

রামকানাই। অত্যেচার আবার কি! চুরিও করে না, ডাকাতিও করে না, পরের বাড়িতে আড্ডাও মারে না—

পণ্ডিত। ওহে দেখ, তোমাদের ও-সব ইয়ার্কি মারতে হয় বাইরে গিয়ে কর—আমার কাছে নয়! রামা! আমার ব্যাকরণটা গেল কোথায়—

রামকানাই। ট্যাক্‌রম্‌?

পণ্ডিত। তবেরে, ণত্বমিচ্ছন্তি বর্বরাঃ, আমার সঙ্গে রসিকতা?

রামকানাই। আবার রসিকতা কি কললুম?

পণ্ডিত। বলি, বইখানা কি কাগে নিল, না উড়ে গেল বাতাসে?

রামকানাই। বাতাসা?

পণ্ডিত। হ্যাঁ, হ্যাঁ, বাতাসা—বাতাসা খাওয়াচ্ছি—এইরকম করে তোরা জিনিসপত্র লোকসান করবি? ব্যাটা হতভাগা জোচ্চোর—

পণ্ডিতের রামকানাইকে প্রহার। ছুলিরাম ও খেঁটুরামের পলায়ন

রামকানাই। মেরে ফেললে রে! উঃ—ইকী মশাই! দাঁড়াও আমি মামাবাবুকে ডাকছি, আর পুলিসে খবর দিচ্ছি।

পণ্ডিত। ওহে শোনো-শোনো—আমি কিন্তু সেরকম ভাবে মারিনি।

রামকানাই। মেরেছ তার আবার রকম বেরকম কি হে? পুলিস! পুলিস! উঃ!

রামার পতন। কেদারের প্রবেশ। পণ্ডিতের পলায়ন

কেদার। কিরে, চেঁচিয়ে বাড়ি মাথায় কললি যে! ব্যাপারটা কি?

রামকানাই। আমায় মেরেছে! উঃ—আমায় মেরেছে—উঃ! কান দুটো ভোঁ ভোঁ কচ্ছে—মাথা ঘুরছে!

কেদার। মেরেছে! বাঃ! এই তো চাই। দাঁড়া এইসা চাল চালব, একেবারে বাজি মাত। তুই এক কাজ কর, সেই দাড়িটা আর লাল পাগড়িটা ঠিক করে রাখ। আর ঐ উঠোনটায় বসে বসে আর্তনাদ করতে থাক, যখন 'কোন্ হ্যায় রে' বলে ডাক দেব, অমনি এসে হাজির হবি—একেবারে রামসিং দারোগা, বুঝলি তো? তুই খালি চেহারাটা দেখিয়ে যাবি—বোল-চাল সব আমি দেব। বাঃ আপনা থেকে দিব্যি কাজ এগিয়ে গেল, তারপর ও দুটোকে সরাতে কতক্ষণ?

[পণ্ডিতের প্রবেশ। রামকানাইয়ের প্রস্থান]

পণ্ডিত। রামার কি হয়েছে? বেশি কিছু হয়নি তো?

কেদার। না, না, বেশি কিছু হয়নি। খান চার-পাঁচ পাঁজর ভেঙে গেছে আর ডিজেস-চান অফ দি লান্গস—সাংঘাতিক! তা আপনি কিছু ব্যস্ত হবেন না। ও ব্যাটা আবার পুলিশে খবর না দেয়! সেবারে একটা এরকম কেস হয়েছিল—পুলিসে টের পেয়ে পাঁচ বছরের মতো চালান করে দিয়েছিল।

পণ্ডিত। অ্যাঁ! অ্যাঁ! পাঁচ বছর!!

কেদার। আপনি ব্যস্ত হবেন না। উঃ—সেবারে একটা লোক

মারামারি করেছিল, তাকে দিয়েছিল ঘানি ঠেলতে। বলব কি মশাই, দেড়মাসে অর্ধেক রোগা!

পণ্ডিত। অ্যাঁ—অ্যাঁ একেবারে অর্ধেক। অ্যাঁ!

কেদার। তা আপনি বেশি ভাববেন না—ঐ পুলিস ব্যাটারা কোনরকমে টের না পেলেই হল—কিন্তু আজকাল যেরকম গোয়েন্দা টিকটিকির আমদানি হয়েছে—কোন কথা লুকোবার জো নেই—আপনি কবার হাই তুললেন, তুড়ি দিলেন—সব খাতায় লেখা! সেবার এক ব্যাটা বামুন মারামারি করে লুকিয়েছিল। লুকোলে হবে কি! পুলিসে টের পেয়ে ধরে এনে পঁচিশ দফা জুতো!

পণ্ডিত। অ্যাঁ! অ্যাঁ! বামুন? জুতো!!

কেদার। বাইরে কে? কোন্ হ্যায় রে? তা আপনি বেশি ব্যস্ত হবেন না! আমি থাকতে ভয় কি? কিরকমভাবে মেরে ছিলেন বলুন তো?

পণ্ডিত। খুব আস্তে পিঠের এইখেনে—

কেদার। পিঠে! এইখেনে! সর্বনাশ! ৭৯৪ ধারা! এর উপর তো আমার হাত নেই—তা আপনি বেশি চিন্তিত হবেন না। আমি দারোগাবাবুকে বলে কয়ে আপনার মেয়াদ কমিয়ে দেব।

খেঁটুরাম ও ঢুলিরামের শশব্যস্তে প্রবেশ

খেঁটুরাম। এক ব্যাটা পুলিস ইদিকে আসছে!

ঢুলিরাম। আমায় দেখে রুল উঁচিয়ে আসছিল। আপনার বাক্সের মধ্যে একটা সোনার চেন ছিল—আমি কিন্তু সেটা চুরি করিনি।

খেঁটুরাম। চুরি হবে কোত্থেকে—যেখানে যা থাকে আমরা সব যত্ন করে তুলে রাখি।

খেঁটুরাম ট্যাঁক দেখাইল। পুলিসের বেশে রামকানাইয়ের প্রবেশ

খেঁটুরাম। এইরে! এইরে!

তুলিরাম। এই যে সিদিন নিতাইবাবুর একটা ঘড়ি চুরি হয়েছিল আমি কিন্তু তার কিছুই জানি না!

খেঁটুরাম। আর সেদিন যে চৌরাস্তার মোড়ে একটা লোক বেদম ঠেঙা খেয়েছিল—আমি কিন্তু তার গায়ে হাতও দিইনি।

তুলিরাম। আমার পুঁটলির মধ্যে সোনার চেন, নক্সাকাটা রুপোর ঘড়ি, দুটো আংটি এ-সব কিচ্ছু নেই।

পণ্ডিত। হাম পূজোর সময় তোম্‌কো বহুত মিষ্টান্ন আর পুলি পিঠে খাওয়ায়গা।

কেদার। দারোগাবাবু আতা হ্যায়?

পুলিস। হাঁ বাবু—

কেদার। হাত কাড়া লেকার?

পুলিস। হাঁ বাবু—

কেদার। বাড়ি সারচ্ হোগা?

পুলিস। হাঁ বাবু—

কেদার। সব মাটি কললে—আচ্ছা, আমি ও ব্যাটাকে একটু ফাঁক তাল্লায় সরিয়ে নিচ্ছি, আপনি এই সুযোগে সরে পড়ুন আর এ-মুখো হবেন না—বছর দুই বাড়ি থেকে বেরোবেন না। তোমরা পালিও না কিন্তু। (পুলিসের প্রতি) আচ্ছা চল—

[কেদারকৃষ্ণ ও পুলিসের প্রস্থান

পণ্ডিত। আর থামাথামি নেই—এক্কেবারে সেই বস্তি পাড়ায় আমার বাড়ি গিয়ে উঠব—ওরে ঘটে, ওরে কেষ্টা, দৌড়ে আয়—ও ঘর থেকে আমার বিছানাটা আর শব্দকল্পদ্রুমখানা নিয়ে আয় তো। শিগগির বাড়ি চল।

[পণ্ডিতের প্রস্থান

তুলিরাম। আর কেন দাদা? পৈত্রিক প্রাণটি নিয়ে সরে পড়া যাক-না!

খেঁটুরাম ! হ্যাঁ—পুলিসের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতায় কাজ কি দাদা ?

ছুলিরাম। জমিদার ব্যাটার কাণ্ডটা দেখ—আমাদের কি নাস্তা-নাবুদটাই কললে—চাকর দিয়ে ঘাড়ে ধাক্কা তার উপরে পুলিস !

খেঁটুরাম। আমরা বেচারারা যে দুটি করে খাচ্ছিলাম, সে আর তার সহ্য হল না।

ছুলিরাম। ছোটলোক ! ছোটলোক ! ওরে, গল্প আক্কেল-গুরুমটা উঠিয়ে নে। যথা লাভ।

[খেঁটুরাম ও ছুলিরামের প্রস্থান

কেদারকৃষ্ণ ও রামকানাইয়ের প্রবেশ

কেদার। দেখলি তো রামা ! একেই বলে বুদ্ধির্যস্য বলং তস্য—মানুষ চেনা চাই। ঠিক লক্ষণ দেখে ওষুধ দিতে হয়—

রামকানাই। আজ্ঞে—ঝড়ে কাগ মরে আর ফকিরের কেরামত বাড়ে—

[উভয়ের প্রস্থান

সঙ্গে সঙ্গে জুড়ির প্রবেশ ও গান

ওরে ও চণ্ডীচরণ !
তোমার কি নাইরে মরণ।
কোন্ সাহসে চাকর ডেকে
ভদ্রলোকের কান মলাও।

মন্মথ রায়

কাজীর বিচার

[ধর্মধর ঠাকুরের গৃহ—বহির্ভাগ পার্শ্বে রাজপথ। সকাল বেলা। চারজন ধূর্ত প্রবঞ্চক ধর্মধরকে ডাকছে।]

১ম। ধর্মধর ঠাকুর বাড়ী আছেন ?

২য়। ধর্মধর ঠাকুর!

৩য়। নেই।

৪র্থ। তা হলে গঙ্গাস্নানে গেছে।

১ম। এখনি ফিরবে। একটু অপেক্ষা করা যাক।

২য়। এ অঞ্চলে এই একটি মাত্র লোক যে কাউকে ঠকায়নি। আর যাকে আমরা ঠকাইনি।

৩য়। সে তো ইচ্ছে করেই ঠকাইনি। নইলে আজ আমরা এখানে কী করে আসতাম—কার কাছে গচ্ছিত রাখতাম···আমাদের হক্কের ধন।

(হক্কের ধন কথাটি শুনে তিনজন হো হো করে হেসে উঠল।)

১ম। হক্কের ধনই বটে!

৩য়। তা ছাড়া কি! চুরি বাটপাড়ি কি ব্যবসা নয় ?

২য়। তা ঠিক। কোন ব্যবসায় চুরি-বাটপাড়ি নেই!

৪র্থ। শাস্ত্রে আছে—চুরি বিদ্যে বড় বিদ্যে যদি না পড়ে ধরা।

১ম। নিশ্চয়। নইলে এই চারটি বেকার লোক বিদেশে নিয়ে গিয়ে একমাসে চারটি হাজার টাকা রোজগার করে নিয়ে এলুম। গায়ে একটা আঁচড় লাগেনি। আর কোন ব্যবসায় এটা হত ?

২য়। ঠাকুরের কাছে এই টাকাটা যে আমরা রেখে যাচ্ছি—ফিরে এসে পাবতো ?

৩য়। সে বলতে হবে না। এ অঞ্চলে এই একটি লোকই আছে যাকে—আমরা যে আমরা—আমরাও বিশ্বাস করতে পারি।

৪র্থ। সে নিশ্চয়।

১ম। এখানে না রাখলে আর রাখছিইবা কোথায়। দেশ—বিদেশে তো আর এতগুলো টাকা সঙ্গে নিয়ে বেড়াতে পারি নে।

২য়। তা ঠিক। চুরির উপর বাটপাড়ির ভয়ই বেশী।

৩য়। নাঃ বুড়ো ফিরতে বড়ডো দেরি করছে ঃ

৪র্থ। বাজে গল্প না করে কাজের কথা বল দিকি—

২য়। যা বলেছ। এবার সাজব আমরা স্যাক্‌রা, বুঝলে ?

২য়। স্যাকরা।

১ম। হ্যাঁ স্যাকরা। ফোঁটা তিলক কেটে···স্যাকরা সেজে এবার আমরা পাণ্ডুয়ায় গিয়ে স্যাকরার দোকান দিচ্ছি—আমরা এবার পরম বৈষ্ণব, বুঝলে ?

৩য়। পরম বৈষ্ণব।

৪র্থ। বকধার্মিক। বুঝলে না ?

১ম। স্যাকরার দোকান। বাইরে বসব আমি, আমার বুলি হবে গোপাল। 'গোপাল।' বুঝলে ? [২য় কে] তোমার হবে 'কেশব। কেশব।' তুমি যে ঘরে বসে কাজ করবে—তার পাশের ঘরে বসবে [৩য় কে] তুমি। তোমার বুলি হবে 'হরি। হরি!' খিড়কির দোরের কাছে যে ঘরটি থাকবে—সেখানে বসে কাজ করবে—[৪র্থ কে] তুমি···তোমার বুলি হবে 'হর। হর।'—

২য়। মানে সোনার জিনিস গড়তে সোনা নিয়ে লোক এল। আমি তা দেখেই তোমায় লক্ষ্য করে বলব, কে—সব? কে সব?

১ম। যারা এল—যদি আমি বুঝি ...তারা গো-বুদ্ধি···বলব··· গো-পাল! গো-পাল! তোমাদের কাছে পাঠিয়ে দেব।

৪র্থ। আমরা যদি বুঝি...শিকার ভালো। [৩য় কে] পাঠিয়ে দেব তোমার কাছে।

৩য়। আমি বলব হরি? হরি? মানে হরণ করি?

৪র্থ। আমি সব দেখে শুনে যখন বলব 'হর! হর!'

৩য়। তখনই আমি 'হরি! হরি!' বলেই...বুঝে ছি।

১ম। বুঝেছ?

আর তিনজন। বুঝেছি।

১ম। [৩য় কে] তুমিও···একলম্ফে—আমার ও—লম্ফে—লম্ফে—।

৪র্থ। হরির কৃপায় দশজনে খায় আমরাই কেন খাব না [সকলে গান ধরিল।]

[বৃদ্ধ ধর্মধর সাধু গঙ্গাস্নান করে ফিরে এলেন]

ধর্মধর। কি হে। তোমরা কতক্ষণ?

[সকলে ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করল।]

ধর্মধর। কিহে। তোমরা কতক্ষণ?

[সকলে ভক্তিভরে তাঁকে প্রণাম করল।]

১ম। আজ্ঞে বিদেশে চার বন্ধু ব্যবসা করতে গিয়েছিলুম...কাল ফিরেছি—আজই আবার চলে যাচ্ছি—

ধর্মধর। আজই চলে যাচ্ছ। কেন হে, দেশে এসেছ—হুদিন থাকো—

২য়। আজ্ঞে, আপনার শ্রীচরণের আশীর্বাদে ব্যবসাটা দিব্যি—

ধর্মধর। কেঁপে উঠেছে। বেশ! বেশ! তা ব্যবসাটা কিসের হে?

[চার জনের মধ্যেই ত্বরিত দৃষ্টি বিনিময়।]

১ম। আজ্ঞে সোনা রূপোর ব্যবসা।

ধর্মধর। বেশ! বেশ! তা আমার এখানে—

১ম। আজ্ঞে, একটু কথা ছিল—

৩য়। হরি। হরি।

৪র্থ। হর! হর!

[গোয়ালার প্রবেশ।]

গোয়ালা। চাই দই! খাসা দই।

১ম। দধি যাত্রা।

গোয়ালা। দেখেই যদি যাত্রা শুভ।
খেলে হবে আরো শুভ॥

৩য়। ঠিক—

৪র্থ। কবি প্রশ্ন করেছেন—
"দেখার চেয়ে খাওয়া ভালো
কোন জিনিসটি সই?

গোয়ালা। সে আমারই দইরে দাদা,
সে আমারই দই॥"

১ম। কিন্তু ট্যাঁকে যে পয়সা নেই, সবই যে দিয়ে দিলুম।

২য়। তাই তো!

৩য়। হরি! হরি!

৪র্থ। হর! হর।

[গোয়ালাকে আক্রমণ করে আর কি।]

১ম। না-না, এটা হচ্ছে যাত্রার জিনিস। এখানে ওটা উচিত হবে না। [৪র্থ কে] যাও না একটা টাকা চেয়ে নিয়ে এস—

৪র্থ। একলা গেলে দেবে কেন ?

২য়। না দেয়, আমরা এখান থেকে বলে দিচ্ছি।

৪র্থ। [যেতে যেতে] দেখার চেয়ে খাওয়া ভালো
কোন্ জিনিসটি সই ?

গোয়ালা। সে আমারই দইরে দাদা,
সে আমারই দই ॥

[৪র্থ চলে গেল। গোয়ালা গান করতে লাগল। এরা তিনজন দইয়ের ভাঁড়গুলি দেখা শোনা করতে লাগল।]

গোয়ালার গান

যাত্রা শুভ দেখলে দধি
থাকবে সুখে নিরবধি
এ দধি যে তুলবে মুখে
ভুলবে ভুবন আমা বই।
দধি আমার মধু ঢালা
জুড়ায় খেলে সকল জ্বালা
দধির গুনে বধির শুনে
বোবার মুখেও ফোটে খই।

তিনজনে। দেখার চেয়ে খাওয়া ভালো
কোন্ জিনিসটি সই ?

৪র্থ। [ভেতর থেকে—চীৎকার করে] তোমরা এস। তোমরা তিনজন না এলে ধর্মঠাকুর আমায় টাকা দিচ্ছেন না—

এরা তিনজন। [চীৎকার করে] দিন্—দিন্—ঠাকুরমশাই, একটা টাকা ওকে দিন—

গোয়ালা। [গাইতে লাগল] 'দ ধ আমার মধু ঢালা' ইত্যাদি।

[ভেতরে ধর্মধর ঠাকুরের চীৎকার শোনা গেল।]

ধর্মধর। [ভেতরে]—একি! একি! পালাল। টাকার থলি নিয়ে পালাল! গেল—গেল, সব গেল।

১ম। পালাল, কে পালাল?

২য়। তাই তো!

[ছুটতে ছুটতে ধর্মধর এলেন।]

ধর্মধর। সর্বনাশ। সব গেল। যেই থলিটি ওর হাতেটি দিয়েছি—থলিটি নিয়েই এক লম্ফে—এরা সকলে। কী সর্বনাশ!

১ম। ওর পেটে এত।

২য়। এখন উপায়।

৩য়। ধরতে হবে—ও শয়তানকে ধরতেই হবে—

১ম। আর ধরেছ। ওর মতো কেউ ছুটতে পারে না—

২য়। কী হবে!

৩য়। এই এক দই-এর জন্যেই দেখছি মজলাম।

২য়। [গোয়ালার প্রতি আক্রোশে] আর ব্যাটাকে।

গোয়ালা। ওরে বাবারে বাবা—[পলায়ন।]

১ম। ঠাকুর মশাই, আমাদের টাকা দিন—

ধর্মধর। কি করে দেব বাবা—!

১ম। তা বললে শুনছি না, কথা ছিল—আমরা চারজন একসঙ্গে চাইলে আপনি টাকা দেবেন, বলুন কথা ছিল কি না?

ধর্মধর। তা ছিল—কিন্তু চারজন একসঙ্গে কি গিয়ে ছিলাম?

২য়। ঠিক, ও টাকা আপনাকেই দিতে হবে—

৩য়। [চেঁচিয়ে] দিতেই হবে—নইলে আমরা ছাড়ছিনে—জানেন কে আমরা?

ধর্মধর। ওরে বাবা। দোহাই তোমাদের—আমার কী দোষ—

৩য়। [চীৎকার করে] হরি—হরি—

১ম। হ র—হর—

ধর্মধর। দোহাই তোমাদের—দোহাই তোমাদের আমার কী দোষ?

[সদলবলে কাজী ও কোতোয়ালের প্রবেশ। সঙ্গে পথিক ও বালকগণ।]

সকলে। কী হয়েছে? কী হয়েছে?

ধর্মধর। এই যে কাজী সাহেব। আমার কি দোষ বলুন দেখি। এরা চারজন আমার কাছে ওদের চার হাজার টাকা গচ্ছিত রেখেছিল—সর্ত করেছিল ওরা চারজন একসঙ্গে এসে যখন চাইবে—তখন আমি টাকা দেব।

১ম। হ্যাঁ, নইলে উনি দেবেন না—এই ছিল সর্ত। আমাদের মধ্যে একজন—একা গিয়ে ওর কাছে একটি টাকা চেয়েছে—

ধর্মধর। আমি তা দিতে চাইলুম না। সে ওদের চীৎকার করে তা জানাল। তখন ওরা এখান থেকে চীৎকার করে ববল, দিন—একটা টাকা দিন—আমি তা শুনে টাকার থলিটি যেই তার হাতে দিয়েছি—অমনি সে থলিটি নিয়ে খিড়কি দোর দিয়ে উধাও।

কাজী। [ঐ তিনজনকে] তোমরা তো টাকা তাকে দিতেই বলেছিলে—

১ম দিতে বলেছিলুম—কিন্তু চারজন একসঙ্গে গিয়ে তো চাইনি—

২য়। তবে কেন উনি দিতে গেলেন।

৩য়। উনি সর্ত ভেবেছেন। দোহাই ধর্মাবতার! সুবিচার করুন।

কাজী। আমরা একটি জরুরী কাজে যাচ্ছি— [কোতোয়ালকে] তা এতো অতি সহজ বিচার—বিচারটা করেই যাই—[ধর্মধর] সর্ত তুমি ভেঙেছ ঠাকুর। ও টাকা তোমাকেই দিতে হবে। [অনুচরদের প্রতি] টাকা আদায় করে এদের দিয়ে দাও।

ধর্মধর। অত টাকা। ওরে বাবা। ঘরদোর যে তবে আমার কিছুই থাকবে না। একেবারে পথে বসতে হবে।

কাজী। তা কী করব। বিচার, বিচার! কারো মুখ চাইলে চলবে না।

কোতোয়াল। [অনুচরদের প্রতি] ব্রাহ্মণ, সহজে টাকা না দিলে ওর বাড়ীঘর গরু বাছুর যা পাও—সব বিক্রি করে ওদের চার হাজার টাকা মিটিয়ে দাও। চলুন কাজী সাহেব!

কাজী চলুন।

ধর্মধর। হায় ভগবান। হায় ভগবান। তোমার মনে এই ছিল। এই বয়সে শেষটা পথে বসতে হল। আমার কী দোষ! আমার কী দোষ।

[ব্রাহ্মণ কাঁদতে লাগলেন। একটা বালক কাজীর সম্মুখে গিয়ে দাঁড়াল।]

বালক। আপনি ধর্মবতার, না অধর্মাবতার।

[সকলে চমকে উঠল।]

কোতোয়াল। সাবধানে বালক।

বালক। সাবধান আপনাদেরই হওয়া দরকার—এত বড় অধর্ম করবেন। নিরপরাধ ব্রাহ্মণের প্রতি এত বড় অবিচার করে যাচ্ছেন—ধর্মে সইবে না।

কোতোয়াল। [অনুচরদের প্রতি] ঐ অশিষ্ট বালককে বাঁধো—ওর পিঠে চাবুক মারো—

কাজী। দাঁড়াও। [বালকের প্রতি] অবিচার করেছি আমি?

বালক। নিশ্চয় করেছেন।

কাজী। তুমি হলে কী বিচার করতে?

বালক। আমি হলে কী বিচার করতুম দেখতে চান?

কাজী। দেখতে চাই। যদি বুঝি আমারই ভুল হয়েছে, তুমি বেঁচে গেলে—আর যদি দেখি ছেলেখেলা—তুমি মরবে।

বালক। আমি রাজী।

কাজী। কর বিচার।

বালক। [তিন বন্ধুকে] আমি সব শুনেছি। তবু আবার বল—কী কথা ছিল।

১ম। কথা ছিল আমরা চারজন একসঙ্গে গিয়ে এই ব্রাহ্মণের কাছে টাকা চাইলে তবে উনি টাকা দেবেন।

বালক। তাই উনি দেবেন। কিন্তু কোথায় তোমরা চারজন? মোটেত তিনজন আছে দেখছি। আর একজনকে আনো।

কাজী। [ছুটে এসে বালককে বুকে নিয়ে] বালক!

বালক। কে তুমি আমি জানিশ—কিন্তু তুমি আমার নমস্য!

ধর্মধর। জয় ধর্ম! জয় ধর্ম!

[ছুটে এসে বালককে বুকে জড়িয়ে ধরলেন।]



সুনির্মল বসু

মুশকিল আসান

প্রথম দৃশ্য

[মাথায় হাত দিয়ে হরু খুড়ো বারান্দায় বসে বিলাপ করছে।]

হরু : হায়-হায়-হায়
সব যায় যায়।

[ভাগ্নে ঝণ্টু এলো]

ঝণ্টু : কি হয়েছে মামা ?

হরু : হবে আর কি ঝণ্টু, আমার মাথা আর মুণ্ডু—

ঝণ্টু : কেন, হোলো কি মামা ? ব্যাপার কী ? খুলেই বল না।

হরু : জানিস তো, আমার অবস্থার কথা, পাকিস্থানে সব খুইয়ে প্রাণটুকু হাতে করে এখানে এসে কোন রকমে মাথা গুঁজে আছি এই সংসারের জঙ্গলের মধ্যে। সহায় নেই, সম্বল নেই, অনেক কষ্টে হাড়পাড় করে মা-মরা মেয়ের বিয়ে ঠিক করেছি—শাঁখা-সিঁদুর দিয়ে এই সাতগাঁয়ে।

ঝণ্টু : সেতো সুখের কথা মামা—তাতে আর 'হায় হায়' করবার কি আছে ?

হরু : শোন-শোন, এখন কি গেরোয় পড়ে গেছি—শুনলে হক-চকিয়ে যাবি,—ভিরমি খাবি—।

ঝণ্টু : গেরো আবার কি ?

হরু : ঠিক ছিল মাধুরীর এই বিয়েতে আসবে মাত্র পাঁচজন বরযাত্রী—

ঝণ্টু : তারপর—তারপর !

হরু : হৈ হৈ করতে করতে হাজির হয়েছে প্রায় পঁচিশ জন, ইয়া ষণ্ডা-ষণ্ডা গুণ্ডার দল সেই গ্যাঁড়াতলা থেকে। মাত্র পাঁচ জনের খাবার ব্যবস্থা করেছি, এখন এই গণ্ডা গণ্ডা অপগণ্ডগুলিকে বুঝ দেই কি দিয়ে। কোথায় টাকা, কোথায় পয়সা, কোথায় খাবার, কোথায় কি ? হায়, হায় সব গেল, সব গেল।

[ভিতর থেকে গোলমাল শোনা গেল। কেউ কেউ চেঁচাচ্ছে "ও মশাই রাত তো অনেক হোলো, পেট যে চুঁই চুই করছে।" কেউ বলছে, খিদেতে যে নাড়ী টন টন করছে। এবার ব্যবস্থা করুন। বাড়ী ফিরতে হবে অনেক দূর, সেই গ্যাঁড়াতলায়।" কেউ গান গাইছে, "তেরি-মেরী সেঁইয়া লাড্ডু লাগাও ভেঁইয়া।]

হরু : শুনছ ঝণ্টু, ওদের উল্লাসের বহর, তেরি মেরি সেঁইয়া— ভয়ে যে আমার বুক দূর দূর করছে। ষণ্ডারা না খেতে পেয়ে আমায় ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা না করে। এদিকে গোধুলি লগ্নে বিয়েও প্রায় শেষ হয়ে গেল। ঐ শোন্ শাঁখ বাজছে অন্দরে। এবার ওদের খাওয়াই কি দিয়ে, হায়-হায়-হায়।

ঝণ্টু : আমি দেখেছি ঐ খাঁ্যাটবাজদের। এক এক জনের পেল্লাই ভুঁড়ি দেখলে মনে হয় ব্যাটারা এক-একটি আধমণী কৈলেশ। ঠিক হয়েছে মামা—কুছ্ পরোয়া নেই। বিয়ে তো শেষ হয়ে গেল—আর ভয় কি ? আমিই সব ব্যবস্থা করছি—তুমি নিশ্চিন্তে থাকো। ওই তো-এ টেঁদের খাওয়াবার ভার আমি নিচ্ছি।

হরু : সে কীরে ঝণ্টু,—পাঁচজনের খাবার পঁচিশজনকে খাওয়াবি কি করে? মাটি করবি সব। হায়-হায়-হায়—

ঝণ্টু : ঝণ্টুর মগজের কাছে ঐ গ্যাঁড়াতলার বিটলে ভূতগুলো নেহাৎ বালখিল্য। দাঁড়াও, গোপনে তোমায় বাৎলে দি আমার বুদ্ধিটা। বুদ্ধির প্যাঁচে ওসব ঘ্যাচাং ঘ্যাঁচ জব্দ করে দেব। পাঁচজন বলে, এলো পঁচিশজন—দাঁড়াও টের পাওয়াচ্ছি মজা, ঘুঘু দেখেছ ফাঁদ দেখনি। ছোটলোক কোথাকার।

হরু : কি করবি শুনি, ওরা যে খাওয়ার জন্য হা-পিত্তেশ স্থুরু করে দিয়েছে—বাপরে বাপ। গেল ইজ্জৎ, গেল মান—হায়—হায় আমার মা-মরা মেয়ে মাধুরীর বরাতে শেষে কিনা এই ছিল। [আবার ভিতর থেকে আওয়াজ পাওয়া গেল।]

"ও মশাই শুনছেন—চট্‌পট্ খ্যাঁটের ব্যবস্থা না করলে আমরা কিন্তু ঝটপট উঠে যাব বলে দিচ্ছি।" আর এক-জন "ইয়ার্কি নাকি, উঠব কি হে, মাইরি নাকি, ইল্লি তা হবে না, খ্যাঁট সেরে তবে উঠব—যত ·ইত্‌রোমি, নেমতন্ন করে এনে হুজ্জৎ করা—ওসব চলবে না বলে দিচ্ছি—ক্ষিদে পেয়েছে, এক্ষুনি খাবার চাই। ধাপ্পাবাজিতে কি আর মেয়ের বিয়ে হয়।" গান শোনা গেল—"তেরি-মেরি সেঁইয়া,—মোণ্ডা লে আও ভেঁইয়া]

হরু : (কাঁদো কাঁদো সুরে) শুনছিস ঝণ্টু—হায়-হায়-হায়।

ঝণ্টু : (ভিতরের ঘরের উদ্দেশে) মশাইরা একটু সবুর করুন, এই ঠাঁই হোলো বলে। খাবার-দাবার সব প্রস্তুত। (আস্তে) এই মামা—তোমার গোয়ালে সেই নতুন-কেনা দুরন্ত খ্যাপা গরুটা আছে তো?

হরু : তাতো আছে, কিন্তু তা দিয়ে কি হবে এখন ?

ঝন্টু : হবে, হবে মামা। ঐ তো আমার অস্তর। পাঁচজনের জন্যে খাবার টাবার যা করেছ তাই প্রথমে বেড়ে দাও ঐ পঁচিশ জনকে। খেতে সুরু করুক ওরা। প্রথমে পাতে দাও দু'খানা করে লুচি কিছু তরকারী, তারপর—

হরু : তারপর কি ?

ঝন্টু : তারপর যেই মৌজ করে ব্যাটারা খাওয়া আরম্ভ করবে অমনি আমি তাদের খাওয়ার জায়গায় ছেড়ে দেব তোমার সেই দুরন্ত গরুটা। পিঠে দু ঘা লাগলেই গরুটা তিড়িং মিড়িং লাফাবে আর শিং নেড়ে ওদের গুঁতোতে যাবে! হি-হি-হি- মামা, তারপর দেখবে মজাটা। তোমার সব বিপদ কেটে যাবে। যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান। যাও তুমি চটপট পঁচিশটা জায়গা করে দাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

[গাঁটছড়া বাঁধা অবস্থায় মেয়ে-জামাইকে ছাঁদনাতলা থেকে ঘরে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। মেয়ে-জামাইয়ের মাথায় টোপর। শাঁখ বাজানো হচ্ছে, মেয়েরা উলুধ্বনি করছে। মেয়ের বাবা হরু আসরে উপস্থিত।]

হরু : যাক ভালোয় ভালোয় বিয়েটা তো চুকলো। এইবার ঠ্যালার নাম বাবাজি। ঝন্টু ও ঝন্টু—

[ছুটতে ছুটতে ঝন্টু এলো]

ঝন্টু : কী মামা ?

হরু : বিয়েতো চুক্‌লো এইবার ?

ঝন্টু : এইবার আমারও সব প্রস্তুত। ঠাঁই হয়ে গেছে 'সেঁইয়া মেইয়াদের' পাঠিয়েছি।

হরু : আমি সট্‌কাবে কেন? গ্যাঁট হয়ে বসে থাকো মামা। সট্‌কাবে তো ওই সেঁইয়া মেইয়ার দল।

তৃতীয় দৃশ্য

[ভিতরে ভীষণ হট্টগোল শোনা যাচ্ছে আর হাম্বা হাম্বা করে একটা গরুর ডাকও শোনা যাচ্ছে। দেখা গেল সেঁইয়া মেইয়ার দল ছুটে পালাচ্ছে হাত চাটতে চাটতে।]

প্রথম জন : ওরে পালারে পালা। ব্যাটা শিং বাগিয়ে যা তেড়ে এসেছে—ভাগ্যিস পালিয়ে এসেছি। পালাতে গিয়ে তিনবার হুমড়ি খেয়ে পড়েছি বাপ্‌স—

দ্বিতীয় জন : ভাগ্যিস আমার এমন নধর ভুঁড়িতে শিংয়ের গোঁত্তা মারেনি। রান্নাটা বেশ জুৎসই হয়েছিল, না ভাই যজ্ঞেশ্বর?

তৃতীয় জন : সবেমাত্র মাছের কালিয়াটা মুখে দিয়েছি অমনি তেড়ে এলো কিনা শিং নেড়ে গরুটা তিড়িং তিড়িং করে লাফ দিয়ে। কালিয়া খেতে খেতে পালিয়ে আসতে হোলো। (হাত চাটতে লাগলো)

চতুর্থ জন : না, মেয়ের বাবা আয়োজন করেছিল ভালো, গরম গরম লুচি, ছোলার ডাল, মাছের কালিয়া-তরকারী।

[আবার গরুর হাম্বা হাম্বা আওয়াজ পাওয়া গেল]

সবাই : পালারে, পালা, আবার আসছে ঐদিকে তেড়ে। ব্যাটা ক্ষেপে গেছে ; আপনি বাঁচলে বাবার নাম।

[সবাই পালাতে লাগল। ঝন্টু এসে পড়লো]

ঝণ্টু : আপনারা পালাবেন না—দই আছে, মোণ্ডা আছে, পান্তুয়া আছে, রসগোল্লা, রাবড়ী—প্রচুর ব্যবস্থা—

[আবার কাছেই হাম্বা, হাম্বা আওয়াজ শোনা গেল, তাই শুনে সবাই পিট্টান দিল। আসর খালি]

ঝণ্টু : (হাসতে হাসতে) ও মামা—বিপদ কেটে গেছে। যাঁহা মুশকিল তাঁহা আসান। এবার গরুটাকে গোয়ালে আটকাও। হি হি হি সাতগেঁয়ের কাছে মামদোবাজি!



নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়

ভীম বধ

প্রথম দৃশ্য

[একটা থিয়েটারের স্টেজ। পেছনে একটা জঙ্গলের সীন খাটানো। ডিরেক্টর—মানে নাটকের পরিচালক কালুদা খুব ব্যতিব্যস্ত হয়ে এসে ঢুকল। তাকিয়ে দেখলে চারিদিক, আর কাউকে না দেখে রেগে চিৎকার করে উঠল।]

কালুদা। হবে না—থিয়েটার হবে না। এই সমস্ত গোবর-গণেশকে দিয়ে কখনো প্লে হয়! আজ হবে না থিয়েটার—হতেই পারে না।

হারাধনের প্রবেশ

হারাধন। কী হয়েছে কালুদা? অত চ্যাঁচাচ্ছ কেন?

কালুদা। চেঁচাব না? বলি হারাধন, ওটা কী সীন টাঙিয়েছ—শুনি?

হারাধন। কেন—চমৎকার অরণ্যের দৃশ্য বানিয়ে রেখেছি।

কালুদা। অরণ্য! তোমার মুণ্ডু! তুমি একটি গবেট। বুঝেছ, নির্জলা গবেট।

হারাধন। কেন, সীনটা দেখতে বেশ। কত মনোরম তরুলতা—কত কুসুম ফুটে রয়েছে—শাখায় শাখায় কত কোকিল সুমধুর স্বরে—

কালুদা। (চেঁচিয়ে) শাট আপ্। (ভেংচে) তরুলতা—কুসুম—কোকিল সুমধুর স্বরে! বলি, কুরুক্ষেত্রের রণভূমিতে অরণ্য কোত্থেকে এল—অ্যাঁ? আর তাছাড়া দ্বৈপায়ন হ্রদই বা গেল কোথায়? দুর্যোধন লুকিয়ে কোথায় বসে থাকবে—শুনি?

হারাধন। এই নাও—কথা শোন একবার। আমি হ্রদ কোথায় পাব? স্টেজ কেটে আমি হ্রদ তৈরি করব নাকি? বল তো একটা পুরানো গঙ্গাজলের ট্যাঙ্ক নিয়ে আসি। তার মধ্যে দুর্যোধন ঘাপটি মেরে বসে থাকবে।

কালুদা। ইয়ার্কি পেয়েছিস—না? (রেগে) গেট আউট—দূর হ সামনে থেকে! (হারাধন চলে গেল) যা হোক, ঐ অরণ্য দিয়েই চালিয়ে নিতে হবে এখন! লোকে ধরে নেবে দুর্যোধন জঙ্গলের মধ্যে পালিয়ে বসে ছিল। কিন্তু আর সব হতচ্ছাড়া গেল কোথায়? এই সীনটাতেই দেখছি সব মাটি করে দেবে—একদম ভাল রিহার্সাল হয় নি। (চেঁচিয়ে) এই নিমাই—এই পটলা—

একমুখ দাড়ি লাগিয়ে গায়ে যাত্রার দলের মতো পোশাক পরে
নিমাইয়ের প্রবেশ। কালুদা ভীষণ চমকে গেল।

আরে এটা কে রে?

নিমাই। আমি নিমাই।

কালুদা। নিমাই! তা বেশ, কিন্তু কিসের পার্ট করছ তুমি? ধৃতরাষ্ট্রের?

নিমাই। ধৃতরাষ্ট্র কেন হবে? আমি ভীম।

কালুদা। ভীম? তাহলে জগছম্প দাড়ি লাগিয়েছিস কেন? কে তোকে বলেছে ভীমের অমন বাবর শা-র মতো দাড়ি ছিল?

নিমাই। বা রে! দাড়ি গজাবে না? কদ্দিন ধরে কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধ চলেছে। দিন নেই, রাত নেই—খালি যুদ্ধ। এর মধ্যে ভীম কখন দাড়ি কামাবে শুনি? পরামানিক পাবে কোথায়?

কালুদা। এঃ—এঃ! খুব যে পণ্ডিত হয়ে গেছিস! ভীম দাড়ি কামাবে কেমন করে? কেন, অর্জুন বাণ দিয়ে মেজদার দাড়ি কামিয়ে দেবে!

নিমাই। বাণ দিয়ে?

কালুদা। হাঁ—হাঁ—বাণ দিয়ে। অমন ভীষ্মকে শরশয্যায় শুইয়ে দিতে পারল, আর দাদার দা ড় কামাতে পারবে না? খোল্ খুলে আয় এক্ষুনি।

শ্রীকৃষ্ণ বেশে নিখিলের প্রবেশ

নিখিল। কালুদা, ছাখো তো সাজ কেমন হল?

কালুদা। আহা—খাসা। এখন গিয়ে কদম্ববৃক্ষে উঠে বসলেই হয়! এই নিখলে, হাতে আবার বাঁশি নিয়েছিস বড়!

নিখিল। বাঃ—শ্রীকৃষ্ণের হাতে বাঁশি থাকে না?

কালুদা। এ কি বৃন্দাবনের বন পেলি যে বেণু বাজিয়ে ধেনু চরাবি? এসব অপোগণ্ডকে নিয়ে তো আচ্ছা প্যাঁচে পড়া গেল! কুরুক্ষেত্রে শ্রীকৃষ্ণের হাতে কি ছিল মনে নেই? শঙ্খ চক্র।

নিখিল। শাঁখ দিয়ে কি হবে? আমি বাজাতে পারি না।

কালুদা। চোপরাও। খালি পাকামো শিখেছিস। শাঁখ না হল, একটা চক্র তো দরকার।

নিখিল। চক্র আমি নিয়ে এসেছি। দাদার সাইকেলের একটা টায়ার।

কালুদা। কী। সাইকেল টায়ার। ইচ্ছে হচ্ছে তোকে আমি ফায়ার করি। (নিমাইয়ের দিকে তাকিয়ে) তুই যে তখন থেকে হাঁ করে দাঁড়িয়ে আছিস? তোকে বললুম না ঐ মোগলাই দাড়ি খুলে আসতে?

নিমাই। তুমি তখন থেকে কেবল আমার দাড়িই দেখছ। আর নিখলে কেষ্ট সেজেছে, তার জুতো বুঝি তোমার চোখে পড়েনি?

কালুদা। আরে অ্যাঁ—তাই তো। এ যে ডাবি জুতো, নিখলে।

নিমাই। আমার পা মচকে গেছে। অন্য জুতো পরলে লাগে।

কালুদা। তাই বলে ঐ জুতো। তুই পাগল, না আমি পাগল?

নিমাই। দু-জনেই।

কালুদা। শাট আপ। যা, খোল জুতো।

নিখিল। খালি পায়ে নেংচে হাঁটতে হবে আমাকে?

কালুদা। তাই হাঁটবি। নেংচে নেংচেই হাঁটবি।

নিখিল। শ্রীকৃষ্ণ খোঁড়া হয়ে হাঁটবে? লোকে যে—

কালুদা। লোকে যা বলে আমি বুঝব। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে আহত হয়েছে, তাই খুঁড়িয়ে চলছে। হল তো? যা এখন। নিমাই, তুমিও যাও দাড়ি খোলো গে—

নিমাই। খুলছি। কিন্তু একটা কথা বলব কালুদা?

কালুদা। বল চটপট।

নিমাই। আমি বলছিলুম কি—এই থিয়েটারের পর পাঁচ বছর আমাদের কাউকে আর জুতো কিনতে হবে না।

কালুদা। মানে?

নিমাই। মানে এই থিয়েটার দেখে লোকে এত জুতো ছুড়বে যে তাতেই—

কালুদা। অ্যাঁ—মস্করা? ঠাট্টা হচ্ছে আমার সঙ্গে? গেট আউট!

[নিমাই আর নিখিলের পলায়ন।

শেম। এদের নিয়ে থিয়েটার করতে হবে? এর চাইতে যদি দলবল নিয়ে খোল কর্তাল বাজিয়ে হরি-সংকীর্তন গাইতুম, তাহলেও অনেক বেশি যশ হত। ছ্যাঃ!

প্যাঁচার মতো মুখ করে দুর্যোধনবেশী গাঁট্টাগোঁট্টা পান্নালালের প্রবেশ

তোমার আবার হাঁড়ির মতো মুখ কেন হে পান্নালাল? পেট

কামড়াচ্ছে ? আমি দেখছি শেষপর্যন্ত তুই-ই ডোবাবি ! তখন তোকে এত করে বললুম, এত তেলেভাজা খাসনি—খাসনি। তা—

পান্নালাল। (খ্যাঁচ-খ্যাঁচ করে) পেট কামড়াচ্ছে কে বললে তোমায় ?

কালুদা। তাহলে ? অমন তালের আঁটির মতো চেহারা করবার মানে কি ?

পান্নালাল। কালুদা, আমি থিয়েটার করব না।

কালুদা। থিয়েটার করবে না—মানে ?

পান্নালাল। মানে করব না।

কালুদা। বাঃ—বাঃ! রসিকতার সময়টি তো পেয়েছ ভাল। একটু পরে থিয়েটার আরম্ভ হবে, তুমি দুর্যোধন, তোমার উরুভঙ্গ নিয়ে নাটক, এখন বলছ কিনা পার্ট করব।

পান্নালাল। দুর্যোধন বলেই করব না।

কালুদা। জ্বালাসনি বলছি পেনো! এমনিই আমার মেজাজ এখন বেজায় খারাপ! খ্যাঁক-খ্যাঁক করে এখন আমি যাকে-তাকে কামড়ে দিতে পারি। কি হয়েছে তোর ?

পান্নালাল। ঐ নিমাই তাহলে ভীমের পার্ট করবে ?

কালুদা। নির্ঘাৎ।

পান্নালাল। আর আমি দুর্যোধন ?

কালুদা। নিঃসন্দেহে।

পান্নালাল। অসম্ভব।

কালুদা। মানে ?

পান্নালাল। মানে আবার কী ? নিমাইকে তো আমি এক ল্যাং মেরে পটকে দিতে পারি। আর ঐ শুটকো ফড়িংটাই কিনা আমার উরুভঙ্গ করবে! মহাভারত-টহাভারত আমি বুঝি না। মোদ্দা, ঐ রোগা পটকা নিমেকে আমার উরুভঙ্গ করতে দেব না, কিছুতেই না!

কালুদা। কী মুশকিল! বলি, মামাবাড়ি আব্দার পেলি? রিহার্সালের সময় বললি না কেন?

পান্নালাল। বলেছিলুম তো। তুমি তখন আমাকে ভূজুং ভাজুং দিয়ে বোঝালে আমার নাকি হিরোর পার্ট। এখন দেখছি সব বোগাস! আমি হিরো না ছাই! উরুভঙ্গ হয়ে আমি মাটিতে পড়ে হাহাকার করব, আর নিমে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে তড়পাবে। জাঁক দেখাবে! উহুঁ! ইম্পসিবল!

কালুদা। ইম্পসিবল! (দাঁত খিঁচিয়ে) ছাখ পেনো, অনেকক্ষণ ধরে তোর বাঁদরামো সহ্য করেছি আমি। একটু পরে প্লে আরম্ভ হবে, আর এখন উনি এলেন ধাষ্টামো করতে। যা রেডি হয়ে শিগগির—নইলে এক চড়ে কান ছিঁড়ে দেব। বেরো—যা শিগগির গ্রিন রুমে—

পান্নালাল। (খানিকক্ষণ গোঁজ হয়ে থেকে) আচ্ছা বেশ, দেখা যাবে।

[বেরিয়ে গেল।

কালুদা। এদের নিয়ে আমায় থিয়েটার করতে হবে। ছ্যা-ছ্যা! এর চাইতে যদি ঢোল বাজিয়ে 'রামা হো রামা হো' গাইতুম, তাহলেও নাম হত। যতসব বেকুবের কারবার! (সামনের দিকে তাকিয়ে জিভ কেটে)—অ্যাঁ—মেলা অডিয়েন্স এসে গেছে যে! এই, ড্রপ ফ্যাল, ড্রপ ফ্যাল। প্লে আরম্ভ করতে হবে।

ড্রপ পড়ল

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ড্রপ উঠল। সেই অরণ্যই রয়েছে পেছনে। গদা হাতে দুর্যোধন অর্থাৎ পান্নালাল পায়চারি করছে।]

দুর্যোধন। আজি লুকাইয়া হ্রদে,

কুরুক্ষেত্র রণ হতে পলাতক আমি।
না না—এ তো হ্রদ নয়, এ যে বনভূমি!
কালুদা বলিয়াছে মোরে।

প্রম্পটার উইংসের পাশ থেকে গলা বের করল

প্রম্পটার। এই—কী বলছিস এ সমস্ত। ঠিকমতো পার্ট কর্।

দুর্যোধন। চোপরাও! আমি দুর্যোধন,
ভাঙিবে আমার উরু—
ঐ নিমো?
হাঃ-হাঃ-হাঃ—পায় অট্টহাসি—
আসুক অর্জুন এইখানে একবার!
পাবে টের মজ্জা কারে বলে!

উত্তেজিত প্রম্পটার স্টেজে প্রায় ঢুকে গেল

প্রম্পটার। এই পেনো, কী হচ্ছে? ভাল করে পার্ট বল শিগগির—

দুর্যোধন। নিকালো হিয়াসে, মোরে দিবে উপদেশ। অর্বাচীন যত।

শ্রীকৃষ্ণের সাজে খোঁড়াতে খোঁড়াতে নিখিলের প্রবেশ

শ্রীকৃষ্ণ। মহামানী দুর্যোধন—
এতদিনে বুঝেছ কি তুমি,
অধর্মের জয় নাহি হয়? বুঝেছ কি—

দুর্যোধন। কে রে ওটা? খোঁড়া কেষ্টা? (হেসে)
খোঁড়া ল্যাং ল্যাং ল্যাং,
কার বাড়িতে গিয়েছিলি
কে ভেঙেছে ঠ্যাং? হাঃ-হাঃ-হাঃ!

প্রম্পটার। এই সেরেছে! দিলে সব ডুবিয়ে! এ পেনা, থাম্—ওসব নয়—

দুর্যোধন। কী বারবার হাঁসের মত করিস প্যাঁক প্যাঁক ?
বহুক্ষণ সহিয়াছি তোর এ ধৃষ্টতা রে বর্বর।
এইবারে পাবি সমুচিত প্রতিফল—

প্রম্পটারের গলা ধরে টেনে সজোরে পদাঘাত

প্রম্পটার। ওরে বাপরে, গেলুম রে—মেরে ফেললে রে—

[বই আর বাঁশি ফেলে সবেগে পলায়ন

দুর্যোধন। তারপর খোঁড়া-কেষ্ট ? কী মতলব হেথা আগমন ?

শ্রীকৃষ্ণ। (ফিসফিসিয়ে) মাইরি ভাই পান্নালাল—কী আরম্ভ করলি তুই! থিয়েটার যে মাটি হয়ে গেল! ঐ ছাখ—সামনে অডিয়েন্স হাসছে।

দুর্যোধন। হাসুক—হাসুক যত খুশি।
আমি নাহি করি ভয়।
রাজা দুর্যোধন আমি—হাতে মোর গদা!
ওরে ল্যাং ল্যাং খোঁড়া-কেষ্ট! কী বুঝাস মোরে ?

শ্রীকৃষ্ণ। (ফিস ফিসিয়ে) আঃ—কী করছিস! ঠিকমতো বলে যা। নে আমি আরম্ভ করছি : (জোরে)
শোন রাজা দুর্যোধন,
যত পাপ করিয়াছ—এবে তার হইবে বিচার।
ঐ হের ধূ ধূ জ্বলে রাশি রাশি লেলিহান শিখা—
ঐ শোন আর্তনাদ।
খেলিয়া কপট-পাশা পাণ্ডবেরে দিলে নির্বাসন,
মহাপাপ সঞ্চিলে কত না—
আজ তাই তোমারে অন্তিম দণ্ড দিতে—

দুর্যোধন। এঃ, খুব লেকচার দিচ্ছিস! তবু যদি খোঁড়া না হতিস। হেঁ-হেঁ-হেঁ-হেঁ! (টেনে টেনে হাসি)

শ্রীকৃষ্ণ। (ফিস্‌ফিসিয়ে) মাইরি পেনো, খামোকা সব মাটি করে দিস নে। আমায় বলতে দে—(জোরে)

তোমারে অন্তিম দণ্ড দিতে
ঐ আসে ভীমসেন।
হও হে প্রস্তুত—
নামিছে তোমার পরে কালের বিচার।

গদা হাতে ভীমের প্রবেশ

ভীম। রে রে রে রে পামর!
এইবার কোথায় পালাবি? পাইয়াছি তোরে!
সমুচিত দণ্ড দিব এবে।
আয় রণে—গদাযুদ্ধ করি তেরে সনে।

দুর্যোধন। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওরে নিমে, এবার আমিও পেয়েছি তোকে।
হা রে রে রে রে রে—
গদাযুদ্ধ আমার সঙ্গে?
বোঝ ঠ্যালা!

গদাম করে গদা দিয়ে এক বিরাট ঘা বসালো নিমাইয়ের পিঠে

ভীম। অ্যাঁ—একি! আমাকে মারলে যে বড়? এরকম তো কথা ছিল না!

দুর্যোধন। চোপরাও।—রোগা পটকা নিমে
ভাঙিবে আমার উরু। (বিচ্ছিরি মুখ করে) অ্যাঁঃ—
তোর মতো অনেক ভীমকে আমি গিলে খেতে পারি, বুয়েছিস? যা—যা।

[গদা দিয়ে ভীমকে আর এক ঘা। নিমে ঠেকাতে গিয়েও পারল না—উঃ বলে চেঁচিয়ে উঠল]

শ্রীকৃষ্ণ। এ কী কাণ্ড। দুর্যোধন—এ কী ব্যবহার?
কথা আছে ভীম ভাঙিবে তব উরু।

তুমি কেন ভাঙিতেছ পিঠ তার,
কহ, কোন অধিকার-বলে হেন কার্য করিতেছ ?

দুর্যোধন। ওঃ—তুমি আবার ওর হয়ে ওকালতি করতে এসেছ ?
ওরে—ওরে খোঁড়া কেষ্ট, ওরে ধড়িবাজ—
দাঁড়া তবে। দিব দেখাইয়া
কত ধানে কত চাল হয়।

[দড়াম করে শ্রীকৃষ্ণের পিঠে গদাঘাত ; শ্রীকৃষ্ণের সবেগে পতন। এবং তার চাইতেও বেগে উত্থান]

শ্রীকৃষ্ণ। ওরে বাবা রে! কালুদা—

[খোঁড়াতে খোঁড়াতে দ্রুত প্রস্থান

দুর্যোধন। যা, নিয়ে আয় ডেকে—
তোর কালু-আলু-কলা-মূলো যা যেখানে আছে—
সবারে করিব আমি ঠাণ্ডা,
খাইব চিবায়ে কচ্ কচ।
এই ভীমসেন, পালস কোথায় ?

ভীম। ছেড়ে দাও আমাকে। আমি আর গদাযুদ্ধ করব না তোমার সঙ্গে।

দুর্যোধন। গদাযুদ্ধ করবি না—বললেই হবে ? ভীম হয়েছিস না ?
দাঁড়া এবে—
তোর যত লম্ফঝম্ফ—সমস্ত ওস্তাদি
এবার করিব শেষ—

[বলেই গদা তুলে দমাদ্দম পিটতে শুরু করল ভীমকে। দু-একবার ঠেকাতে চেষ্টা করে ভীম শেষে মাটিতে পড়ে গেল, তারপর জুড়ে দিল পরিত্রাহি চিৎকার]

ভীম। কালুদা—বাঁচাও—বাঁচাও। এই হতচ্ছাড়া পেনোটা ঠেঙিয়ে ঠেঙিয়ে আমাকে মেরে ফেললে—

দুর্যোধন। রেখে দে তোর কেলো—ভুলো, কলামূলো—
পিটিয়ে পিটিয়ে তোকে করে দেব তুলো—

আবার ধপাধপ গদাঘাত, নিমাইয়ের আর্তনাদ

ভীম। কালুদা—কালুদা—

দুর্যোধন। কালুকে করিব আমি আলুসেদ্ধ!

কালুদা, প্রম্পটার, আরো দু-তিনজনের প্রবেশ

কালুদা। ভয় নাই—ভয় নাই—ভীমবধ হতে নাহি দিব!
সৈন্যগণ—চেপে ধর এই পাষণ্ড দুর্যোধনের ঠ্যাং—
ফেলে দাও চিৎ করে
অবিলম্বে ভূমিতলে।

[সকলে মিলে দুর্যোধনকে ধরে ফেললে, তারপর ফেলে দিলে মাটিতে। এর মধ্যে দুর্যোধন বেশ কয়েক ঘা বসিয়েছে সকলকে। কালুদা তার গদাটা কেড়ে নিলে]

দুর্যোধন। ছাড়ো—ছাড়ো—ধর্মযুদ্ধ কর—
এস একে—একে,
সবে মিছে কেন ধর ঠেসে?

নিমাই ওরফে ভীম তখন জুত পেয়ে দু-ঘা লাগালো দুর্যোধনকে

ভীম। হা রে রে রে রে দুর্যোধন,
এবার কেমন লাগে?

দুর্যোধন। স্তব্ধ হও কাপুরুষ! (চিৎকার করে) দেখলেন মশাইরা, দেখলেন? ব্যাটা ভীমকে দিয়েছিলুম ঠাণ্ডা করে—সবাই মিলে কিভাবে আমায় বিধ্বস্ত করলে—দেখলেন? এটা কী রকম ব্যভার হল অ্যাঁ? ও মশাইরা, ও অডিয়েন্সের ভদ্রলোকেরা, দেখলেন তো একবার?

কালুদা। থাক—থাক, খুব হয়েছে! প্লে করতে এলুম দুর্যোধনের উরুভঙ্গ—বানিয়ে দিলে ভীম-বধ! এদের নিয়ে থিয়েটার, মশাই? এর চাইতে খোল কর্তাল নিয়ে কালাকেত্তন গাইতুম, অনেক ফল হত এর চেয়ে। থিয়েটার এই পর্যন্তই থাক। এই ড্রপ ফ্যাল্—

যবনিকা

বিধায়ক ভট্টাচার্য

মহাপূজা

[সপ্তমী পূজার সকাল। পল্লীগ্রাম। ভোরের বাতাস শিউলির গন্ধে মধুর। প্রধান রাস্তা দিয়া দলে দলে গ্রামের কিশোর কিশোরী চক্রবর্তীদের নাট-মন্দিরে সপ্তমী পূজা দেখিতে চলিয়াছে। বিচিত্র পূজার পোষাক তাহাদের পরণে। সকলেরই মুখ হাস্যোজ্জ্বল। চিত্ত আনন্দময়। নিম্নলিখিত কথাবার্তা বলিতে বলিতে তাহারা পথ চলিতেছে]

১ম । বাবা বলেছেন আমার এই জামার ছিট্‌টা একদম নতুন —জানিস্ এটা কোথাকার ?

২য় । কোথাকার ভাই ?

১ম । জাপানের।

৩য় । জানি জানি জাপানের রাজধানী টোকিও।

২য় । ও মা! তুমি জাপানী জিনিষ গায়ে দিয়েছ ভন্তু। আমার ছোট্‌কা' বলেন জাপানী জিনিষ গায়ে দিতে নেই।

১ম । হাঁ, তোর ছোট্‌কা' তো সবই জানে। জাপান ছাড়া কাপড় চোপড় আর হয় নাকি কোথাও ?

২য় । কেন, জেঠামশায় বলেন আমাদের দেশে নাকি কাপড় তৈরী করবার অনেক কারখানা হয়েছে।

১ম । আমাদের দেশে কি এইরকম ছিট হয় ?

২য় । কেন আমাদের গাঁয়ে শঙ্কর তাঁতি যে কাপড় তৈরী ক'রে সেও তো খুব ভাল ভাই।

১ম । সে তো সিল্কের কাপড়। সিল্কের কাপড় মেয়েরা পরে।

৪র্থ । আমার এই জুতোর দাম কত জান?

২য় । কত?

৪র্থ । পাঁচ টাকা ন' আনা। বাবা বলেছেন—এইরকম জুতো সহরের ছেলেরা পায়ে দেয়।

৩য় । তোর জুতো জোড়া ভাই সত্যি ভাল। আমারটা বিচ্ছিরী।

৫ম । আর আমার টুপী? আমার টুপীটা কেমন?

১ম । তোর টুপীটা সত্যিই ভাল। বেশ জরী-টরী দেওয়া।

[সকলে পরস্পরের পূজার জামা কাপড়ের সমালোচনা করিতে করিতে পূজা মণ্ডপের দিকে চলিয়া গেল। কিন্তু জীবনের সব ক্ষেত্রেই আলো আঁধার দুইটি দিক আছে। পূজা উৎসবের ক্ষেত্রেও তাহার ব্যতিক্রম ঘটে নাই। আমরা এতক্ষণ আলোর দিক দেখিলাম। এইবার চলো দেখিয়া আসি এই আনন্দময় শরৎপ্রভাতে কোথাও কোন গৃহে এখনও দারিদ্র-রাত্রির প্রভাত হয় নাই। গ্রামের প্রান্তে ৺অবিনাশ চাটুয্যের বাড়ী। অবিনাশের বিধবা স্ত্রী ও তাহার দশ বৎসরের কনিষ্ঠ সন্তান 'মানু' ম্লানমুখে দাওয়ার উপর বসিয়া আছে। আজ সপ্তমী, এখনও কলিকাতা হইতে মানুর দাদা 'সুবল' আসিয়া পৌছায় নাই। বাপ মারা যাওয়ার পর আজ তিন বৎসর সুবলই কলিকাতায় থাকিয়া সামান্য একটি চাকুরী দ্বারা এই সংসারের গ্রাসাচ্ছাদন চালাইতেছে, এবং নিজে অপরিসীম কষ্ট স্বীকার করিয়া সে গত তিন বৎসর ধরিয়া ছোট ভায়ের পূজার কাপড়, জামা, জুতা এবং মায়ের জন্য একখানি নূতন থান কাপড় কিনিয়া দিয়া আসিতেছে। অন্যান্যবার সে পঞ্চমীর দিন বাড়ী আসিয়া পৌছায়, কিন্তু এবার সপ্তমীর প্রভাতেও সে আসিয়া পৌছে নাই। খেলার সাথীরা মানুকে পূজা মণ্ডপে যাইবার জন্য ডাক দিয়া গিয়াছে, কিন্তু এখনও তাহার নূতন কাপড়জামা আসে নাই বলিয়া লজ্জায় সে বাহির হইতে পারে নাই। মায়ের মুখে চিন্তার রেখা ছেলের মুখ ম্লান।]

মানু । দাদা তো এখনও এল না মা!

মা । আর একটু পরেই সে এসে পড়বে মানু। সকালের গাড়ী এই তো সবে এল! ইষ্টিশন থেকে আস্‌তে সময় লাগবে না ?

মানু । এবার দাদার আস্‌তে এত দেরী হচ্ছে কেন মা ?

মা । কি জানি বাবা, কেন তার আসতে দেরী হচ্ছে। কাপড় জামায় আমার দরকার নেই ; সে ভাল থাকলেই বাঁচি।

[মানু অধীর ভাবে বারবার দরজার কাছ অবধি গিয়া দেখিয়া আসিয়াছিল হঠাৎ সে চীৎকার করিয়া উঠিল]

মানু । মা ! মাগো ! দাদা এসেছে—দাদা এসেছে মা !

[মা অগ্রসর হইয়া সুবলকে লইয়া আসিলেন। সুবলের বয়স উনিশের বেশী হইবেনা। এই অল্প বয়সেই তাহাকে পিতার অভাবে সংসারের ভার লইতে হইয়াছে। অত্যধিক পরিশ্রমে সুন্দর মুখখানির উপর একটি কালো ছাপ পড়িয়াছে]

মা । তোর এবার এত দেরী হ'ল যে খোকা ?

[সুবল তাহার সুটকেশ খুলিয়া ভায়ের জামা, কাপড়, জুতা ইত্যাদি বাহির করিতে করিতে বলিল]

সুবল । এমনি হ'য়ে গেল মা ! আয়রে মানু ! দেখ দিকি গায়ে দিয়ে ঠিক হ'ল কিনা। হয়েছে ? আচ্ছা এবার জুতো জোড়া পায়ে দে তো ! ঠিক হয়েছে ? বাঃ ! চমৎকার মানিয়েছে তোকে ! পছন্দ হয়েছে তো মানু ?

মানু । খুব ভাল হ'য়েছে দাদা। ভুলো আর ক্যাবলার চাইতে আমারটা অনেক ভাল হয়েছে। যাই ওদের দেখিয়ে আসি।

[এই বলিয়া এক দৌড়ে বাড়ী হইতে বাহির হইয়া গেল। সুবল আর একখানি সাদা কাপড় বাহির করিয়া বলিল]

সুবল । মা তোমার কাপড়—

[মায়ের পায়ে রাখিয়া প্রণাম করিল। মা তাহাকে নিঃশব্দে আশীর্বাদ

করিলেন। সুবল প্রণাম করিয়া উঠিয়া জামা ছাড়িতেই মায়ের চোখে পড়িল তাহার অনাবৃত দেহ]

মা । ও মা! তুই কি রোগা হয়ে গেছিস খোকা? কি হয়েছে? হাঁরে ওকি! তোর হাতের সোনার কবচ কোথায় গেল?

[সুবল একবার মায়ের দিকে চাহিয়া মাথা নত করিল। মা আগাইয়া গেলেন]

মা । কী হয়েছে? খোকা? চোখ তোল—চা আমার দিকে। কী হয়েছে বল্।

সুবল । (ম্লান কণ্ঠে) আজ তিন মাস থেকে আমার চাকরী নেই মা! তাই—

মা । তাই তুই হাতের সোনার কবচ বেচে এইসব জামা কিনে এনেছিস্? ছি-ছি-ছি! এ তোর কি বুদ্ধি খোকা? একটা বছর না হয় মানুকে না দিতিস্।

সুবল । ও যে ছোট! ও যে পথ চেয়ে বসেছিল মা!

[পথে নামিয়া মানুর মনে হইল, দাদার কাছ হইতে দুইটা পয়সা আনি। সে দরজার কাছে আসিয়া শুনিতে পাইল, দাদা বলিতেছে তাহার চাকরী নাই। উত্তরে মা যা বলিলেন তাও সে শুনিল। কী বুঝিল কে জানে! গম্ভীর মুখে ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল। তারপর পূজামণ্ডপে উঠিয়া প্রতিমার সামনে হাত জোড় করিয়া বিড়বিড় করিয়া বলিল]

মানু । মা দুগ্‌গা! আমার দাদার চাকরী যেন হয়। আর ওই যে সোনার কবচ, ওটাও দাদাকে ফেরৎ দিও। মা দুগ্‌গা!

[দুই চোখ দিয়া অবিরাম ধারে জল পড়িতে লাগিল]

অন্নদাশঙ্কর রায়

জনরব

প্রথম দৃশ্য

রেল ষ্টেশন

[সত্যচরণ মুস্তফী মাল গুনতি করছেন, এমন সময় শম্ভুচরণ দে এলেন।]

শম্ভু । ইষ্টিশনে করছ কী
সত্যচরণ মুস্তাফী ?

সত্য । আরে, কে ?
শম্ভু দে ?
যাচ্ছি ভাই
বেগুসরাই।

শম্ভু । বেগুসরাই !
বেগুসরাই !
হঠাৎ কেন
ইচ্ছা হেন ?

সত্য । লোকের মুখে শুনছি, ওমা
কলকাতায় পড়ছে বোমা।
পড়ল যদি কলকেতায়
পড়বে না কি গড়বেতায় ?

শম্ভু । তাই নাকি হে তাই নাকি
আমিও কেন রই বাকী ?

পড়ল যদি গড়বেতায়
পড়বে না কি বাঁকুড়ায় ?

সত্য । সেই কথাটাই বলল কালু মিস্তিরি।
তাই না শুনে কাঁদল আমার ইস্তিরি।
পালিয়ে এলুম কাচ্চাবাচ্চা সব নিয়ে
কোন মতে কাছাকোঁছা সামলিয়ে।

শম্ভু । আমিও তবে সরে পড়ি
জোগাড় করি টাকাকড়ি।
যেতে হবে জামতাড়া
সাথে নেই রেলভাড়া। [প্রস্থান]

দ্বিতীয় দৃশ্য

রাস্তা

[শম্ভুচরণ দে ছুটছে। কুঞ্জ পাল উল্টো দিক থেকে আসছে।]

কুঞ্জ । হন্‌হনিয়ে যাচ্ছে কে !
শম্ভু দে ?
ছুটছ কেন ল্যাজ তুলে
বলো আমায় মন খুলে।

শম্ভু । বলব কী, ভাই কুঞ্জ পাল
দেখবে চোখে আপনি কাল !
বাঁকুড়াতে পৌষ মাস
গড়বেতায় সর্বনাশ।

কুঞ্জ । গড়বেতায় ! গড়বেতায় !
কী হয়েছে গড়বেতায় !

শম্ভু । কী হয়েছে দেখো গে
ইষ্টিশনে থেকো গে।

আসছি আমি এক ছুটে
ভাই ভাইপো সব জুটে।
পথ ছেড়ে দাও, ছাড়বে না ?
শোন তবে···বোম···বোমা। [প্রস্থান]

কুঞ্জ । বাপ রে বাপ! দিলুম লাফ।
বাসায় গিয়ে পোঁটলা নিয়ে
ভাগব দূরে ভাগলপুরে। [প্রস্থান]

তৃতীয় দৃশ্য

মাঠ

[রাখাল গরু চরাচ্ছে। কুঞ্জ পাল দৌড়াচ্ছে।]

রাখাল । অমন করে লাফায় কেটা ?
পালের বেটা ?

কুঞ্জ । দেখছিস কী ? ওরে ও
ঘোষের পো।
আনতে হবে মস্ত মোট
আয় রে, ওঠ।
ইষ্টিশনে পৌঁছে দে
পয়সা নে।

রাখাল । কী হয়েছে, বল না ?
করছ কেন ছলনা ?

কুঞ্জ । মাথায় তোর গোবর
শুনিস্ নি সে খবর ?
গড়বেতায় বোমা···

রাখাল । ওমা···(মুর্চ্ছা গেল)

পুলিশ । (প্রবেশ করল)
ক্যা কিয়া তোম, খুন কিয়া ?
মৎ যাও তোম, জান লিয়া !
কুঞ্জ । দোহাই হুজুর ! পুলিশম্যান !
আমার ওপর চটেন ক্যান্ ?
গড়বেতায় পড়ল বোম্…
পুলিশ । ক্যায়সা বাত বোলতা তোম !
কুঞ্জ । সত্য কথা বলছি, জী
ইষ্টিশনে চলছি, জী।
পুলিশ । আরে বাপ রে, চাচ্চা রে
এ বাত তব সাচ্চা রে।
হাম যাতেহেঁ দেশ। [বিদায়]
কুঞ্জ । বেশ, সিপাহী, বেশ।
ইষ্টিশনে থামিও। [প্রস্থান]
রাখাল । (উঠে বসছে) পালাই তবে আমি ও। [দৌড়]

চতুর্থ দৃশ্য

রাস্তা

[রাখাল গোরু-বাছুর ছাগল নিয়ে যাচ্ছে। ভূতনাথ বাগ্দী দেখে বলছে।]

ভূতনাথ । গোরু বাছুর ছাগল নিয়ে
চলল কোথায় ? পাগল কি এ !
রাখাল । পাগল নয় গো ঘোষের পুত
বুঝবি কী তুই, বাগ্দী ভূত !
ভূতনাথ । ভূতনাথ বাগ্দী সাক্ষাৎ বাঘ
ছাগল দেখলে তার জাগে অনুরাগ।

[ছাগল ধরে টান]

রাখাল । ও কী রে! ও কী রে! তুই ও কী করছিস্!
ছাগলটা মিছিমিছি কেন ধরছিস্!
মরি আর বাঁচি আমি যাবই যে রাঁচি
মালগাড়ী চড়ে এরা রবে কাছাকাছি।

ভূতনাথ । রাঁচিতে পাগলে যায়, যায় ছাগলে কি ?
ছেড়ে দে, আমার পেটে যায় কি না দেখি।

রাখাল । ওরে ভাই ভূতনাথ তোরে করি প্রণিপাত
সময় যে নাই আর সময় যে নাই রে।
রেলগাড়ী দাঁড়াবে না, হবে না টিকিট কেনা
বোমা খেয়ে মারা যাব ভূতনাথ ভাই রে।

ভূতনাথ । বোমা!...

রাখাল । শুনিস্নি!...

ভূতনাথ । .. বোমা!

রাখাল । ...পালা।

ভূতনাথ । ওরে ভাই ঘোষ রে।
ধরিস্নে দোষ রে।
আগে যদি যাস্ তুই করিস্ টিকিট
ট্রেণটাকে আটকাস্ পাঁচটি মিনিট।

পঞ্চম দৃশ্য

ষ্টেশনে। টিকিটঘর

[টিকিটবাবু ঘুম দিচ্ছেন। লোকজন ডাকাডাকি করছে।]

...বাবু মশাই, টিকিট।
..বাবু সাহেব, টিকিট।

…এ বাবুজী, টিকিট।
…বড় বাবু, টিকিট।
…বড় সাহেব, টিকিট।
…বড় হাকিম, টিকিট।
…জং বাহাদুর, টিকিট।
…নবাব বাহাদুর, টিকিট।
…রাজা বাহাদুর, টিকিট।
…হুজুর বাদশা, টিকিট।
…কিং এম্‌পেরর্‌, টিকিট।
…গড অলমাইটি, টিকিট।

টিকিটবাবু। [দাঁত খিঁচিয়ে]
কেন এত গোলমাল!
যত সব বোলচাল!
সাড়ে চার ঘণ্টা
লেট আজ ট্রেণটা।
[আবার ঘুম]



সমর চট্টোপাধ্যায়

অবন পটুয়া

দৃশ্য

রাজবাড়ী

অবন বন

অবন পটুয়া
রাজকুমারী
সাত সখী
তিলকধারী
রাজপুত্র
মন্ত্রিপুত্র
কোটালপুত্র
সদাগরপুত্র
সাত তুলি
লাল তুলি
রাজা

বাঘ
হরিণ
বানর
ময়না
গাছ
ঝরণা

সেই সে দূরে অচিন পুরে
ছিল যে এক মস্ত রাজার বাড়ী ;
যোজন দূরে আকাশ জুড়ে
মস্ত আছে সবুজ গিরি,

পায়ের নীচে সবুজ দূর্ব্বা-সারি,
বিছিয়ে তাকে বন বনানী ঘুমায় সুখে।
জেগে উঠে হাওয়ায় দুলে
কইছে হেসে—
"ভালোবেসে
আমরা বাঁচি,
আমরা নাচি
বাঁশীর সুরে
পাখির হাসির মানিক ঝুরে।"
বনের মালিক মহারাজা
মৌনী তাপস,—
না দেয় ধরা।
লুকিয়ে থেকে নীরব হেসে
খেলা দেখেন।
হাজার পরী ডানা মেলে
সূর্য্যকণার পথটী ধরে
তারায় তারায় কুড়িয়ে বেড়ায়
সুবাস মাখা নানান রংয়ের
নানান ফুলের কুঁড়ি।

* * * *

হেথায় রম্য প্রাসাদ মাঝে
আছেন রাজা নানান কাজে।
রাণী আছেন। রাজার কুমার—
সাদা ঘোড়ার মস্ত সওয়ার।
আছেন পাত্র, সেপাই সান্ত্রী,
আছেন মিত্র, কোটাল মন্ত্রী।

লক্ষ প্রজা—
তারাও রাজা।

*　　*　　*

সেই যে রাজা তার যে ছিল
এক রূপসী কন্যে।
রাজা রাণীর চোখের মণি ;—
হাসলে পরে মানিক পড়ে।
কাঁদলে পরে মুক্তো ঝরে।
রাজকুমারীর সাতটী সখী
সাতটী রংয়ের সাজিয়ে ডালি
কুতূহলে হেথায় বসি। আঁকবে লিখন রাজকুমারী
স্বর্ণ-মেঘের ঝলক তোলা প্রভাতরবির খেলা।
রাজার মেয়ে কইছে সুরে,—
"সুনীল আকাশ ভালো লাগে।
ভালো লাগে
সারা বেলা
সাতটী রংয়ের
রঙীন খেলা।"
সেই খেলাটী রাখবে ধরি
রঙীন পটে রাজকুমারী।

*　　*　　*

[ছোট্ট রাজকন্যা, কতই বা বয়স হবে ? ধরো, দশ বা এগারো ! কি মিষ্টি তার চেহারা, যেন ফুট্‌ফুটে সদ্য-ফোটা সুগন্ধ সাদা গোলাপটী !—সাতটী খেলার সাথী, সাত রংয়ের চুমকি দেওয়া ঘাগ্‌রা পরা, হাতে রংয়ের আধার। রাজকন্যা ছবি আঁকবেন তাই এই আয়োজন। শরতের আকাশ ঝল্‌মল্‌ করছে। জানালা দিয়ে দূরের

পাহাড়ের সবুজ রং আর তার আলোর ঝিলিমিলি দেখা যাচ্ছে। রাজকন্যা সেই রংয়ের খেলা পটে ওঠাবেন। সখীরা হাসিমুখে রং এগিয়ে দিচ্ছে।]

রাজকন্যা

* ঐ আকাশের অযুত তারা
কিসে গড়া ? কেউ জানো কি ?
সাগরের জলের কণা
লাল কেন না ? কেউ জানো কি ?
সাদা মেঘ কখন কালো,
মিষ্টি কেন চাঁদের আলো ?
এই যে ধরা কখন ধূসর
কখন সবুজ ? তা-ও জানো কি ?
শুভ্র তুষার হিমের পাহাড়—
রংয়ের বাহার সকাল সাঁঝে,
কেন সে লুকিয়ে থাকে
গভীর রাতে
মিশ-কালো ঐ চাদর ঢেকে
তাও জানো কি ?
ও ছবি রাখবে নাকি পটে আঁকি ?
(না গো না, নেইকো ফাঁকি।)
তুলিটি আপন মনের রং-আধারে
নাও ডুবিয়ে,
তুলিটি নিংড়ে আকাশ প্রাণ-সায়রে
নাও চুবিয়ে।
পটেতে বোলাও তুলি

আপন ভুলি আঁক ছবি—
রঙ্গে মাখি ॥

(গানের তালে তালে রাজকন্যা সখীদের রঙের আধার হতে রং নিয়ে ছবি আঁকছেন, মাঝে মাঝে জানলা দিয়ে সবুজ পাহাড়ের দৃশ্য দেখছেন। বাইরের রং আর ছবির রং মিলছে না। রাগ করে রাজকন্যা তূলি ছুঁড়ে ফেলে দিলেন, রাগে দুঃখে অভিমানে ঠোঁট ফুলিয়ে সখীদের বললেন—

"যাঃ যাঃ যাঃ। তোরা সব দূর হয়ে যাঃ।"

রাজকন্যার মেজাজ দেখে, রংয়ের আধার ভূঁয়ে রেখে, সখীরা তো ছুট্।

"বাব্বাঃ, যা মেজাজ। যাই চাঁপাকে পাঠিয়ে দি গে।"

রাজকন্যা আবার তাকাচ্ছেন সেই জমকালো পাহাড়ের দিকে। আবার ছবিখানা তুলে নিয়ে ছবির দিকে।—না না নাঃ, এ আঁকা কিচ্ছু হয়নি, ছবি হেলায় ফেলে দিয়ে, রংয়ের পাত্র উল্টে ফেলে মেঝের পাতা লাল্‌চে রংয়ের গাল্‌চেতে বসে পড়লেন রাজার মেয়ে।

"তাই তো রং মেলে না কেন?

সপ্তসখী এদিকে চাঁপাকে খবর দিয়েছে—"চাঁপাদি,' রাজকন্যের মেজাজ আবার খারাপ, রং ছুট; সব উল্টে ফেলে একাকার—গালচেতে রংয়ের বন্যা—সামলাও।" চাঁপা রাজকুমারীর সমবয়সী, কোরাসে হাসে, কাঁদে, নাচে, খেলে, আবার ছবিও আঁকে। পা টিপে টিপে সে লাল্‌চে রংয়ের গাল্‌চের পাশে এসে দাঁড়াল, রংয়ের পাত্র আবার গুছিয়ে রাখল, ছবিখানা আলগোছে তুলে নিয়ে তারিফ করে বলল—

"বাঃ, বেশ।"

রাজকন্যা চুপ। তেমনি ঠোঁট উল্টে বসে রয়েছেন। একটু মুচকে হেসেই মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর করে চাঁপা বল্‌লে,—)

"ওমা ওমা ওমা!

ভূঁয়ে মাথা দিয়ে
অমনি আছ শুয়ে,
তুমি কেমন ধারা মেয়ে ?
হ্যাঁ গা, কেমন রাজার মেয়ে ?

রাজকন্যা

জানিস্ নি ভাই চাঁপা।
হবো আমি রংয়ের কারিগর,
রকমারি রং গুছিয়ে সাজাই ঘর।
মন দিয়ে তো চালাই তুলি আপন ভুলি।
মনের মত কোথায় মেলে রং ?

চাঁপা

তা সেই জন্যে তুমি
কোন্ দুখেতে থাকবে শুয়ে কঠিন ভূঁয়ে ?
সোনার রং যে তোমার গায়ে।
চোখের তারায় কালো চুলে
কালো ভ্রমর রয় লুকিয়ে।
সব ঠায়ে রং খোঁজা রাখো,
আর্শিতে রূপ নিজেই দেখো—
চাঁদ রয়েছে তোমায় ছুঁয়ে।

রাজকন্যা

মিথ্যে কথা!
* রূপ দেখেছি সবুজ পাতায়,
সাদা মেঘে, পাখীর নাচায়—
রংয়ে রংয়ে আকাশ মাথা
নীল চাঁদোয়া মেঘে ঢাকা!

কাকচক্ষু কালো জলে রাজহংসীর খেলা,
দীঘির ধারে কিশলয়ের সবুজ রংয়ের মেলা।
কে সে তূলিকার—
সাজিয়েছে এই শ্যামল ধরা তাজা রংয়ের রেখায় ?
অমনি ধারা রংয়ের বাহার
তুল্‌বে পটে কে ?
কে শেখাবে অমন ধারা আঁকা ?

চাঁপা

বেশ কথা।
শিখবে আঁকা ? পটুয়া চাই ?
অভাব কিসের ? বলব রাজায়।
রাজপটুয়া তূলির টানে তুলবে রংয়ের ঢেউ।

রাজকন্যা

দেখিস্‌, তলিয়ে না যায় কেউ।
*সব পটুয়া রং চেনে না,
রং চেনা কি এতই সোজা ?
রং-কানা যে রং বোঝে না।

(রাজপুত্রের প্রবেশ। এ সেই সাদা ঘোড়সওয়ার। রাজকন্যার দাদা। সারা মুখটি দুষ্টুমিতে ঝিকমিক করছে।)

রাজপুত্র

* রং-কানাদের রং ছোটে—
তাল-কানাদের তাল কোটে।
তাই বলি আজ সাধা গলায়
গাইছে কে আজ রংয়ের সা রে গা মা ?
রাজকন্যে দিদি ?

না, সুরের দোলা দিচ্ছে নেচে
দোলন-চাঁপা দিদি ?
তুলিও চল্‌ছে না—
নূপুরও বাজছে না।

চাঁপা

*রাজকন্যের মনে,
নানা রংয়ের বান ডেকে যায়
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে।
রংয়ের মালা গাঁথছে সুখে কতই রংয়ে।
রূপে, বর্ণে, ছন্দে, গন্ধে, কতই ঢংয়ে।
কোন অজানার দরশনে ?

রাজকন্যা

কিন্তু দাদা!
মনের ছবির রং মিলেছে,
পটের ছবির রং মিল্‌ছে না।
চলছে তূলি হাতের টানে,
মনের কথা শুনছে না।
রংয়ের ফানুস্ উড়িয়ে মানুষ
তাকায় অন্য মনে।

চাঁপা

নানা রংয়ের বান ডেকে যায়
ক্ষণে ক্ষণে ক্ষণে।

রাজকন্যা

*আঁকিবে ছবি রংপটুয়া লিখিবে রং গাথা কবি,
মোর তূলিকা হেলায় আঁকে বাঘের গায়ে নানা ছবি।

টংকারিয়া তীরের ফলা আকাশ পানে চলে ছুটি'
উড়তি পাখী রংয়েতে মাখি ধরার 'পরে পড়ে লুটি !

চাঁপা

আহা !
রাজকুমারীর নয়ন দুটি ছলছলিয়া ওঠে ফুটি'।

রাজকন্যা

গগন-গায়ে পাখী
উড়িয়া চলে সুখে,
নিঠুর শর-ফলা
হানিলে কেন বুকে ?

রাজকন্যা

তুমি তুচ্ছ পাখী দেখছ দিদি,
দুষ্ট মানুষ দেখছ না !
এই তরবার শিষ্টে পালে,
দুষ্টে হানে—জানছ না !
(তাই তো আমি)
*সাদা ঘোড়ার সওয়ার হলেম,
তেপান্তরের মাঠ ছাড়ালেম,
সেই সে অবন বন ছাড়িয়ে
গেলেম অচিন দেশে।

হিংসুটে সব দত্যিদানা—
রাঙিয়ে আঁখি দিল হানা,
তরবারির ঘায়েই তারা
লুটোয় ধুলোয় শেষে।

চাঁপা

সাবাস্। সাবাস্। রাজার কুমার!
সঙ্গে ছিল কারা?
সঙ্গে ছিল কোটালপুত্র মন্ত্রিপুত্র—তারা।

("ও, বিশ্বেস হচ্ছে না বুঝি?" ব'লেই রাজপুত্র বাজিয়ে দিলেন সংকেতধ্বনি। সঙ্গে সঙ্গে খোলা তরবারি হাতে ঢুকলো মন্ত্রিপুত্র, সদাগর-পুত্র আর কোটাল-পুত্র। বুক ফুলিয়ে রাজকুমারের পাশে এসে দাঁড়িয়ে বলল—)

*ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্। সঙ্গে ছিলেম মোরা।
মোরা রং চিনি নে রং বুঝি নে,
রং-কানাদের জ্ঞাতি,
(আছে) লিকলিকে মোর তরবারি
এই খেলাতেই মাতি।
ওই যে পাহাড় উঠ্‌ছে নভে—
হেলায় ছোটাই ঘোড়া।
ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্। সামনে ছিল রাজপুত্তুর,
সঙ্গে ছিলেম মোরা।

রাজপুত্র

*মায়ার দেশে লুকিয়ে আছেন
রংয়ের যাদুকর,
বুলিয়ে তুলি আকাশ মাট
সাজান ধুরন্ধর।
তরবারির খোঁচায় তোমার
ছিট্‌কে যে রং পড়ে—
সেটাও যে তাঁর তুলির আঁচড়

বুঝবে কেমন করে ?
ধিক্, ধিক্, ধিক্। মিথ্যে করো বড়াই দাদা,
মিথ্যে ছোটাও ঘোড়া ;
খামখেয়ালি রংয়ের রাজায়
নাইকো কোথাও জোড়া।

(রাজকন্যার সখীরা আড়াল থেকে ভাইবোনের ঝগড়া শুনছিল। রাজপুত্রের সাগরেদ্‌দের ঢুকতে দেখে রাগে গা জ্বালা করছিল, তাই আর না থাকতে পেরে সদলে প্রবেশ)

ঠিক্, ঠিক্, ঠিক্। রং-রাজেরি ডাক শুনেছি
তাইরে নারে নানা।
(তার পরেই সুরু হয়ে গেল ছড়ার লড়াই)

সখীরা

* ঘাসে মাঠে আকাশ বাটে
*রংয়ে রংয়ে সোনা।

সখারা

গহন বনে খুঁজে বেড়াই
চপল হরিণ-ছানা।

সখীরা

নিত্য খেলি দীঘির যে ধার
পলাশ ফুলে রাঙা।

সখারা

নিত্য মোদের সাদা ঘোড়া
ছুট্‌ছে লাগাম ভাঙ্গা।

সখীরা

মোদের তূলির আঁচড় কেটে
নূতন ছবি আঁকি।

সখারা

তরবারির খোঁচায় জানাই
জীবনটা যে ফাঁকি।

(ঝগড়া আর কতক্ষণ চল্‌বে ? কেননা যাদের নিয়ে ঝগড়া সেই ভাইবোন হাত ধরাধরি করে দিব্যি নাচ্‌ছে। তাই এরাও বলে, —ভালো রে ভালো! আমরা কেন ঝগড়া করে মরি ? তার চেয়ে শেষ কলি গেয়ে চলে যাই—)

মোদের যা পাওয়া তাই পাওনা—
মোরা পাইনে যেটাই মানা।
না পাওয়াটাই বিষম হয়ে
দুঃখ যে দেয় হানা।

(বলতে বলতে রাজকুমারের সখারা তলোয়ার নাচিয়ে চলে গেল, অন্য দিক্ দিয়ে রাজকন্যার সখীরাও করল অন্তর্ধান।
চাঁপা মুচকে হেসে তাকাতেই রাজকন্যা বলে উঠল—)
ঠিক কথাই তো!
(মোদের) যা পাওয়া তাই পাওনা,
(মোরা) পাই নে যেটাই ফাঁকি।

চাঁপা

যেমন মাছধরা ছিপ দিয়ে,
রাঘব বোয়াল সেটাই
যেটা পালিয়ে গেল
ফাৎনা ছিঁড়ে নিয়ে।

রাজকন্যা

* রং দেখেছি সবুজ পাতায়,
ওই আকাশের নীলের আভায়,
নীল যেটা তা সূর্য্যিমামা
ছড়িয়ে যে যান প্রভাত বেলায়।
সরষে ফুল আর পাতার মাঝে
হলদে সবুজ মিশেই আছে,
সাগর-জল আর মেঘ ফেনিয়ে
অমন ছবি কে এঁকেছে?

চাঁপা

কে এঁকেছে?
শুধাও ওকে।
তিলকধারী রাজপটুয়া
ঐ যে আসে, ডাকবো তাকে?

রাজপুত্র

উঁহু হু হু হু!
ডাক্‌বে তাকে? ডাকো।
তুঁতে গঁদ আর ফাগ মিশিয়ে
সোনার হরিণ আঁকো
রাজপুত্তুর, এবার তুমি
এখান থেকে ভাগো।
(ব'লেই রাজপুত্তুর পিট্‌টান)

* * *

(তিলকধারী রাজপটুয়া রাজকন্যাকে ছবি আঁকা শেখান। ছোট্ট রাজকুমারীর জন্য তিলকধারী না পারেন এমন কাজ নেই। নিত্য তাকে নতুন নতুন ছবি দেখানো, রংয়ের কারচুপি বোঝানো তিলকধারীর কর্ম্ম। আজ ঘরে ঢুকতেই চোখে পড়েছে রং ও পটের

বিপর্যয়, তূলি, রং ও পট ইতস্ততঃ ছড়িয়ে রয়েছে। অাঁৎকে উঠে বললেন রাজার চিত্রকর—)

তিলকধারী

রংয়ের আধার কে ফেলেছে,
পট ছিঁড়েছে কে ?

চাঁপা

রং মেলে নি, রাজকুমারী
তাই তো রেগেছে।

রাজকন্যা

(তিলকদাদা !) আমি করব বল কি ?
সব পেয়েছি বর পেয়েও পাই নি যেন কি !

তিলকধারী

* তূলিতে রং, রংয়েতে তূলি,
বুলায়ে গেনু সকলি ভুলি';
পটেতে তবু ওঠে না ছবি
যে ছবি মনে গাঁথা।
পটুয়া রং কভু না ফেলে,
হেলায় তুমি দিলে তা ফেলে !
শিখিবে অাঁকা কিসের ছলে,
প্রাণেতে পেনু ব্যথা।

রাজকন্যা বললেন, তিলকদাদা, তুমি রাগ করেছ ? নীল আকাশের সাথে প্রভাত রবির রংয়ের মিল তুমিই তো শিখিয়েছ! প্রভাতে বনের সবুজ ও সাদা ঝিকিমিকি রং-রেখা পটে তুলবো বলেই তো এতো আয়োজন !

আমি ভেবেছিলেম তুলবো পটে—

আজ প্রভাতের রবি।

(কিন্তু)

মিথ্যে হ'ল তূলির টান

(আর) ফুটলো না ছবি।

তাই ঠিক করেছি আর ছবি আঁকবো না। এবার থেকে—

* আমি হব রংয়ের কবি।

তাই তো আমি পণ করেছি

আঁকবো না আর ছবি।

থাক্ গে আমার ছবি আঁকা,

সরল রেখা হোক্ গে বাঁকা,

যে আঁক্তে জানে দেখব আমি

তারই আঁকা ছবি।

আমি হব রংয়ের কবি।

রাজপটুয়া বুঝলেন রাজকন্যার অভিমান হয়েছে, তাই আজ ছবি আঁকার চেয়ে ছবি দেখাই ভাল। হঠাৎ চাঁপা বলে উঠলো—

তিলকদাদা, তোমার হাতে ও কি ?

রাজকন্যা

রূপোর পাতের আধারে

অত যতনে কি রেখেছ রাজপটুয়া ?

তিলকধারী

আমি রাজার বাড়ীর পট-পশারী,

পট ছাড়া আর থাকবে বা কি ?

(এতে আছে)

* শ্বেতবরণ কন্যা তার মেঘবরণ চুল,

রক্তবরণ বাস আর কর্ণে পীত দুল।

সাগর-নীল ওড়না গায়ে
কালো হরিণ আঁখি—
পায়ের নূপুর ধ্বনি
আমি তাও রেখেছি আঁকি'।

চাঁপা

কই, কই, কই ?
রাজপটুয়া, দেখাও তোমার ছবি।

রাজকন্যা

সয় না দেরী তিলকধারী,
কে সে অমন কন্যা ?
দেখাও দেখাও দেখাও আমায়
নয়তো সে সামান্যা।

(ছবি দেখার আগ্রহে রাজার দুলালী আর সখী চাঁপা তিলকধারীকে জড়িয়ে ধরল। রাজপটুয়ার আনন্দের আর সীমা নেই। রূপোর পাতের মোড়ক থেকে সযতনে বার করলেন এক অপরূপ পট। ও মা! এ যে রাজকন্যারই প্রতিকৃতি! অবাক হয়ে ওরা ছবি দেখছে, তারপর উচ্ছ্বসিত রাজকন্যা—)

ও রাজপটুয়া! অবাক্ মানি!
এর কোন্‌টা বা পট ? কোনটা আমি ?

চাঁপা

আশ্চর্য !
ফুলেল কেশের পাচ্ছি সুবাস তোমার পটে,
হাসির মানিক পড়ছে ঝরে ছবির ঠোঁটে।
ধন্য তোমার তুলি বটে।

(ভীষণ আপত্তি করে তিলকধারী বললেন—)

না—না—না—না,
আমি কিছুই জানি না।
অঙ্কনে মোর হাতেখড়ি,
শেখা আমার হয়নি মোটে।

(সহসা রাজপটুয়ার অঙ্গবাস হতে সোনার পাতে মোড়া একটা পট পড়ে গেল ভূমিতে। বিদ্যুতের মত তা কুড়িয়ে নিয়ে ঠেকিয়ে বললেন রাজপটুয়া—)

অঙ্কনে মোর হাতেখড়ি,
শেখা আমার হয় নি মোটে!
* বনের মাঝে আছেন ঋষি বনপটুয়া,
সব পটুয়ার রাজা তিনি মনপটুয়া।
আপন মনে ছবি লেখেন,
কখন কাঁদেন কখন হাসেন;
তুলির কলম আপনি চলে,
খুশীর গানের ধরেন ধুয়া।
সজীব ছবি আঁকেন তিনি—
ঝর্ণা যে তার কথা বলে,
আকাশ হাসে, বাতাস গাহে,
পাখীর নাচের হল্‌লা চলে।
সবটুকু তার নিংড়ে নিয়ে
পটে তোলেন মনপটুয়া
(শুধু কি তাই ?)
কুড়িয়ে নিয়ে টুকিটাকি
গড়েন পুতুল, গড়েন পাখী।
যেথায় ক্ষয়ে মধু মিঠে।

লাগলে তাঁহার তূলির পরশ
প্রাণ পেয়ে যায় পাষাণ ভূয়া।

নাচতে নাচতে রাজপটুয়া কাঁদছেন। রাজকন্যা আর চাঁপা তো অবাক্। সোনার পাতের মাঝে এমন কি আছে যাতে অমন আনন্দের বন্যা ভেসে যায়?

চাঁপা

* তোমার হাতে
সোনার পাতে
আছে কি?

রাজকন্যা

দেখি দেখি
পটে আঁকি
রেখেছ কি?

তিলকধারী

আছে আছে
মোর কাছে পটে তোলা—
সাত রংয়ে নানা ঢংএ
নাচে ভোলা।
সুধা ঝারি, ঝরে বারি
পদতলে,
রং-রেণু, রামধনু
শোভে গলে।
শিরে জটা, ছবি-ছটা,
দেয় দোলা,
পট মাঝে নানা সাজে

নাচে ভোলা।

বার বার কপালে সেই স্বর্ণমোড়ক ঠেকিয়ে তিলকধারী পট মোড়ক থেকে খুলে ধরলেন। চমকে গেল রাজকন্যা আর তার সখী চাঁপা। আহা মরি!

রাজকন্যা

মিলেছে মোর রংয়ের ছবি মিলেছে,
ও তিলকদাদা!
কোথায় তোমার বনপটুয়া?
বনের ঋষি?
আমি খুঁজছি তাঁকেই অহর্নিশি।
"খুঁজছ কা'কে অহর্নিশি?"

(বলতে বলতে স্বয়ং মহারাজের প্রবেশ। রাজকন্যা রাজার চোখের মণি—সে যা চাইবে তা তখনই দিতে হবে। আদর করে তাই কন্যাকে বললেন—)

(আজ) কোন খেয়ালের চাওয়া,
আমার ছোট্ট খুশী মা?
গজমোতির মালা?
পারিজাতের ডালা?
নয়তো কঠিন পাওয়া,
আমার ছোট্ট খুশী মা?

(ছুটে রাজকন্যা, পিতার হাত ধরে বল্‌লেন—)

পিতা, রংয়ের জোয়ার—
তুলির লিখন দেখবে এসো

(স্বর্ণ-পত্রিকায় মোড়া পট খুলে ধরতেই রাজা নির্বাক্)

রাজকন্যা

* (আমি) চাই নে গজমোতির মালা,

পারিজাতের সাজি,
যেথায় আছেন বনের ঋষি
সেথায় যাব আজি।
চুপিসাড়ে আসন নেবো,
রং ও তুলি এগিয়ে দেবো,
বিভোর হয়ে দেখব শুধু
পটের লিখন আজি।

রাজা

কে এ যাদুকর ?
রাজপটুয়া! নীরব কেন ?
কোথায় বা এঁর ঘর ?
তিলকধারী! মোর মিনতি—
যেথায় থাকেন রংয়ের রাজা
সেথায় তুমি যাও ;
পাল্‌কি, ঘোড়া, চতুর্দোলা—
যা নেবে তা নাও।

স্বর্ণসূতার পট দেবো,
চন্দনবাট তুলি দেবো,
সোনার রংয়ের আধার দেবো,
(তাঁকে) হেথায় এনে দাও।
প্রবল আপত্তি করে রাজপটুয়া বললেন—
* আমার গুরু ছোঁবেন নাকো সোনাদানা,
চতুর্দোলা, পাল্‌কি তাঁহার চড়তে মানা।
ভালবাসার আধারে
তাঁর রং যে ধরা,

সপ্ত সুরের সাতটি তূলি রংয়ে গড়া।
সাদা সূতোর পটে তোলেন
অশ্রুহাসির ছন্দ নানা ;
আমার গুরু ছোঁবেন নাকো সোনাদানা।

(সত্যিই তো, এ ছবি যিনি এঁকেছেন দরকার কি তাঁর সোনাদানায় ? পৃথিবীর সবটুকু মণিমাণিক্য যে ইনি ধরে রেখেছেন ঐ সাদা সূতোর ঠাসা বুনোট দেওয়া পটে। রাজা ভাবছেন, তাই তো, তবে কিসের অর্ঘ্য দেবো এই বুনো পটুয়াকে ? রাজকন্যা মুখে আহ্লাদ মেখে তিলকধারীকে বল্‌লেন—)

* (ও তিলকদাদা,) আছে যে তাঁর রংয়ের খনি,
নাই বা নিলেন সোনা মণি ;
অনেক ধনের মালিক তিনি, আমি তা জানি।
তিনি যে মনপটুয়া;—মনের কথা তোলেন পটে,
অলখে মোর মনের কথা তারি আশে হাওয়ায় ছোটে।
আস্‌তে তাঁকে হবেই হবে,
শুন্‌ছি তাঁহার পায়ের ধ্বনি।
(তিলকদাদা, তুমি যাও।)

(রাজপটুয়া তিলকধারীর আপত্তির বাঁধ ভেঙ্গে গেল। সযতনে পট-পত্রিকা মুড়ে রেখে রাজকন্যার হাতে দিলেন ; তারপর মহারাজকে প্রণাম করে বনপটুয়া প্রাসাদে আমন্ত্রণ জানাতে চল্‌লেন—)

* যাইব যাইব সেথা, আনিব তাঁহারে হেথা,
রঙিন তূলির লিপি দেখাব ;
চলিতে চলিতে পথে কুড়ায়ে লইব সাথে,
আলোতে রংয়েতে গানে মিশাব।
সেই রং দিব ঢালি, নবীন বরণ ডালি—

নবীন প্রাণের নতি জানাব।
যাইব যাইব—সেথা যাইব।

বনের নাম সবুজ পাহাড়।

সবুজ পাহাড়ের নীচে ঘন বন। তাতে শাল-পিয়ালের ছড়াছড়ি। লতাপাতার মরশুম—রকমারি ফুল অঢেল বাহার—অগণ্য আগাছা কিন্তু কে যেন তাও চমৎকার ভাবে সাজিয়ে রেখেছে। হেথায় সেথায় মখমলের মত ঘাসের গাল্‌চে পাতা—কারা যেন এখুনি নেমন্তন্নে আসবে। প্রকাণ্ড একটা পুরানো বটগাছ, সব গাছের রাজাই হয়তো—গম্ভীর কালভৈরবের মত চারিদিকে জটাজুট ছড়িয়ে বসে আছে। গাছে গাছে ঝাঁকে ঝাঁকে পাখী।

একটা কল্‌কল্ ঝরঝর শব্দ ভেসে আসছে দূর থেকে। সবুজ পাহাড় থেকে নেমে এসেছে ঝক্‌ঝকে ঝরণা। তার চলার আওয়াজে স্বরোদের মিঠে তান—সা—রে—গা—মা—পা—ধা—নি—সা।

আহা! এমনি যে সাজানো বাগান, তাতে প্রাণের স্পন্দন নেই! সমস্ত বন নিঝুম। পাখীর কাকলী নেই। কিসের ঘোরে সবুজ পাহাড় ঝিমুচ্ছে! সবুজ পাহাড়ের সবুজ রং নেই। পাহাড়, পাখী—সব ধূসর। ফুলের রং পাংশু। গোলাপ, যুথী, মালতী, মল্লিকা, বেল, পলাশ নিষ্প্রভ। টিয়া, চন্দনা, ময়না—সব ছাই-রংয়ের কামিজ পরে বসে আছে। গাছের পাতার সবুজ রং কে নিংড়ে নিয়েছে!

এক টুকরো মেঘ সূর্য্যকে ঢেকে ছিল। সরে যেতেই, খানিকটা রোদ এসে পড়ল বৃদ্ধ বটের সম্মুখে। সেখানে চমৎকার একটা পাথরের বেদী, তার উপর শ্যামল আসন। সমস্ত বনে রং এইটুকু মাত্র।

ঝিকমিকে রৌদ্রের স্পর্শে বেদীর চারিদিকে একটা স্পন্দন

দেখা দিল। কারা যেন গা ঝাড়া দিয়ে উঠে দাঁড়াল। বিবর্ণ ঘাসের সাথে মিশে শুয়ে ছিল নানারকম বনের পশু। বাঘ, হরিণ, ভাল্লুক জেব্‌রা, বাঁদর, শেয়াল, কুকুর। গাছের ডালে ও বেদীর ধারে ছিল শালিখ, ময়ূর, ময়না, টিয়া, চন্দনা, কাক, ফিঙ্গে, কোকিল, মাছরাঙ্গা। কিন্তু এদের রং ঐ বিবর্ণ ঘাসেরই মত। সব জানোয়ার আর পাখীর রং কে যেন লেপে পুছে একসা করে দিয়েছে। বনের আড়াল থেকে আস্‌ছে ঝিঁঝিপোকার একটানা আওয়াজ।

সহসা ঝরণার সুর বদলে গেল। কলকণ্ঠে বন ঝংকৃত করে ঝরণা মূর্ত হয়ে নেমে এল—

* আ হা হা হা হা !
হা হা হা হা !
অসেছে সে ঐ আস্‌ছে—
(তার) পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি,
মোরা তাই তো সুখে নাচ্‌ছি।
তানপুরোতে সুর চড়িয়ে
(টুং তানানা টুং
টুং তানানা টুং)
পাহাড় বেয়ে গানটি গেয়ে
রংয়ের রাজা আস্‌ছে
আস্‌ছে সে ঐ আস্‌ছে।
খুশীর ভরে পাথরগুলি
ঝাঁপায় জলে কি সুর তুলি।
(টুং তানানা টুং
টুং তানানা টুং)
জলের কণা লাফিয়ে উঠে

পায়েতে তার পড়ছে লুটে,
উঠ্‌ছে ফেনা—
সাপের ফণা
রবির কণা মাখ্‌ছে।
আসছে সে ঐ আসছে!

পাহাড়ী ঝর্ণা মত্ত হয়ে নাচ্‌তে নাচ্‌তে নামছে পাহাড় থেকে। সমস্ত বন সজাগ হয়ে উঠলো। কিসের শিহরণ গাছপালা পশু-পক্ষীকে আনন্দের দোলা দিয়ে গেল।

বুড়ো বটগাছের আনন্দের সীমা নেই। গানের সাথে সাথে মাথা দুলিয়ে তাল রেখে চলেছে বুড়ো—

* ঝিক্ ঝিকারা ঝিক্।
ঝিকারা ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্।
টিক্ টিকারা টিক্।
টিকারা টিক্ টিক্ টিক্।

সরল গাছের সারি গান ধরেছে; তাদের সেই চমৎকার চামরের মত পাতাগুলি তালে তালে দুলছে—

* (তার) পায়ের আওয়াজ শুন্‌ছি,
(মোরা) তাই তো সুখে দুলছি;
শুক্‌নো হাওয়া উড়িয়ে ধূলা
বইছে না আর, শীতল ধরা।
(শন্ শনানা শন্)
শন্ শনানা শন্)
রংয়ের আমেজ ভাস্‌ছে
আস্‌ছে সে ঐ আস্‌ছে।

—নাচতে নাচতে ময়না গাইছে—

* (আমি) বাহারী পাহাড়ী ময়না
(মোর) একটুও দেরী সয় না
(গলে) দুলিয়ে সোনার গয়না।
(আমি) নূপুর পরিব পায়ে।
ঐ রংয়ের জহুরী আস্‌ছে।
আস্‌ছে সে ঐ আস্‌ছে।

—ঝরণা আবার গাইছে—

(তার) পায়ের আওয়াজ পাচ্ছি,
(মোরা) তাই তো সুখে নাচ্‌ছি।
তানপুরোতে সুর চড়িয়ে
(টুং তানানা টুং
টুং তানানা টুং)
পাহাড় বেয়ে গানটি গেয়ে
রংয়ের রাজা আস্‌ছে,
আস্‌ছে সে ঐ আস্‌ছে।

পশুদের পায়ে খুশীর নূপুর বেজে উঠলো।

বাঘ। (আমি) ঘোঁয়াও, ঘোঁয়াও, হাঁকছি।
ঘোড়া। (আমি) চিঁহি, চিঁহি, চিঁহি, ডাক্‌ছি।
বাঁদর। কিচি মিকি কিচি চিমু কি।
আমি রংয়ের পাবো না কিছু কি ?

ছাই-রংয়ের পরিবেশে কে যেন চক্‌মকি ঠুকে আগুন ধরিয়ে দিয়েছে, রং নেই তাও, যেন বহুদূর থেকে একটা উজ্জ্বল আলোর আভা আস্‌ছে। সহসা ঝরণার সুর বদলে গেল। বলে উঠল সে সুরে—

চুপ, চুপ, চুপ।
কথা না, চুপ, চুপ, চুপ।
তুলিতে ফোটাবে রূপ
নড়ো না, চুপ, চুপ, চুপ।

আনন্দের দোলা দিয়ে সমস্ত বন স্তব্ধ হয়ে গেল! সত্যিই আস্‌ছে তাঁর পায়ের আওয়াজ। তানপুরোর তারে বাজছে সুর, ফুটছে রং। সেই রংয়ের ঝলক এসে পড়েছে বটগাছের ছায়ায় বেদীর ওপরে। পশু ও পক্ষীর নিশ্চল দেহের উপরে। অমন যে ছাই-রং তা-ও ঝিকমিক করছে।

এলেন অবন পটুয়া। সমস্ত দেহ হাসিতে খুশীতে দুষ্টুমিতে নড়ে উঠ্‌ছে। চোখ নাচছে, হাসছেও। পিঠে তার ঝোলান একটি তূণ। তাতে সাতটী তূলি মুখ বাড়িয়ে বলছে—"আমরা এলাম"। এ তূলি জীবন্ত। তূলিতে রংয়েরও শেষ নেই। পায়ে পায়ে অবন পটুয়া আস্‌ছেন। যেখানে বিবর্ণ ঘাসের ওপর পা পড়ছে সেখানেই সবুজ হয়ে যাচ্ছে। সরল গাছের শাখাটি বলছে—

"যাচ্ছো কোথায়? রঙ মাখিয়ে দাও আমায়।"

হেসে হাত বুলিয়ে দিলেন পটুয়া। সরল গাছের, সব পাতা সবুজ হয়ে নাচতে লাগল। বুড়ো কালভৈরব বলছে, "সবুজ করো এই তো সুরু।" একটা বটের জটা নেড়ে দিলেন অবন বুড়ো। বিদ্যুতের মত সবুজ পাতা ফুঁড়ে বেরুলো নীরস জট থেকে।

ভীষণ আপত্তি করে সাতটী রঙ্গিন তূলি মাথা নেড়ে বল্‌লে—

এ তোমার কোন দিশি ঢং?
হাত বুলিয়ে মাখাচ্ছো রং।
আমরা তবে এলাম কেন, আমরা কি সং?

বলেই কি কাণ্ড! সাতটী তূলি তূণ থেকে টকাটক্ তীরের মত

লাফিয়ে পড়ল বটগাছের বেদীর ওপর। তারপরেই নাচ। মাথায় রংয়ের জড়োয়া টুপি, মসৃণ মখমলের নরম পোষাক। তালে, রংয়ে, সুরে, মিলে রংয়ের জলসা। সাদা, লাল, সবুজ, হল্‌দে, কালো, নীল, বেগুনী, রংয়ের তূলির পা যেখানে পড়ছে, সেখানেই সে রংয়ের ছোপ।

তূলিরা নাচতে নাচতে গাইতে লাগল—

* রংয়েতে তূলিতে মনগড়া মিল হয় না,
সবুজের পোঁচ আকাশে লাগাও—
সে রং আকাশে রয় না।
হলুদে ছোপাবে সাগর জলেতে ?
সে রং ফেরাবে বালুকা-বেলাতে ?
পৃথিবীর মাটি হয় যদি নীল—
মানুষ সে মাটি সয় না,
রংয়ের তূলিতে গোলমালে মিল হয় না।

সবাই অবাক্ হয়ে তূলির নাচ দেখছে। ছোপে ছোপে ঘাসের ওপর যেন কাশ্মীরী গালচের মত রংয়ের নকসা তৈরী হয়ে যাচ্ছে।

খটা খট্, খট্, টকা, টক্, টক্,।
ধাকেটে, ধাকেটে, ধাক্কা।
রাঙ্গা টুক্‌টুক্,
গালে টোপ্, টুক্।
টুকে নে টোকাতে ছাক্কা।
শিরে শিরে ঠোক্
রংয়ে রংয়ে হোক্
নয়া রং গড়া পাক্কা।
তূলি তোলা থাক্,
রংয়ে ধুয়ে যাক্,

পটে থাক্ রেখা ফাক্কা।
খটা খট্ খট্
চলি চট্পট্,
তূণেতে মারি গে টোক্কা!

সাতটী তূলি আবার তীরের মত অবন পটুয়ার তূণে গিয়ে লাফিয়ে পড়ল। অমনি ছুটে এল ময়নামতীর ময়না।

* "আমি বাহারি পাহাড়ি ময়না
মোর একটুও দেরী সয় না;
গলে ঢুলিয়ে সোনার গয়না,
আমি নূপুর পরিব পায়ে!"

হেসে পটুয়া তূণ থেকে হলদে তূলিটি বার করে ময়নার গলায় গয়না, পায়ে নূপুর পরিয়ে দিলেন; আহ্লাদে ময়না নাচ্‌তে লাগলো।

বেদীর ওপর উঠে বসলেন পটুয়া। বুড়ো কালভৈরব কৃতার্থ হয়ে পাতা দুলিয়ে হাওয়া দিতে লাগল। পাখী ও জন্তুরা আনন্দে নাচতে সুরু করেছে। এবার যে রং ফেরাবার গান! দুষ্টু বাঁদর এক লাফে বেদীতে হাজির।

"কিচিমিচি কিচি চিমুকি,
আমি রংয়ের পাব না কিছু কি?"

"পাবে বৈকি"! পটুয়া লাল তূলি দিয়ে বাঁদরের মুখে, পায়ে, ল্যাজে রং চড়িয়ে দিলেন। তড়াক্ করে বাঁদর চলে গেল অদূরে ছোট্ট ঝিলের ধারে। স্বচ্ছ আয়নার মত জলে মুখ দেখে সে কী খুশী! এক এক করে পাখী আর পশুরা বেদীর কাছে আসছে, আর রং মেখে চলে যাচ্ছে। তূলিতে রংয়ের শেষ যেন নেই। বটগাছের জটা বেয়ে তর তর ক'রে নেবে এল একগোছা বিবর্ণ ফুল, তাতে রং ঢেলে

দিলেন পটুয়া। ঝোলা থেকে মোষের শিংয়ের ছিপি খুলে দু-চার ফোঁটা সুগন্ধ ঢেলে দিলেন; সুঘ্রাণ ছড়িয়ে দুলতে লাগলো পুষ্পগুচ্ছ।

এমনি সময় অনেক দূর থেকে এল একটা প্রাণখোলা গানের সুর—

* ও হো হো হো হো হো—হা হা।
এ তুলি প্রেমরসে মাখা;
কিছুটা শুধু রেখা,
কিছুটা মনে লেখা,
কেহ বা চলে সোজা,
কেহ বাঁকা। হা হা হা হা!
রাঙিয়ে দিয়ে ফাগে
কেহ বা সুধা মাগে,
ওপাশে বসি কাঁদে
রংয়ের অনুরাগে।
ও হো হো হো হো হো হা হা।
কাহার এ রং-রাখী
বেঁধেছে পশুপাখী
এক ডোরে এক সুরে
আছে বাঁধা আছে সাধা॥

রং ফেরাতে ফেরাতে থমকে গেলেন বনপটুয়া। তুলিটি ক্ষণেক থামিয়ে শেষ রেখা টেনে তূণে রাখলেন তুলে। বাইরের গান ভেতরের পশুপক্ষীকে চঞ্চল করেছে। গানের সাথে নাচছিল তারা —সুখে নয়, শঙ্কায়। ভাবছিল—"কে এল আবার?"

আসবে আবার কে, তিলকধারী ছাড়া কে গাইবে এমন মিঠে গান! এলেন তিলকধারী—

* অনেক বাধা অনেক বোঝা বয়ে
আমি এলেম গুরুর ঠাঁয়ে। ধন্য আমি।
শূন্যে ওড়ে আমার গুরুর ধ্বজা,
খানিকটা তার হাসির ঝলক—
খানিক প্রেমে ভেজা।
তার ইশারায় আকাশ থেকে
আসে যে চাঁদ নামি,
আমি তাঁহার অধম চেলা জানি ;
তবু ধন্য আমি।

ময়না

আরে আরে উড়ে এসে জুড়ে বসে
ইনি কে রে ?
দেব নাকি কষে এক ঠোক্কর ?

হরিণ

চুপ্ চুপ্ চুপ্ সব, চুপ কর।
তুমি কে হে মহাশয় ?
যাও বাড়ী, হেথা নয়।
অবনের বনে মিছে
গোলমাল নাহি সয় ॥

বাঘ

ছিটে ছিটে রং মিঠে
আমি চিতে বাঘা মিতে।
এক ফোঁটা জ্ঞান যদি,
থাকে তোর মোটা ঘটে,
পালা পালা, বন ছেড়ে সরে পড়

তিলকধারী

* আমার গুরুর তূলির পরশ পেয়ে
তোরা আছিস্ বেঁচে,
রংয়ের রেখায় পুচ্ছ তোদের নাচে,
তোরা আছিস্ বেঁচে,
পাঞ্জা ধরি গুরুর দেয়া—
সাতটি সুতোর রাখী।
সাধ্য কিরে রুখবি আমায়
তুচ্ছ পশুপাখী ?
আমি তাঁহার অধম চেলা জানি,
তবু ধন্য আমি।

সকলে হাত জোড় করে বুড়ো পটুয়াকে মিনতি জানিয়ে বলল—

না না না !
এর কথা কভু তুমি শুনো না।
আমাদের বন তুমি ছেড়ো না,
যেয়ো না যেয়ো না প্রভু, যেয়ো না ॥

বেচারী তিলকধারীকে এই মারে আর কি ! ভাগ্যিস্ হাতে ছিল তার গুরুর দেওয়া পাঞ্জা। অবন পটুয়া তাদের থামিয়ে বললেন—

থামোস্ থামোস্, দুষ্টুমিটা
শিকেয় থাকুক তোলা,
চুপ করে বোস্, নয়তো নেবো
ছাই রংয়েরি ঝোলা।
শুনতে পেলাম কালকে যেন
ছোট্ট মেয়ে বলছে ডেকে,
ঠাকুরদা ভাই, গল্প বলো,

দাও না ছুটি ছবি এঁকে।
তাই তো হঠাৎ পাহাড় থেকে
এলেন নেমে এই কাননে,
রং ফেরালাম তোদের দেহে
খেয়াল মত আপন মনে।
ঢের দিয়েছি আমি তোদের
পায় নি কিছু সেই মেয়েটা,
না হয় দিলুম ক্ষীরের পুতুল
পটে আঁকা তিন-পেয়েটা।
মন বলেছে, তিলকধারী,
আমায় সেথায় যেতেই হবে,
দিস্ নে বাধা ওরে অবুঝ,
আস্‌বো আবার আস্‌বো ফিরে।

বলতে হল না তিলকধারীকে কিছু।

সারা বনকে হাতের যাদুতে ঘুম পাড়িয়ে উঠে দাঁড়ালেন বনপটুয়া। তূণের সাতটী তূলি মুখ চাওয়া-চাওয়ি করছে। তিলকধারী গুরুকে পথ দেখিয়ে চলেছেন। নিঃশব্দে বাঁদর বটগাছের শাখায় উঠল। সহসা চল্‌তি পটুয়ার তূণ থেকে হাত বাড়িয়ে মুঠো করে তূলি ক'টি তুলে নিল বাঁদর। সাদা, নীল, .কালো, সবুজ, হলদে, বেগুনী তূলি রইল তার মুঠোয়। শুধু লাল তূলিটা একলা পড়ে রইল তার তূণে। টের পেলেন না যাদুকর, টেরও পেলেন না তিলকধারী।

মনের আনন্দে তিলকধারী গেয়ে চলেছেন—
আমার গুরুর তূলির পরশ পেয়ে
তোরা আছিস বেঁচে;

রংয়ের রেখায় পুচ্ছ তোদের নাচে,
তোরা আছিস্ বেঁচে।

বনের জীবেরা তাকিয়ে রইল চলার পথে। বুড়ো বটগাছের দীর্ঘশ্বাস পড়ছে—

ঝিক্ ঝিকারা ঝিক্।
ঝিকারা ঝিক্ ঝিক্ ঝিক্॥

তিলকধারীর সাথে এলেন বুনো পটুয়া রাজার বাড়ী। মহা সমাদর করে নিলেন রাজা। রাজকন্যা ও তাঁর সখীদের মন পলকে জয় করে নিয়েছেন বৃদ্ধ ঠাকুরদা। কত কাহিনী ও গল্প বুড়ো জানেন! ফাঁকে ফাঁকে আসেন রাজপুত্র ও তাঁর সঙ্গীরা গল্প শুনতে। লুকিয়ে শোনেন রাজা, কথার ডিগবাজিতে তাজ্জব ব'নে যান। কে যেন নানা রঙ, রস ও রূপ দিয়ে অন্তরে ছবি এঁকে দিয়েছে। রাজকন্যা বলেন, "দাদু, তোমার গল্পের কাঠঠোকরার ঠুক্ ঠুক্ শুনতে পাচ্ছি! তোমার পুতুলটা ডুকরে কেঁদে উঠছে, এবার ওটাকে একটু হাসাও তো!" পটুয়ার স্পর্শ পেয়ে পুতুল কাঁদতে কাঁদতে সহসা হেসে উঠলো—দম বন্ধ হয়ে যায় আর কি!

হঠাৎ একদিন বললেন রাজকন্যা, "দাদু, ছবি আঁকবে না?"

চমকে উঠে তূণে হাত দিলেন বনপটুয়া; উঠে এলো লাল তুলিটি। এ কি হ'ল! গেল কোথায় অন্য তুলিগুলি?

রাজকন্যা বললেন, "দাদু, তুলি চাই? রঙ চাই? কত আছে আমার ঘরে, আমি নিয়ে আসছি।" হেসে বললেন পটুয়া, "না গো রাজকন্যে, আমি ত' অন্য তুলিতে ছবি আঁকি না! তাই তো, তুলিগুলি বেমালুম সরিয়েছে কে? ছবি আঁকি কি দিয়ে?"

"কেন, লাল তুলি দিয়ে!" বললে চাঁপা।

"হ্যাঁ দাদু, তুমি লাল তুলি দিয়েই আঁকো না!" বললেন রাজকন্যা।

"তথাস্তু।"—বলে পটুয়া তুলে নিলেন লাল তুলিটি। সহসা রাজকন্যা ও সখীদের অবাক্ করে দিয়ে মাটি ফুঁড়ে যেন বেরিয়ে এল সাতটী লাল তুলি। তারপরই নাচ—

সব লাল লালচে—
প্রভাতের রাঙা রবি আকাশটা লালচে!
সেই রবি সন্ধ্যায় লাল রঙ ঢালচে।
দোলে শাখে লাল ফুল,
রাঙ্গা জবা কাণে দুল,
অবহেলে বুনে যাই রোশনাই গালচে।

তুলি দিয়ে এঁকে দিই লাল নদী উত্তাল,
রাঙ্গামাটি ভেঙ্গে পড়ে ফুলে ওঠে রাঙ্গা পাল।
লাল চেলী পরে নায়
রাঙা বধূ ঘুম যায়,
লাল গাঁয়ে লাল কুঠি, ঢাকঢোল বাজছে।

ফাগুনে আগুন লাগে কৃষ্ণচূড়ার গায়,
টুকটুকে লাল পাখী লাল মেঘ পানে ধায়।
ওড়ে লাল ধূলিকণা,
লাল পরী মেলে ডানা,
ফাগেতে আগুন মেখে রঙে রঙ ঢালচে।
সব লাল লালচে!

তারপর শুরু হ'ল বনপটুয়ার ছবি আঁকা লাল তূলি দিয়ে। শুধু লালেরই কাজ হচ্চে। তাক্ লেগে গেল লাল পটুয়ার হাতে আঁকা লাল ছবি দেখে। লাল রঙের ঢেউ তুলছেন বুড়ো চিত্রকর। লাল তূলি অবিশ্রান্ত কাজ করে চলেছে। রাজকন্যা, রাজপুত্র,—সবাই মুগ্ধ।

তারপর একদিন লালের কাজ ফুরিয়ে গেল; থমকে দাঁড়াল লাল তূলি জিজ্ঞাসু চোখে।—এবার? অভ্যাস মত পটুয়া তূণে হাত দিয়েই দেখেন তূণ খালি। তবে? কি হবে? অস্থির হয়ে উঠলেন বুড়ো, অস্থির হয়ে উঠলো লাল তূলি।—প্রশ্ন করল পটুয়াকে—

কোথায় কোথায় কোথায়—বল
রঙ বোলাবো কোথায়?

বনপটুয়া

হল্‌দে ফুলের কেশর মাঝে
একটি কেশর চেয়ে আছে,
রক্ত রঙের ছিটে তুমি
দিয়ে এসো হোথায়!

লাল তূলি

বেশ কথা বেশ, তাই দিয়েছি—
রক্ত রঙের ছিটে,
ফুলের সুবাস পাচ্ছি আহা,
লাগছে বড়ই মিঠে!
আদেশ কর এবার মোরা
রঙ লাগাবো কোথায়?
কোথায়—কোথায়—কোথায়?

বনপটুয়া

ঐ যে গাঁয়ের বধূ চলে
কাজল-দীঘির ঘাটে,
সিঁথির সিঁদুর ধুয়েছে তার
জলের ছলক ছাটে ;
পথের ধূলোয় উঠছে না তার
আল্‌তা রেখা ফুটি',
রাঙিয়ে দিয়ে এসো মায়ের
ছোট্ট চরণ ছুটি ।
কপালে দাও আলতো করে
একটী সিঁদুর-ফোঁটায়—

লাল তুলি

বেশ কথা, বেশ, দিলেম ভালে
রক্ত সিঁদুর-ফোঁটা,
বুলিয়ে দিলেম পা ছুখানি
অলক্তকে গোটা ।
(আহা) রূপ খুলেছে মায়ের যেন
লক্ষী এলেন হেথায় !
এবার বল—রঙ বোলাবো
কোথায়—কোথায়—কোথায় ?

বনপটুয়া

সাঁঝ-আকাশে মেঘ করেছে—
মেঘে মেঘে কালো,

একটি ফাঁকে দিচ্ছে দেখা
রক্ত অরুণ-আলো।
রঙের ঝারির একটি পরশ
লাগিয়ে এসো হোথায়—

লাল তূলি

বেশ কথা, বেশ, দিলেম এঁকে,
সূর্যি মামার খেলা—
মেঘের সাথে মাঠে-ঘাটে
ভাসাক রঙের ভেলা।
লালের ঝারি হয়নিকো শেষ,
রঙ বোলাবো কোথায়?
কোথায়—কোথায়—কোথায়?

বনপটুয়া

আকাশে ঐ একটি তারা
মিটিমিটি জ্বলে,
কে দিয়েছে আগুন জ্বেলে।
কোন্ সে খেলার ছলে!
কুলতলাতে কাটুম কুটুম
সোনালি গিরগিটি—
ঠোঁটের ফাঁকে লাল ঢেলে দাও,
হাসুক মিটিমিটি।

লাল তুলি

বেশ কথা, বেশ, তারার বুকে
দিলেম আগুন জ্বেলে,

কাটুম কুটুম গিরগিটিটা
বেড়াক হেসে খেলে।
যা কিছু সব লাল হয়েছে,
এবার বল কোথায়?

বনপটুয়া

তাই তো এবার কোথায়?

বনপটুয়া খুঁজে পাচ্ছেন না কোথায় লাল তুলি ব্যবহার করা যায়। কিন্তু ছবি যে তাঁকে আঁকতেই হবে! হঠাৎ যেন ক্ষেপে গেলেন বুড়ো; বলে উঠ্‌লেন—

নদীতীরে দোলে ভুল
কাশবনে সাদা ফুল,
সাদা কেন, লাল হোক্‌—
লালে লাল।
এঁকে যাও—এঁকে যাও—এঁকে যাও!

খুশী হয়ে লাল তুলি সারা কাশবনকে লাল করে দিল। বারণ করবে কে? এ কি অনাচার! হায় হায় করে উঠল সব। তাতেই কি পাগল থামে? রাজপ্রাসাদের বিরাট বাঁধাঘাটে ছিল রাজকন্যার দু' চোখের মণি তুষার-ধবল জোড়া রাজহাঁস, নজর পড়ল পটুয়ার তাদের ওপর। হাঁক দিয়ে উঠলেন তিনি—

নীরবে গরবে চলে শ্বেত হাঁস—
তোলে জলে অপরূপ উচ্ছ্বাস;
হোক ঠোঁট, দেহ লাল—
লালে লাল!

রাঙা হোক,—তূলি দিয়ে
পোঁচ দাও।
এঁকে যাও—এঁকে যাও—এঁকে যাও।

চকিতে লাল তূলি রাজহংসের অমন চমৎকার সাদা পালকে মোড়া দেহ টক্‌টকে লাল করে দিল। আর্তনাদ করে উঠলো তুষার-ধবল। রাজকন্যার সখী চম্পা ছুটে গিয়ে খবর দিল রাজকন্যাকে। ছুটে এলেন রাজকুমারী। তুষার-ধবলকে দেখে কেঁদে ফেললেন—

"এ কি করেছ বনপটুয়া ?"

কে শুনছে রাজকন্যার কান্না ? তাঁর দৃষ্টি পড়েছে রাজকুমারের ঘোড়ার ওপর। সাদা ধবধব করছে তার দেহ। লাল তূলিকে আদেশ দিলেন ক্ষ্যাপা চিত্রকর—

টগাবগ্ টগাবগ্—
আগুন ছুটিয়ে পথে ও কে যায় ?
নেচে চলে সাদা ঘোড়া,—তেজে ধায়।
রাশ ধরি' ক্ষণকাল
করে দাও আঁখি লাল—দেহ লাল।
এঁকে যাও—এঁকে যাও—এঁকে যাও।
করে দাও লালে লাল।

দু'বার বলতে হ'ল না তূলিকে। বিদ্যুতের মত সে কেড়ে নিল সাদা ঘোড়াকে। তারপর যাদুর তূলি বুলিয়ে দিল সাদা ঘোড়ার দেহে, আঁখিতে, এমন কি ক্ষুরে। স্তম্ভিত সহিস যখন সম্বিৎ ফিরে পেয়েছে তখন তার হাতের রশিতে রয়েছে বিরাট লাল ঘোড়া,—চোখ দু'টি তার অঙ্গারের মত জ্বলছে। রাশ ছেড়ে ছুটল সে রাজকুমারের কাছে। এলেন রাজপুত্র। ঘোড়া দেখে তাঁর প্রাণ নিষ্ফল ক্ষোভে ফুলতে লাগল।

এদিকে লাল তূলির শ্রান্তি নেই সে পাগল পটুয়ার মুখ চেয়ে আছে।

সহসা বুনো চিত্রকর হাঁক দিয়ে উঠলেন। উত্তেজনায় তাঁর লাল জোব্বার ভেতর থেকে সারা দেহ কেঁপে উঠল ঃ

স্ফটিকের এ প্রাসাদ
চোখে আনে অবসাদ,
হোক্ লাল এ প্রাসাদ—লালে লাল ;
রাঙা হোক ঘরদ্বার,
সভাঘর, কি মিনার,
যাহা কিছু করে দাও লাল লাল।
এঁকে যাও—এঁকে যাও—এঁকে যাও।

সমস্ত রাজধানীতে স্তম্ভিত, চকিত করে দিয়ে অমন শ্বেতশুভ্র প্রাসাদকে লাল তূলি টক্‌টকে রক্তের মত লাল করে দিল। রুদ্ধশ্বাসে রাজা এলেন ছুটে, এল তিলকধারী। গুরুর পায়ে লুটিয়ে পড়ে বল্‌ল সে—"গুরু, তোমার লাল তূলি সামলাও।"

রাজকন্যা কেঁদে বল্‌লেন, "দাদু! আমার তুষারধবল—?"

রাজপুত্র ক্ষোভে বলে উঠলেন, "পটুয়া, আমার সাদা ঘোড়া দাও।"

সারা দেশ বল্‌ল, "পটুয়া, আমার সাদা কাশফুল ?"

বল্‌লেন রাজা—"আমার স্ফটিকের প্রাসাদ ?"

যেন সদ্য ঘুম থেকে উঠলেন বনপটুয়া। তূলি সামলে বললেন তিলকধারীকে—"তাই তো তিলক! কিন্তু রাজকন্যা যে বল্‌লে লাল তূলি দিয়েই ছবি আঁক ?" আশ্বাস দিয়ে বল্‌লেন বনের ঋষি—"বেশ,

তাই হবে। আমি ফিরিয়ে দেব সাদা কাশফুল, সাদা হাঁস, সাদা ঘোড়া, শ্বেত প্রাসাদ। আমি রাজধানী ছেড়ে গেলেই ওরা রঙ ফিরে পাবে।"

তারপর তিলকধারীকে বল্‌লেন—"চল তিলক!"

ডুকরে কেঁদে উঠলেন রাজকন্যা,—"দাদু, তোমায় আমি যেতে দেব না।"

রাজা, রাজপুত্র নীরব। ঈষৎ হেসে বনপটুয়া রাজকন্যার গায়ে হাত বুলিয়ে শেষবারকার মত গল্প বল্‌তে বল্‌তে ঘুম পাড়িয়ে দিলেন। তারপর তিলকধারীর কাঁধে হাত রেখে চলে গেলেন বনপটুয়া। আরো যেন বুড়ো হয়েছেন তিনি।

রাজা, রাজপুত্র স্তব্ধ। নেপথ্যে তিল্‌কধারীর কণ্ঠ শোনা গেল—

"ওহো হোহো হোহো হাহা!
এ তূলি প্রেম-রসে মাখা।
কিছুটা শুধু রেখা, কিছুটা মনে লেখা,
কেহ বা চলে সোজা,
কেহ বাঁকা।
হা হা হা হা!"



শৈল চক্রবর্তী

যাদুকর

নৃত্যনাট্য

কুশীলবগণ

১। অরূপ, (একটি ১২/১৩ বছরের কিশোর)
২। মোড়ল
৩। মহিলা
৪। তিনজন (খরাপীড়িত, যারা অনাবৃষ্টি···গাইবে)
৫। সুনন্দ, অরূপের বন্ধু
৬। যাদুকর বিক্রম
(বয়স্ক, চেহারা ও সজ্জায় ব্যক্তিত্ব থাকবে কিন্তু দাম্ভিক)
৭। আত্রা ও
কাত্রা } দুই সহকারী
৮। জনতা
৯। অরূপের দুই সঙ্গী
১০। দুটি মেয়ে

কিছু মন্তব্য

এই নাটকের জন্যে কিছু কিছু সরঞ্জাম দরকার যেগুলি শুধু magical effect দেখানোর জন্যে লাগবে। সূর্যমুখী ফুলগুলির বদলে ঐরকম কাগজের ফুলও করা যেতে পারে। তাদের মাথাতোলা কালো সুতো পেছন থেকে টেনে করা যেতে পারে। গাছের রং বদলানো আলোক-সম্পাতের দ্বারাই হবে।

যাদুকর বিক্রমের খেলার মধ্যে সত্যি ম্যাজিকের আভাস থাকা চাই। ধরে ফেললে দর্শক হাসবে। তাই কাঠের বাকসের খেলাটা কায়দা করে করতে হবে। বাক্সোর একদিকের ডালা খোলা যায় এমনভাবে তৈরী করা চাই সেটা খুলে আত্রা পর্দার ফাঁক দিয়ে বেরিয়ে যাবে। ডায়ালগ ছন্দে বলতে হবে এবং একটা মিউজিক থাকবে। শেষ কথা, অরূপের বাঁশি বাজানোটা ভাল বাজিয়ে দিয়ে play back করে করতে হবে। কিম্বা রেকর্ড করে তাও বাজানো যেতে পারে। মনে রাখতে হবে বাঁশিটাই এই নাটিকার প্রাণস্বরূপ।

ইতি
নাট্যকার

প্রথম দৃশ্য

[মঞ্চে আলো ফুটতেই দেখা যাবে কয়েকটা গাছ আর কয়েকটা (অন্ততঃ ছুটো) সূর্যমুখী ফুটে আছে। সূর্যমুখী ফুলগুলো কিন্তু বোঁটা বেঁকে নীচু হয়ে থাকবে। গাছের পাতাগুলোও দেখাবে হলদে যেন শুকনো হয়ে আছে।]

[অরূপ একটি সুন্দর কিশোর গান গাইতে গাইতে আসবে]

গান

ভালবাসি মিষ্টি আলো
আকাশভরা গান
ভালবাসি দোলন চাঁপার
দোতুল দোলা প্রাণ।
ফুলের হাসি উপচে পড়ে
হাওয়ার হাসি তেপান্তরে
আমার বাঁশির সুরে
ঢেউ খেলে যায়
হাসি খুশির বান।
ভালবাসি—মিষ্টি আলো
আকাশভরা গান॥

[তারপর তার বাঁশিতে ফুঁ দেবে অরূপ। আশ্চর্য এক মিষ্টি সুর ঝরে পড়বে তার বাঁশি থেকে। তারপর—]

(ফুলের কাছে গিয়ে) সূর্যমুখী সূর্যমুখী
কিসের তোমার তুখ
ওঠো ওঠো ওঠো জাগো
তোলো তোমার মুখ।

[অমনি সূর্যমুখী ফুলগুলো সোজা হয়ে উঠবে]

(গাছের কাছে গিয়ে)

হলুদ কেন তোমার পাতা
ওগো কিশলয়
জেগে ওঠো জেগে ওঠো
হোক সবুজের জয় ॥

[অমনি কিশলয়ের পাতাগুলো সবুজ হয়ে যাবে]

(এটা আলোক সম্পাতের দ্বারাই করতে হবে)

অরূপ। একি ? আমার সুরে সত্যিইত
মুখ তুলেছে সূর্যমুখী—গাছের
পাতা হয়ে উঠছে সবুজ।
আমার কথা শোনে ওরা !
কী মজা ! কেন এমন হলো ?
বুঝেছি, আমি ওদের ভালবাসি, তাই—

[একজন মাথা নিচু বিষন্ন লোকের প্রবেশ। এ হল গ্রামের **মোড়ল।** অরূপ তাকে দেখে তার কাছে যাবে। তার গায়ে ধীরে ধীরে হাত **বোলাবে।**]

অরূপ। কেন গো, কি হল তোমার ?
মোড়ল। সরে যাও—
অরূপ। বল না। কি হয়েছে ?
মো। কি হবে তোমার শুনে ?
অ। বলই না ছাই, শুনি।
মো। সব গেছেরে। সব গেছে,
আমার ঘরের সর্বস্ব
নিয়ে গেছে চোরে—হায় হায় হায়—
অ। দুঃখ কি গো, দুঃখ কি
গেছে যাহা যাক না

এ ধরায় আছে সুখ
লাভ নেই করে দুখ
খুশী মন থাক না।

মো। তুমি ছোকরা পাগল,
নয় মূর্খ। যার গেছে সব
সে করবে না দুঃখ?

[অরূপ বাঁশি বাজাবে। লোকটি ধীরে ধীরে তার দুঃখ ভুলে যাবে। হাসি হাসি মুখ তার।]

মোড়ল। কী আশ্চর্য!
আমার মনটা যেন
ভরে উঠল আনন্দে।
গেছে সব যাক
মনে আর কোনো দুঃখ নেই।
তুমি কি করে ভোলালে আমাকে?

অরূপ। আমি? আমি না,
আমার বাঁশির সুর।

মো। তোমার বাঁশিতে আছে যাদু
দুঃখ ভোলানোর যাদু—

অ। দেখনি। পাতা ঝরে যায় শীতে যার
বসন্তে তার ফুলের বাহার!

[মোড়ল আনন্দে চলে যাবে। অন্যদিক দিয়ে ঢুকবে একটি মহিলা। সে শোকাচ্ছন্ন ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে।]

অরূপ। কে তুমি মাগো
কিসের দুঃখ বলো।
চোখভরা জল

কথা বলো কথা বলো।

মহিলা। বলব কি মোর ভাষা নেই
কান্নাই মোর সার
বইতে পারিনা দুঃখের গুরুভার
অশ্রু ছাড়া যে ভাষা নেই
ওরে ভাষা নেই।

আমার চোখের মণি
চলে গেল
ওরে। আমার প্রাণের ধন
নেই নেই নেই।
বাছা আমার। সে যে আর নেই।
কোথা গেল, সে যে আর নেই।

তাই শুধুই অশ্রু সার
আর কোনো ভাষা নেই।

অরূপ। দুঃখ তোমার বড়
এই কথাটা মানি
মৃত্যু এসে নিয়ে গেল
তোমার চোখের মণি।

কিন্তু মাগো, এই ধরণীর বুকে
দেখছ নাকি নিত্য ফোটে ফুল
হাওয়ায় দোলায় ঢেউ খেলে যায়
ফুলবনের হাসি
তাই নিয়ে মোর বাঁশি
গায় সে শুধু
নেই—হারানোর গান॥

[অরূপ তার মিতালিয়া বাঁশিতে ফুঁ দেবে। মিষ্টি রাগিনী ঝরে পড়বে। মহিলাটি চোখ মেলে তাকাবে। ধীরে ধীরে তার মুখের পরিবর্তন হবে।]

মহিলা। ওরে কেমন করে
ভোলালি আমারে?
কে তুই? কোন্ সুরে
বাজালি তোর বাঁশি
আমার দুঃখ'ত আর নেই
কী যাদু মন্তরে
মনটা ওঠে ভরে!
সব আছে সব আছে
খুঁজে দেখি, আছে সব কাছে—
আমার চোখের মণি
সকলের মাঝে ফুটিয়াছে।

অরূপ। তোমার খোকা নেই
আমিই মাগো
আমিই যদি
তোমার খোকা হই?

মহিলা। বাছা আয়। কাছে আয়
দেখে তোর মুখ
সব দুখ, সব শোক
দূরে চলে যায়
আয় কাছে আয়।

[দুজনেই চলে যাবে। মঞ্চ একেবারে অন্ধকার হয়ে যাবে একদল পুরুষ নারী বোঝা নিয়ে টলতে টলতে ঢুকবে। সবার মুখ থেকে করুন আর্তনাদ ধ্বনিত হবে। একটা করুণ অথচ উচ্চগ্রামের মিউজিক চলবে]

সকলে। অ—না—বৃ—ষ্টি
অ—না—বৃ—ষ্টি
সব গেল পুড়ে
আগুন আকাশ জুড়ে
ছারখার অ—না—বৃ—ষ্টি
অ—না—বৃষ্টি
অ—না—বৃ—ষ্টি…
ফসল গেল
গরু গেল
পুকুর হল মাঠ
মাঠ ফেটে হল চৌচির
জল নেই, জল নেই
ছাতি ফাটে পৃথিবীর।

[অরূপ ছুটে আসবে]

অরূপ। কি হয়েছে তোমাদের ?

১ম লোক। যাও বিরক্ত করো না।

২য় লোক। কথা আসছেনা গলায়
শুকনো কাঠ
চৌচির মাঠ
কাঠ ফাটা রোদে পুড়ে ছাই
মারা যাই। মারা যাই।

সকলে। অ—না—বৃ—ষ্টি
অ—না—বৃ—ষ্টি
গেল সব
গেল ধান যায় প্রাণ
অনা—বৃষ্টি…অনা—বৃষ্টি

অরূপ। ওগো। দাঁড়াও তোমরা শোনো
দুঃখ এসেছে আসুক
আমরা কাঁদবো কেনো ?
আবার বৃষ্টি হবে
ধানে মাঠ ভরে যাবে
তারি শুধু দিন গোনো
আম্‌রা কাঁদবো কেনো ?
ক্ষণেকের তরে শুধু
আমার বাঁশিটি শোনো।

[অরূপের বাঁশি বেজে উঠল। নিস্বাদ সপ্তমে তরঙ্গিত হয়ে মূর্চ্ছনার পর মূর্চ্ছনা। সবাই একদৃষ্টে চেয়ে, সবার দুঃখ যেন কোথায় মিলিয়ে গেল। মুখে ফুটে ওঠে আশা উদ্দীপনা।]

সকলে। না, কাঁদব না আর কাঁদব না
সইব কষ্ট
তবু মরব না।
আছে মাঠ যাক ফেটে
দুর্দ্দিন যাবে কেটে
মাটির গহনে আর
মেঘে আছে জল
আবার মাটিতে মোরা
ফলাবো ফসল।

১ম। চল যাই ঘরে ফিরে
আনব জলের ধারা
মাটির গহন চিরে।

২য়। (হঠাৎ ফিরে) কে এই ছেলেটি ?

৩য়। চেন না? কেয়াডাঙ্গার সেই ছেলেটি
এর নাম অপরূপ।
২য়। বাঁশিতে আছে যাদু তার।
১ম। বলেছিন ঠিক কথাটি আমার।
৩য়। দুঃখ মোদের ভুলিয়ে দিল
দেখলি না?
২য়। আশার সুরে দুলিয়ে দিল
বুঝলি না?
১ম। নিশ্চয়ই যাদু জানে।
২য়। যাদুকরকে ত দেব পুরস্কার। তাই না?
৩য়। আমাদের আছে কি যে দেব তাকে?
১ম। যাদুকরকে দেব পদক।
২য়। কোথায় পাব দেবার মত পদক?

[এমন সময় গ্রামের মোড়ল কি যেন নিয়ে। মিউজিকের তালে তালে পা ফেলছে আর গান গাইছে।]

মো। খাঁটি সোনা খাঁটি সোনা
খাঁটি সোনার পদক
ছকু স্যাকরার হাতে গড়া
খাঁটি সোনার পদক।
১ম লোক। হ্যাঁগো, কাকে দেবে পদক?
মো। দেশজোড়া যার নাম
যাদুকর সেই বিক্রম
ভেলকির সম্রাট
সেই যাদুকর বিক্রম।
তারই বুকে শোভা পাবে

এই আমাদের পদক
সোনায় গড়া বাহার করা
অনেক দামী পদক।

২য় লোক। তাকেই দেবে পদক ?

মো। হ্যাঁ, তাকে ছাড়া আর কাকে ?
কাহার এত নাম ?
বিক্রম বাহাদুর
জানো না তার নাম ?
যাদুকর আর তাহার চেলা
চক্ষু ধাঁধায় অবাক করে
এক আশ্চর্য খেলা !
এটা তারই পুরস্কার
(পদক) তারই পুরস্কার।

১ম লোক। আমরা ত জানি একটা শুধু নাম।

২য় লোক। জানি যাদুকরের নাম।

মোড়ল। কে সে ? আর কে আছে যাদুকর ?

২য় লোক। কেন ? ঐ আমাদের অরূপ
কেয়াডাঙ্গার অরূপ
তাকেই মানাবে ঐ পদক।

১ম। তার বাঁশিতে আছে যাদু
যা ভুলিয়ে দিল আমাদের কান্না। তাই না ?

২য়। হ্যাঁ হ্যাঁ। সেই ত বড় যাদুকর।

মো। কে ? সেই একটি ছেলে ?
কি যেন তার নাম ?

১ম। হ্যাগো। সেই, সেই যে অরূপ।

মো। সেই কি একদিন

বাজিয়েছিল বাঁশি
আমার দুঃখ যত
ভুলিয়ে দিল আসি।

মোড়ল। তারপর আমার হারানো জিনিস পেলাম ফিরে॥

২য় লোক। তার মিতালি বাঁশির মিঠে সুর
মনে জাগায় আশা
প্রাণ ভরে যায় আনন্দে।
তাকেই দাও ঐ পদক।

১ম। আমরা তাকে পারিনি কিছু দিতে
যাদুকরের প্রাপ্য পদক
তাকেই হবে দিতে।

মো। কিন্তু……এটা যে বিক্রমের জন্যে—

১ম। তাকে না হয় দিও
আরেকখানা বানিয়ে নিও।

মো। তবে তাই হোক।
ঐ ত, আসছে না সে—

[অরূপের প্রবেশ]

অরূপ। তোমরা সুনন্দকে দেখেছ?

১ম লো। কে সুনন্দ?

অরূপ। ঐ যে গো, নওপাড়ার সুনন্দ
যে ভাল গান গায়
আর ভাল নৌকো চালায়
সে হয়েছে বাড়ি থেকে উধাও।

২য় লো। তার জন্যে তোমার মাথাব্যথা কেন?

অরূপ। সে কি?

সুনন্দর মা যে খাওয়া ছেড়েছে
ছেলেকে না পেলে সে বাঁচবে না
তাই ত আমায় দিতে হবে খুঁজে।
তার মন ভোলানো বাঁশি বাজালেই
সে ছুটে আসবে—দেখবে ?

[অরূপ বাঁশি বাজাবে]

[একটু পরে সুনন্দ ছুটে আসবে]

সুনন্দ। তোমার বাঁশি শুনেছি
বনের ওপার থেকে
তাই ত এসেছি ছুটে।

অরূপ। আমিও এসেছি ছুটে তোমারি খোঁজে।
যাও শিগ্‌গির যাও মার কাছে—

[সুনন্দ চলে যাবে]

১ম লোক। অরূপ, তোমার যাদুর দাম ত দিতে পারব না,
তাই এই সোনার পদকটা
তোমার বুকে আটকে দেব।

অরূপ। কেন গো ?
আমি ত এ চাই না।
কে বললে আমি যাদুকর ?

২য়। তুমি যে দুঃখ ভোলাও
হাসি ফোটাও
সেকি মোরা ভুলতে পারি ?
তোমার বাঁশির সুরে
আনন্দ দাও
আশা জাগাও

সেকি মোরা ভুলতে পারি ?

মোড়ল। এটা আমাদের উপহার
তোমাকেই আমরা বলি
শ্রেষ্ঠ যাদুকর।
তোমাকে নিতেই হবে এটা।
এমন আপনজন কে আছে তোমার তুল্য।

[অরূপের জামায় পদক পরিয়ে দিল]

১ম লোক। তোমার বুকে শোভা পেয়ে
এই পদকের বেড়ে গেল কত মূল্য।

অরূপ। কিন্তু

২য়। না। আর কিন্তু নয়।
আমরা সবাই জানি
সবাই মানি
তুমি যে শ্রেষ্ঠ যাদুকর।
পাড়ায় পাড়ায় কাছে দূরে
বেড়াও তুমি ঘুরে ঘুরে।
দুঃখ ভোলাও
আনন্দ দাও
তুমি যে শ্রেষ্ঠ যাদুকর।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যাবে]

দ্বিতীয় দৃশ্য

[যাদুকর বিক্রমের ঘর, ম্যাজিকের নানা উপাদান এদিকে ওদিকে। কিছু ঝোলানো। কিছু টেবিলের ওপর। বিক্রমের দুই সহকারী আব্রা ও কাব্রা। এদের বিচিত্র পোষাক। একজনের লাল, একজনের কালো। দুজনেরই গায়ের ওপর দিয়ে সাদা একটা ব্যাণ্ড, ছ'ইঞ্চির মত চওড়া বুক আর পেটের কাছে পেঁচিয়ে গেছে।]

আব্রা। কিরে কাব্রা ঝিমুচ্ছিস কেন ?

কাব্রা। ঝিমুব না ? খাট্‌নিটা ভাবতো! ঐ সব পেল্লায় পেল্লায় সরঞ্জাম ঘাড়ে করে নিয়ে যাওয়া —আসা—

আব্রা। আরে, তোর চেয়ে আমার খাটুনি বেশী, বুঝলি। ঐ একটা বাক্স তুলতে তুমি, চাঁদ, হিমসিম খেয়ে যেতে—

কাব্রা। আরে থাম্ থাম্! ভাব দেখি, আমায় যখন করাত দিয়ে চেলা করে, মনে হয় (কেঁদে কেঁদে) বুঝি সত্যিই দু'ফাক হয়ে গেলুম! আর যখন বাক্সোয় ভর্তি করে—

আব্রা। তার ওপর আবার প্রভুর দাঁতখিচুনি আছে। একটু গরমিল হয়েছে কি অমনি দাঁতখিচুনি।

কাব্রা। আর ভাল লাগে না, যাই বলিস। আমরা নিজেরাই ত পারি এইরকম দল খুলতে।

আব্রা। যা বলেছিস্। আমরা এখন খেলা দেখাবো, আইবাস্ লোকের চোখ কপালে উঠে যাবে—

[এমন সময় যাদুসূর্য বিক্রম বাহাদুরের প্রবেশ। পোষাক এক দিকটা কালো। আর একদিক লাল। মাথায় বিচিত্র পাগড়ি হাতে ছোট ছড়ি।]

বিক্রম। ওয়ান টু থ্রি,
ফতেপুর সিক্রী
এক দো তিন
আব্রা কাব্রা দালাদিন
হিশি পিশি নারি মুজি টং
অড়র বড়র তাশা পাশা কিং কং
কইরে—এ—এ—এ—এ (চীৎকার)

কইরে আমার আব্রা কই ?

আব্রা। এই যে হুজুর !

বিক্রম। কই আমার কাব্রা কই ?

কাব্রা। এই যে হুজুর।

বিক্রম। এখনও ত এল না !

আব্রা। কে হুজুর ?

বিক্রম। আরে সেই যে—মোড়ল। মোড়ল আমাকে দেবে বলেছিল—

কাব্রা। কি দেবে হুজুর ?

বিক্রম। সোনার মেডেল। পদক, পদক।
আমাকে দেবে পদক,
বুঝলি না, উজবক !

আব্রা। ও, তাই বলুন। সেই পদক কিন্তু আর পাবেনি হুজুর।

বিক্রম। (খুব চটে গিয়ে) অ্যাঁ !! পাবোনি ? মানে ?

কাব্রা। তারা পদক দিয়েছে অরূপকে।

বিক্রম। অরূপ ? সে আবার কে ?

আব্রা। সে ? সে এক ফুঁচকে ছোঁড়া
খেলা দেখায় থোড়া থোড়া।

বিক্রম। খেলা দেখায় সে ?
তার নাম জানি না, ধাম জানি না,
কেউ শোনেনি
সে আবার যাদুর জানে কি ?
কি তার খেলা কেউ দেখেনি।
(তার) হস্ত সাফাই কসরতটাই

কেউ দেখেনি
সে আবার যাছুর জানে কি ?

কাত্রা। সে হুজুর, কেবল বাঁশি বাজায়
আর ঘোরে পাড়ায় পাড়ায়।

বিক্রম। আরে ছোঃ! নেহাৎ অপোগণ্ড
পাবে কোথায় এই যাছুদণ্ড ?

আত্রা। হুজুর, সে যায় গরীবদের বস্তিতে।

বিক্রম। আরে ছো:!
ইকস্তি বিয়স্তি পয়োস্থি
গা-ঘিন ঘিন-বস্তি! ছি ছি ছি—
সবাই জানে আমার মজার খেল্ কি
দেখাই হাজার চমক দেওয়া ভেল্‌কি।

আত্রা! আপনার সঙ্গে হুজুর তার তুলনা ?

কাত্রা। হয় না। হয় না। হয় না।

বিক্রম। আমায় চেনে পিরথীবির লোক
সবাই 'থ' বড় বড় চোখ
বুড়ো বুড়ী জোয়ান বাচ্চা লোক।
আমার নাম যাছু মহারাজ বাহাছুর
আমাকে কি দিতে হবে চিনিয়ে ?
নানা দেশ থেকে—
পদক এনেছি ছিনিয়ে।
আমার খেলার সরঞ্জাম
টানে সাতটা ঘোড়া
সেই আমার প্রাপ্য পদক ?
নিল ফুঁচকে ছোঁড়া
ডাকো দেখি সব্বাইকে

দেখাক সে কেরামত
আমার সমুখে দেখাক খেলা
তবে বুঝি তার হিম্মত।
ডাকো লোক ডা ডা ডা ডাম্
সব্বাই দেখে যাক ধাঁ কেটে ধাম্
ডা ডাম্ ডা ডাম্।

[মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যাবে]

[সহকারীরা ঢোল বাজাবে। সবলোক জড়ো হবে। আসবে অরূপও হাতে তার ছোট্ট সেই বাঁশি। বুকে তার ঝুলছে সেই সোনার পদক]

বিক্রম। (তাস হাতে নিয়ে খেলা দেখাবে)
ইরি চুরি তিরি চৌকো
এব্রা জেব্রা পানসি নৌকো।
ভেল্‌কি বাজি ফট্।
লাগল ভেল মজার খেল
কোথায় যাবি কারে নিবি
(এই) এসে গেল হরতনের বিবি।

সকলে। (হাততালি) সাবাশ্! সাবাশ্!

বিক্রম। আবার দেখো—
এইটা সাদা রুমাল (হাত তুলবে)
পাখা মেলে
উড়তে গিয়ে হয়ে গেল —
এক দো তিন—লাল !!
এইটা আবার এ হাতেতে
রং ফেরাবে
লাল এবার হলুদ হবে। (রুমাল হলুদ হল)

সকলে। (হাততালি) সাবাশ্! সাবাশ্!

বিক্রম। এইবার দেখুন আমার বড়খেলা।
এই বাক্শোর মধ্যে বন্দী
করলুম 'আব্রাকে'। আষ্টেপিষ্টে
দিলুম তালা। তালা না খুললে,
ওর মুক্তি নেই। কিন্তু স্বচক্ষেই
দেখুন—
ওয়ান-টু-থ্রি—আব্রা হাজির!

[পাশের উইংস থেকে আব্রা এসে দাঁড়াল। বাক্স খুলে দেখাল ফাঁকা

সকলে। (হাততালি) সাবাশ্! সাবাশ্!! সাবাশ্!!!

বিক্রম। এইবার তোমাদের
ক্ষুদে যাদুকর কি দেখাবে দেখাক—
যা আছে খেলা তার
আমার চেয়ে যদি হয় ভাল
পাবে সে পুরস্কার।

[অরূপ তার বাঁশি মুখে ঠেকাল। পি করে একটু আওয়াজ করেই বাঁশি আর বাজল না।]

অরূপ। আমার বাঁশি এখনত
বাজবে না, এখন যে
সবার মনে খুশির জোয়ার বইছে।

বিক্রম। হা-হা-হা-হা
এই ত তোমাদের যাদুকর?
তার নেই ঢাল
নেই তরোয়াল

নেই কোনো সরঞ্জাম
তাতেই নাম ?
হাহা—হাহা
একটু খানি বাঁশি
তাও বাজল না।
কত হাসব ? হা হা হা
এখন তোমরাই বল
কে বড় যাদুকর ?
ঐ পদক যা তোমরা দিয়েছ ওকে
সেটা ঝুলবে কার বুকে ?
তোমরাই বল এটা
আমার প্রাপ্য কিনা।

[বিক্রম অরূপের পদক খুলে নিয়ে নিজের বুকে আটকে দিল]

এটা আমার পুরস্কার
জয়ধ্বনি হবে কার ?
আমার···আমার ··আমার ! !

সবাই বলে। জয় বিক্রম যাদুকরের জয় !!
জয় বিক্রম যাদুকরের জয় !!

তৃতীয় দৃশ্য

[গ্রামের পথের দৃশ্য। অরূপ প্রবেশ করবে। তার সঙ্গে তার অনুগামী দুটি ছেলে]

১ম সঙ্গী। অরূপ ভাই, যাদুকর বিক্রম
নিল তোমার পদক কেড়ে ?

অরূপ। নিয়েছে নিক না।

২য় সঙ্গী। ঈশ্! সে নাকি সবচেয়ে বড় যাদুকর।

অরূপ। সেই ত যাদুকর।
আমি ত যাদুকর নই।
হতেও চাই না।
গাঁয়ের মানুষ
কত দুঃখের সাথে বোঝে
তাদের কান্না
কেউ না শোনে কেউ না বোঝে।
আমি যাই তার কাছে
তুলে নিতে তারে বুকে
মিতালিয়া বাঁশি
ফোটায় যে হাসি মুখে।

১ম সঙ্গী। কিন্তু গাঁয়ের লোক
তোমাকেই ত দিয়েছিল পদক।

২য় সঙ্গী। জানো অরূপ, বিক্রম যাদুকর
অনেক খেলা দেখিয়ে,
অনেক টাকা নিয়ে
কাল রাত্রে চলে গেছে এখান থেকে।

অরূপ। তাই নাকি? কোথায় গেল?

২য় সঙ্গী। আবার অন্য গাঁয়ে বসবে মেলা
সেখানে সে দেখাবে খেলা।

অরূপ। ঐ কিসের শব্দ যেন কানে আসছে—

[নেপথ্যে একটা ভীষণ অট্টরব ঘোড়ার ডাক চাকার শব্দ আর ভয়ার্ত চীৎকার শোনা যাবে। এক দল গ্রাম্য মেয়ে ভীত সন্ত্রস্ত হয়ে ছুটে আসবে]

মেয়েরা। পালাও, পালাও তোমরা, পালাও!

অরূপ। কেন? কি হয়েছে? তোমরা এত ভয় পেয়েছ কেন?

১ম মেয়ে। ভয় পাবো না? বলছ কি? শুনলে না ঐ শব্দ?

১ম সঙ্গী। হ্যাঁ, তাত শুনেছি, কিসের শব্দ ওটা?

২য় মেয়ে। ডাকাত! ডাকাত!

১ম মেয়ে। এখানেও এসে পড়তে পারে।

অরূপ। কি করল তারা?

১ম মেয়ে। লুঠ, লুঠ, লুঠ করল। পথিকের সর্বস্ব লুঠ করল। আর আমাদেরও—

২য় মেয়ে। যা কিছু ছিল কেড়ে নিল।

অরূপ। তোমরা রাস্তায় বেরিয়েছিলে কেন?

১ম মেয়ে। আমরা ত যাচ্ছিলাম হাটে। পয়সা কড়ি নিয়ে। মালপত্তর কিনতে হবে না?

২য় মেয়ে। একদল যাত্রীর সর্বস্ব লুঠ করল। আর আমাদেরও যাছিল কেড়ে নিল। তাইত প্রাণ ভয়ে পালিয়ে এসেছি—

অরূপ। এখানে কোনো ভয় নেই। তোমরা চল আমাদের সঙ্গে—

১ম মেয়ে। ওমা সেকি? তোমরা কি করবে? তোমরা পারবে না তাদের সঙ্গে—এই, চল, আমরা পালিয়ে যাই এখান থেকে—

অন্য মেয়েরা। চল। তাই ভাল—

[ওরা চলে যাবে। অন্যদিকে অরূপও ওর সঙ্গীরা যাবে]

[চকিতের মধ্যে মঞ্চ অন্ধকার হয়ে যাবে]

এখানে বনের দৃশ্য। দূর থেকে যেন কাতরানি শোনা যাবে। একটা ঝোপের আড়ালে মনে হভে হবে কে যেন পড়ে আছে।]

পড়ে থাকা লোকটি। (কাতর কণ্ঠে) উহ! কী—কি নিষ্ঠুর ওরা!

মারল আমায় ক্ষত বিক্ষত করল—আঁ-আঁ·····

[অরূপ ও তার সঙ্গীদের প্রবেশ]

১ম সঙ্গী। দেখো দেখো। ঐখানে
কে যেন আছে পড়ে
কানে আসছে তার কান্না—

২য় সঙ্গী। (কাছে গিয়ে)
হ্যাঁ সত্যিই তাই
যেন শাল গাছ
উপড়ে পড়েছে ঝড়ে।

১ম সঙ্গী। ওর কান্নার সুরে
থেমেছে বাতাস
বন মর্মরে
ধ্বনিছে দীর্ঘশ্বাস।

অরূপ। (কাছে এগিয়ে গিয়ে)
আ-হা-হা! কে তুমি?
কি হয়েছে তোমার?

[আবার লোকটির গোঙানির শব্দ। মাথাটা গুজে আছে এমনভাবে যে চেনা যাচ্ছে না]

লোকটি। আঁ—আঁ
আমার সব গেছে—

অরূপ। কি গেছে তোমার?

লোকটি। উহ্! কী যন্ত্রণা!

অরূপ। (গায়ে হাত বুলিয়ে)
কোথায় যন্ত্রণা? ওঠো,
দেখত বনের ছবি

সবুজে সবুজে ভরা—

লোকটি। থামো! আমি মরছি যন্ত্রণায়
এখন বনের ছবি!

অরূপ। ওঠো। আমরা তোমায় ধরে
নিয়ে যাচ্ছি—জল দিচ্ছি—
কি হয়েছে, কই বললে না ত?

[ওরা হাত ধরবে। লোকটি আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়াবে। এবার তার মুখ দেখা যাবে। এ সেই বিক্রম যাদুকর]

অরূপ। কে? তুমি বিক্রম যাদুকর?

বিক্রম। (ঘৃণায় বিকৃত মুখ) আর তুমি সেই ক্ষুদে ওস্তাদ!

অরূপ। হ্যাঁ গো। তোমার দুঃখ দেখেত এসেছি।

বিক্রম। দেখে উপহাস করতে এসেছ।
তোমরা যাও। যেখানে যাচ্ছ যাও
আমাকে একটু কাঁদতে দাও!
ওঃ! শয়তানরা কি করল আমার
হায় হায় হায়!

[আবার কেঁদে ফেলবে]

অরূপ। কই বললে না ত কথা
এমন হয়েছে কেনো
তবে, আমার বাঁশিটি শোনো!

[এবার বাজাবে তার বাঁশি। সপ্তম নিখাদ সুর থেকে পঞ্চমে—তারপর আশ্চর্য রাগিনী বেজে উঠবে তার বাঁশিতে। ছেলে দুটি সেই তালে নাচতে থাকবে। বিক্রম একদৃষ্টে তাকিয়ে থাকবে অরূপের দিকে…তারপর তার চোখ যাবে এদিকে ওদিকে। মুখের ভাব বদলে যাবে। সে মুখ তুলে একটু হাসবে। মনে হবে যেন তার আর কোনো দুঃখ নেই।

বিক্রম। একি ? আমার দুঃখ
তুমি ভুলিয়ে দিলে
একি তোমার বাঁশি ?
অরূপ। ওগো, আমি যে
দুঃখ ভোলাই
ফুটিয়ে তুলি
সবার মুখে হাসি।
১ম সঙ্গী। এবার বলো হয়েছে কি ?
২য় সঙ্গী। তুমি যে মস্ত যাদুকর
এমন দশা কেন তোমার ?
বিক্রম। একটু আগে যে আমি
ব্যথায় নুয়ে পড়েছিলুম
সে আমি কই ?
আমার সর্বস্ব হারানো
সে আমি কই ?
শোনো, এখন তোমাদের বলতে বাধা নেই।
আমার সাতটা গাড়ি বোঝাই
সাজ সরঞ্জাম
আর যাদুর সজ্জা
১ম সঙ্গী। হ্যাঁ, তোমার ত সব ছিল।
বিক্রম। আর বাক্সো ভর্তি অ—নে—ক টাকা
২য় সঙ্গী। কি হলো সব ?
বিক্রম। ডাকাতে লুঠ করল সব—
এই বনের মধ্যে—
অরূপ। কিন্তু তোমার ত ছিল
সহকারী লোকজন—

বিক্রম। হ্যাঁ। সবাই ছিল—কিন্তু
তারাও ছিল ষড়যন্ত্রে
ঐ ডাকাতের সঙ্গে যোগ দিল তারা!
তারা যে বিশ্বাসঘাতক
তা কি জানতুম আমি?
এই নির্জন জঙ্গলে
সব নিয়ে গেল তারা
আর আমাকে করল আধমরা
ফেলে গেল এই, কাঁটা ঝোপে—

অরূপ। আহা! ছিল সব উড়ে গেল। এও যেন যাদু?

বিক্রম। কিন্তু, এখন আমার
দুঃখ নেই ত আর।
তোমার বাঁশি যেন
ভুলিয়ে দিল সব।
মন আমার আশায় ভরা
আবার খেলা দেখাব আমি—

অরূপ। তাই ত চাই।

বিক্রম। কিন্তু, ক্ষুদে যাদুকর
তুমি যে যাদুতে
আমার দুঃখ ভোলালে
সে যাদুতো আমি জানি না।
হ্যাঁ—এখন বুঝছি
তুমি সত্যিই বড় যাদুকর
আমার চেয়েও বড়—

[জড়িয়ে ধরে অরূপকে]

অরূপ। (হাসতে হাসতে)
না না। আমি যাদুকরই নই।
লোকে বলে
ভুল করে বলে তারা।

বিক্রম। কিন্তু আমি যে আরো ভুল করেছি
মূল্য দিইনি তোমার।
তোমার পদক নিয়েছি কেড়ে
ছি ছি—কী অন্যায়, কী অন্যায়!

অরূপ। তাতে কি?
পদক ত তোমারই প্রাপ্য।

বিক্রম। না। এ তোমারই প্রাপ্য।
আজ আমার কিছু নেই
শুধু আছে এই পদকগুলো
এগুলো তোমাকেই দেব
তোমার বুকে পাবে শোভা—
[অরূপের বুকে পরিয়ে দিল]
এবার বন্ধু। একটা কথা
জিগ্যেস করব, বলবে কি?

অরূপ। কি বল?

বিক্রম। যাদুকর তার কৌশল
গোপন রাখে—
আমার হাতের কৌশলে
লোককে তাক লাগিয়ে দিই
তারা হয়ে যায় অবাক।
কিন্তু দুঃখ ভোলাতে ত পারি না;
পারি না চোখের জল মুছাতে।

বলবে কি, এতো নয় ছল তোমার
নয় কোনো কৌশল।
কিন্তু কিসের যাদু দিয়ে
তৈরী তোমার বাঁশি ?
যা কান্না ভোলায়
ফুটিয়ে তোলে হাসি ?

অরূপ। না গো না,
এ যাদুই নয়।
এ, বাঁশির একটা গুণ।

বিক্রম। যাদুকরের কাছে গোপন
করতে নেই ভাই,
তোমায় বলতেই হবে
বাঁশিতে তোমার কিসের যাদু ?
কিসের গুণ ?

অরূপ। বললুম ত।
এ যাদুই নয়।
এ অতি সহজ জিনিস
এ যে ভালবাসা
আমার প্রাণের ভালবাসা
বাঁশির মাঝে সুর হয়ে সে
পায় খুঁজে তার ভাষা।

বিক্রম। বুঝেছি।
আমি শিখব তোমার যাদু।
শেখাবে আমায় ?

[অরূপ]বাঁশিতে ফু দেবে। ছেলেরা গান ধরবে]

।। গান ।।

পাড়ায় পাড়ায় ঘুরি আমি
সবার কাছে যাই
গাঁয়ের মানুষ দুঃখী গরীব
সবাই আমার ভাই।

[দর্শকদের দিকে ফিরে]

কে নেবে গো আমার বাঁশি
নতুন স্বপন আশা
মিতালিয়া বাঁশি আমার—
তুমি চাও কি ভালবাসা ?

[গান শেষ হতে হতে পর্দা পড়ে যাবে]



স্বপনবুড়ো

বৈশাখী পূর্ণিমা

[হিমালয়ের পাদদেশে কপিলাবস্তু রাজ্যের রাজা শুদ্ধোদনের প্রধানা রাণী মায়ার শয়নকক্ষ। কক্ষটি অতি নিপুণভাবে সজ্জিত। জানালার ধারে ধূপের ধোঁয়া উঠে গৃহটিকে আমোদিত করেছে। নানা ফুলে কক্ষটি সুন্দরভাবে শোভা পাচ্ছে। মহারাণী মায়া বিমর্ষ মুখে পালঙ্কের ওপর বসে আছেন। দূরে মৃদু বাদ্যধ্বনি শোনা যাচ্ছে। মহারাণীর প্রধানা সখী মল্লিকার প্রবেশ]

মল্লিকা । এ কি মহারাণী! তুমি সবাইকে ফাঁকি দিয়ে পালিয়ে এসে নিজের কক্ষে বসে আছ! মহারাজ যে উদ্যানে তোমায় খুঁজছেন!

মায়া । না মল্লিকা, আজ আমার মন ভালো নেই।

মল্লিকা । মন ভালো নেই বলেই ত' মহারাজ শুদ্ধোদন আজ উদ্যানে ঝুলনা বাঁধতে বলেছেন। তোমায় নিয়ে তিনি দুলবেন—এই তাঁর মনের ইচ্ছে। সেই জন্যেই ত' আমাকে পাঠিয়ে দিলেন।

মায়া । দেখ্, মল্লিকা, তুই মহারাজকে গিয়ে বল যে, তাঁর ত' রাণীর অভাব নেই। তাঁদের নিয়ে তিনি নীপ-শাখে ঝুলনা বেঁধে দুলুন। আজ যেন তিনি আমায় ক্ষমা করেন।

[সহসা মহারাজ শুদ্ধোদনের প্রবেশ। মল্লিকা চলে গেল।]

শুদ্ধোদন। মহারাণী মায়া, তোমার মন খারাপ বলেই ত' এই ঝুলনার আয়োজন। তুমি এসে অন্ধকার কক্ষে লুকিয়ে থাকলে চলবে কেন?

মায়া। তবে শুনবে মহারাজ, কেন আমি এসে এই আঁধার ঘরে মুখ লুকিয়েছি?

শুদ্ধোদন। কেন মহারাণী মায়া? কিসের তোমার দুঃখ?

মায়া। তবে শোনো মহারাজ! অতি প্রত্যূষে আমার ঘুম ভেঙেছিল; কপাট খুলে বাইরে বেরুতেই রাজপুরীর দাসী আমায় দেখে মুখ ফিরিয়ে নিলে। আপন মনে বল্লে, আজ সক্কালবেলা আঁটকুড়ী রাণীর মুখ দেখলাম ...কপালে বোধ হয় আজ কিছুই জুটবে না!

শুদ্ধোদন। বল কি মহারাণী? দাসীর এত সাহস!

মায়া। শোনো মহারাজ! প্রথমে আমার চোখ দিয়ে বেরুলো আগুন। তারপর সেই আগুন গেল নিভে। দু'চোখ আমার জলে ভরে এল। তাই ত! দাসীর কি দোষ! আজও আমার কোলে কপিলাবস্তু রাজপুরীর রাজপুত্রকে খুঁজে পেলাম না। এই কি আমার কপালের লিখন!

শুদ্ধোদন। তুমি দুঃখ করো না মহারাণী মায়া। আমি এক্ষুনি রাজসভায় গিয়ে ওই দুর্বিনীতা দাসীর প্রাণদণ্ডে স্বাক্ষর করছি।

মায়া। (রাজার হাত ধরে) না মহারাজ! ওর কি দোষ! মূর্খ দাসী লোকের মুখে যা শোনে—তাই বলে। ওকে তুমি ক্ষমা করো মহারাজ!

শুদ্ধোদন। বেশ! তোমার অনুরোধে ক্ষমা ওকে করলাম, কিন্তু

রাজপুরীতে ওই দাসীর স্থান আর হবে না…(ক্ষণিক স্তব্ধতার পর রাজা ডাকলেন) মল্লিকা…

(মল্লিকা প্রবেশ করল)

শুদ্ধোদন। মল্লিকা, আমি গুরুতর রাজকার্যে বাইরে যাচ্ছি, তোমরা মহারাণী মায়ার চিত্ত-বিনোদনের ব্যবস্থা করো।

[শুদ্ধোদনের প্রস্থান]

[নেপথ্যের গীত-বাদ্য-ধ্বনি দ্রুত ও উচ্চতর হয়ে উঠল। সজ্জিতা নর্তকীদল এসে মায়ার কক্ষে প্রবেশ করে নৃত্য-গীত সুরু করে দিল।]

নৃত্যগীত

তুমি যবে ঘুম ঘোরে আমি যে পাশে—
বাতায়নে বাঁকা চাঁদ একেলা হাসে!
যে কথা বলিতে চাই না মিলে ভাষা—
ফুলকলি জানে মোর বুকেরি আশা!
মনের মুকুরে মোর সে মুখ ভাসে!
জানে মোর মন-কথা বন-হরিণী—
সে কথা কহিব বলে আজো মরি নি!
মেঘের নয়ন চাহি নাচে যে কেকা—
তোমা পানে চেয়ে মোর নাচন শেখা!
আজি কানে কানে সেই কথা এ মধু-মাসে!

[সঙ্গীতের তালে ও নৃত্যের ছন্দে মহারাণী মায়া ধীরে ধীরে পালঙ্কের ওপর ঘুমিয়ে পড়লেন।]

মল্লিকা। চুপ! আর গান নয়, আর নাচ নয়। ওঁর চোখে ঘুম নেমে এসেছে…! মহারাণী এখন ঘুমোবেন। তোরা পা টিপে টিপে এই ঘর ছেড়ে চলে আয় আমার সঙ্গে—

(ধীরে ধীরে নর্তকীদল বেরিয়ে গেল। স্নিগ্ধ নীল আলোতে ঘরখানি ভরে উঠল! দূরে মৃদু বাদ্যধ্বনি আগের মতো শোনা যেতে লাগল। হঠাৎ দেখা গেল মহারাণী মায়া একেবারে অন্ধকারে ডুবে গেছেন। পেছনকার পর্দা উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে। সেই পর্দায় একখানি বিশাল হাতের ছায় পড়ল।)

মায়া । (ঘুমের ঘোরে কে? কে আপনি? কার বিশাল হস্ত আমার সম্মুখে উজ্জ্বল হয়ে উঠল?

মহাকাল । (গভীর কণ্ঠে আমি কে জিজ্ঞেস করছ মহারাণী মায়া? আমি মহাকাল! আমার অঙ্গুলি হেলনে—কত জীবন জেগে ওঠে, আবার অসীম কালের গর্ভে কত জীবন মুহূর্তে বলীন হয়ে পড়ে···বুদ্বুদের মতো—

মায়া । আপনাকে দেখে আমার ভয় করছে! কিসের ইঙ্গিত নিয়ে আপনি আমার চোখের সামনে উজ্জ্বল হয়ে উঠেছেন? প্রভু, সে কি শুভ না অশুভ?

মহাকাল । পৃথিবীর এক পরম শুভ-বারতা নিয়েই আমি তোমার কাছে উপস্থিত হয়েছি মহারাণী মায়া!

মায়া । কি সে শুভ-বারতা? আমায় বলুন মহাকাল! যে বেদনায় আমার অন্তর অনুক্ষণ জ্বলে পুড়ে অঙ্গার হয়ে যাচ্ছে··আপনার বাণী কি তাতে শান্তি-বারি সিঞ্চন করতে পারবে?

মহাকাল । পারবে কিনা সে কথা আমি নিজ মুখে কিছু বলব না। তুমি ওই উজ্জ্বল পর্দার দিকে দৃষ্টিপাত করো··· মহারাণী, কি দেখছ আমায় বলো।

মায়া । (ঘুমের ঘোরে) এ কি! এক শ্বেতহস্তী আমার দিকে এগিয়ে আসছে। হস্তীটি শুঁড়ে ধরে আছে এক সুন্দর প্রস্ফুটিত শ্বেতপদ্ম।

মহাকাল। তুমি দেখতে পেয়েছ মহারাণী! আজ আমি ধন্য। আজ আমি কৃতার্থ। মহাকাল এরই জন্যে লক্ষ বৎসর নীরবে তপস্যা করেছে ··! আর তুমি কি দেখছ মহারাণী?

মায়া। ওই শ্বেতহস্তী শ্বেতপদ্মসহ আমার দেহের মধ্যে মিশে গেল। এক স্নিগ্ধ জ্যোতিতে ভরে গেল আমার দেহ আর মন! এ আমি কি দেখলাম মহাকাল?

মহাকাল। তুমি ঠিকই দেখেছ মহারাণী! তোমার বুকে, তোমার কোলে আসছেন এক মহান্ আত্মা, যিনি মানবের মুক্তির জন্য তপস্যা করে "বুদ্ধত্ব" লাভ করবেন। পৃথিবীকে দান করবে তুমি শ্রেষ্ঠ রত্ন। তোমার চাইতে সৌভাগ্যবতী নারী এ জগতে আর জন্মগ্রহণ করেনি! কিন্তু মহারাণী—

মায়া। আপনি বলুন মহাকাল, আপনি কুণ্ঠিত হচ্ছেন কেন? জগতের সৌভাগ্যবতী নারীর ভাগ্যে কি আছে সে কথা আমি আপনার মুখ থেকেই শুনতে চাই।

মহাকাল। তবে শোনো মহারাণী! ফল দান করে গাছ কি আর বেশী দিন ধরণীতে বেঁচে থাকে?

মায়া। বুঝতে পেরেছি মহাকাল, আপনার কথা! আর আমার মনে কোনো দুঃখ নেই। শুধু একটি মাত্র অনুরোধ আছে আপনার কাছে—

মহাকাল। বলো মহারাণী—

মায়া। আমি মরি তাতে দুঃখ নেই। তবু যে মৃত্যুর আগে মহারাজকে কপিলাবস্তুর ভাবী বংশধর—সিংহাসনের উত্তরাধিকারীকে দিয়ে যেতে পারব—তাতেই আমার সান্ত্বনা—

মহাকাল। হাঃ—হাঃ—হাঃ!......

মায়া। এ কি মহাকাল! আপনি হঠাৎ অট্টহাস্য করে উঠলেন কেন? আমার সন্তান কি তবে বাঁচবে না?

মহাকাল। তুমি বলছ কি মহারাণী? দীর্ঘজীবী হবে তোমার সন্তান! তবে—

মায়া। তবে—?

মহাকাল। সিংহাসনে সে বসবে না! মানুষের দুঃখ দূর করবার জন্য সে ভিক্ষাপাত্র হাতে সারা ভারত ঘুরে বেড়াবে ভিখারীর বেশে—

মায়া। (আর্তনাদ করে উঠলেন) রাজার কুমার ভিখারীর বেশে!

মহাকাল। দেখতে চাও মহারাণী তোমার সন্তানের জীবন-নাট্য?

মায়া। চাই! আমি দেখতে চাই!

মহাকাল। বেশ! তবে ওই উজ্জ্বল পর্দার দিকে তাকাও মহারাণী!

[পর্দায় প্রতিফলিত হ'ল তরুণ সিদ্ধার্থ সারথি ছন্দকের সঙ্গে নগরভ্রমণে বেরিয়েছেন এমন সময় এক জরাগ্রস্ত লোকের সঙ্গে সিদ্ধার্থের দেখা। সিদ্ধার্থ ছন্দককে জরা দেখে প্রশ্ন করলেন।]

মায়া। কে ঐ তরুণকুমার মহাকাল? সারথি ছন্দককে সে কি প্রশ্ন করছে?

মহাকাল। মহারাণী মায়া, আগামী বৈশাখী পূর্ণিমায় তোমার যে সন্তান জন্মগ্রহণ করবে—সে ওই তরুণকুমার সিদ্ধার্থ। একদিন জরাগ্রস্ত মানুষ দেখে তার মনে প্রশ্ন জাগ্‌বে —মানুষ কি তা'হলে জরার অধীন?

[পর্দায় চিত্র পরিবর্তিত হ'ল। দেখা গেল ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ দেখে সিদ্ধার্থ আঁৎকে উঠেছেন।]

মায়া । ও কি চিত্র আমি দেখছি মহাকাল ?

মহাকাল। ব্যাধিগ্রস্ত মানুষ দেখে তরুণ সিদ্ধার্থ ভাবছেন—ব্যাধির কবলে পড়ে মানুষ কত অসহায়! তা'হলে মানুষের মুক্তি কোন্ পথে ?

মায়া । ও কি বহন করে নিয়ে যাচ্ছে রাজপথ দিয়ে ?

মহাকাল। মৃত এক ব্যক্তিকে তার আত্মীয়-স্বজনেরা বয়ে নিয়ে যাচ্ছে শ্মশানে। তাই দেখে সিদ্ধার্থের মনে বৈরাগ্য এসেছে। তরুণ সিদ্ধার্থ ভাবছে, এই জরা, ব্যাধি আর মৃত্যুর হাত থেকে মানুষকে অমৃতের পথে নিয়ে যেতে হবে।

মায়া । পারবে কুমার সেই অমৃতের পথের সন্ধান দিতে ?

মহাকাল। ওই চেয়ে দেখ মহারাণী, সিদ্ধার্থ ছন্দকের হাতে রাজ-আভরণ ছেড়ে দিয়ে গৈরিকবাস পরিধান করে ভিক্ষাপাত্র হাতে পৃথিবীর পথে এগিয়ে চলেছে—

মায়া । (আতঙ্কে) রাজার কুমার, এই দুঃখ-কষ্ট কি সে সহ্য করতে পারবে ?

মহাকাল। ওই চেয়ে দেখ মহারাণী,—নির্জন বৃক্ষতলে সিদ্ধার্থ তপস্যায় বসেছে।

মায়া । কে—কে ওরা আসছে কুমারের ধ্যান ভঙ্গ করতে ?—কেউ বা বিকট-দর্শন, কেউ বা মায়াবিনী—!

মহাকাল। ওরা হচ্ছে—'মার', 'কামনা' আর 'আসক্তি'। ভয় নেই রাজরাণী! তোমার পুত্র ওদের জয় করেছে। চেয়ে দেখ, মার ভয় পেয়ে পলায়ন করছে। স্বর্গে দুন্দুভি বাজছে। সে মধুর বাদ্যধ্বনি তুমি শুনতে পাচ্ছ মহারাণী ?

মায়া । আমি শুনতে পেয়েছি মহাকাল! গর্বে মায়ের বুক ভরে উঠছে।

মহাকাল। ওই দেখ মহারাণী, সিদ্ধার্থ 'বুদ্ধত্ব' লাভের জন্যে আবার কঠোর তপস্যায় বসল—

মায়া । সোনার অঙ্গ কালি হয়ে গেল। খালি ক'খানা হাড়! শুষ্ক ওর দেহ! কি করে কুমার বাঁচবে মহাকাল?

মহাকাল। চেয়ে দেখ পর্দার দিকে মহারাণী! গ্রামের বালিকা সুজাতা আসছে। হাতে তার পরমান্ন। ওই পরমান্ন খেয়ে তোমার সিদ্ধার্থ আবার দেহে-মনে বল পাবে। নতুন উদ্যমে সুরু করবে তার তপস্যা।

[পর্দায় সুজাতার আত্ম-নিবেদনের নৃত্য ফু:ট উঠল]

সুজাতার নৃত্য-গীতি

তোমার আশিস অরুণ-কিরণ-ধারা!
সব মলিনতা নিমেষেই হয় হারা!
পুণ্য-আলোকে অবগাহি মন···
তোমার করুণা যাচে অনুখন।
এ আঁধার মনে ফুটিল কি শুকতারা!
তোমার আশিস অরুণ-কিরণ-ধারা!
তোমার আশিস মায়ের স্নেহের কোল—
আধো-আধো ভাষে শিখালে কত কি বোল!
পঙ্ক ছাড়িয়া জেগেছে কমল—
পাপহীন প্রাণ—আলো ঝলমল্
পুন্য-পরশে ভেঙেছে পাষাণ-কারা!
তোমার আশিস পুণ্য কিরণ-ধারা!

মহাকাল। ওই চেয়ে দেখ মহারাণী মায়া! গাঁয়ের মেয়ে সুজাতার পরমান্ন খেয়ে নতুন জীবন পেল তোমার কুমার। আবার সে বসল তপস্যায়। এইবার মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীর পাতন!

মায়া । ও কিসের ধ্বনি ভেসে আসছে মহাকাল?

মহাকাল। শুনতে পেয়েছ মহারাণী ওই ধ্বনি? শোনো, কান পেতে শোনো—অর্ধপৃথিবী ওই ধ্বনির সঙ্গে কণ্ঠ মিলিয়ে উদাত্ত কণ্ঠে বলবে—

বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি
সঙ্ঘং শরণং গচ্ছামি
ধর্মং শরণং গচ্ছামি— [ধ্বনি উচ্চতর হ'ল]

মায়া । ও কি! পুষ্পবৃষ্টি হচ্ছে! শঙ্খধ্বনি হচ্ছে!

মহাকাল। হ্যাঁ মহারাণী। তোমার পুত্রের শিরে দেবগণ পুষ্পবৃষ্টি করছেন। তাঁর তপস্যা সার্থক হয়েছে। জগতে তার নতুন নাম হ'ল 'বুদ্ধ'…

মায়া । (উন্মাদিনীর মতো) আমি ওকে দেখব,—ওকে বুকে টেনে নেব—ওকে আমি আশীর্বাদ করব—

[সহসা পর্দার উজ্জ্বল আলো মিলিয়ে গেল। মায়ার কক্ষ পুনরায় আলোকিত হয়ে উঠল। মহারাণী মায়ার চীৎকার শুনে মহারাজ শুদ্ধোদন ব্যস্ত ভাবে ঢুকলেন।]

শুদ্ধোদন। মহারাণী! তুমি ঘুমের ঘোরে চীৎকার করছিলে? তুমি অসুস্থ! আমি এক্ষুণি রাজবৈদ্যকে সংবাদ দিচ্ছি—

মায়া । হ্যাঁ! আমি অসুস্থ! আমি স্বপ্ন দেখেছি—তুমি আমায় ছেড়ে কোথাও যেও না! তুমি আমার পাশে থাকো। বৈশাখী পূর্ণিমা পর্যন্ত আমায় তুমি বাঁচিয়ে রাখো…আমার স্বপ্ন সফল হোক!

———

বেপরোয়া বালিকা সঙ্ঘ

প্রথম দৃশ্য

[শিখাদের বাড়ীর একটি ঘর। মিতা ঘরের এক কোনে খালি হাতে ব্যায়াম করছে। গোপা আর কেয়া খালি হাতেই বক্সিং প্র্যাকটিস করছে। শিখা চিন্তিতভাবে ঘরে পায়চারি করছে। সোমা কৌতূহলের সঙ্গে ওদের ব্যাপার-স্যাপার লক্ষ্য করছিল। একটু বাদে ব্যাগ থেকে উল কাঁটা বের করে উল বুনতে থাকে।

শিখা এক সময় হঠাৎ থেমে ঘুরে দাঁড়ায়। চাপা উত্তেজনায় হাতে তুড়ি দিয়ে বলে —]

শিখা। ইউরেকা! পেয়ে গেছি।

মিতা। (ব্যায়াম থামিয়ে) কি ?

শিখা। মরুভূমি। আমরা উল্টো হেঁটে পাড়ি দেব।

গোপা। মানে ?

শিখা। সামনে মুখ করে হেঁটে অনেকেই পার হয় মরুভূমি। কিন্তু পৃথিবীর ইতিহাসে এ পর্যন্ত কেউ পেছন দিকে হেঁটে পার হয়নি।

মিতা। কিন্তু ওতে কি কোন সাড়া জাগান যাবে ? কাগজগুলো হয়তো পাত্তাই দেবে না। আর কাগজেই যদি ছাপা না হয় তাহলে আর এ্যাডভেঞ্চার করে লাভ কি ?

কেয়া । তাহলে একটা পাহাড়ের শৃঙ্গটৃঙ্গ বেছে নে না।

শিখা । একটা শৃঙ্গও আর বাদ আছে নাকি ? আমাদের জন্মের আগে থেকে সাহেবগুলো পর্যন্ত এসে জুটে বিখ্যাত সব শৃঙ্গগুলোই তো মেরে রেখেছে। বাকী ছিল নন্দা ঘুন্টি-ফুন্টি কিছু চুড়ো, তাও তো বেহাত হয়ে গেল।

গোপা । তাহলে আর উপায় কি ? সমুদ্রই ঠিক কর। কলাগাছের ভেলায় করে আন্দামান পাড়ি দিলে কেমন হয়।

মিতা । এটা কিন্তু দারুণ হয়! পৃথিবীর বহু দেশেই কলাগাছ নেই। কাজেই এক্ষেত্রে কম্পিটিটার্সও কম।

শিখা । (তীক্ষ্নদৃষ্টিতে তাকিয়ে) সাঁতার জানিস ?

মিতা । তা অবশ্য জানি না। তবে শিখে নেব।

শিখা । হোপলেস! তোদের নিয়ে কোন বড় অভিযানের কথা ভাবাই অন্যায় হয়েছে।

সোমা । (ঠাট্টার সুরে) এবার আকাশ দিয়ে কিছু ভাব না ? পাহাড়, সমুদ্র, মরুভূমি সবই তো ক্যান্সেল হয়ে গেল।

শিখা । (তির্যক দৃষ্টিতে তাকিয়ে) সোমা, আবার কুনো মেয়েদের মত বসে উল বুনছিস ?

সোমা । বারে অভিযানে যেতে হলে গরম জামা কাপড় লাগবে না ?

শিখা । তোর কথা আমরা বুঝি না, নয় ? তুই আদৌ ব্যাপারটাকে খুব সিরিয়াসলি নিতে পারছিস না। কেন, তোর কি এখনও ধারণা যে কোন অভিযানের ক্ষেত্রে আজকালকার মেয়েরা ছেলেদের চেয়ে কোন অংশে কমতি যায় ?

সোমা । আমি বলেছি সে কথা ?

গোপা । না বললেও বোঝা যায়। ঠিক আছে ভয় পেলে তোর যেতে হবে না। আমরাই যাব।

কেয়া । তারপর যখন কাগজে ইয়া বড় বড় ছবি, বিবরণ আর ইণ্টারভিউ বেরুবে আমাদের, তখন কিন্তু হিংসে করতে পারবি না।

সোমা । পাগল! কিন্তু কলার ভেলা সমুদ্রে উল্টে গেলে যখন আমি ইণ্টারভিউ দেব তোদের স্মৃতিতে, তখন পরলোক থেকে তোরাও হিংসে করিস না আমাকে, তাহলেই হবে!

শিখা । ব্যস, ব্যস; অবান্তর কথা অনেক হয়েছে, এবার কাজের কথায় আসা যাক। আর কারো মাথায় কিছু আসছে না?

গোপা । আচ্ছা অভিযান বাদ দিয়ে কোন নতুন রেকর্ড-টেকর্ডের দিকে গেলে হয় না? আজকাল তো হাঁচি, কাশি সব কিছুতেই রেকর্ডের হিরিক পড়ে গেছে। পত্রিকাগুলোও খুব উৎসাহী এ সব ব্যাপারে।

শিখা । আচ্ছা, সুন্দরবন অঞ্চলের অনেক জায়গা এখনও দুর্গম। সে রকম একটা জায়গায় অভিযান করলে কেমন হয়?

মিতা । কিন্তু ও-সব জায়গায় নাকি মানুষখেকো বাঘও বেরোয়। অন্য কিছু ভাবা যাক।

কেয়া । তাছাড়া, ও সব জায়গায় ভয়ে রিপোর্টাররা যেতে চাইবে না। আর ফটো ছাড়া আজকাল কোন অভিযানকেই কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। শেষ পর্যন্ত ফিরে এলে সবাই বলবে, কাকদ্বীপে গিয়ে বসেছিলাম।

শিখা । না, এ তো বড় সমস্যা হল। এত বড় পৃথিবীর একটা জায়গাও খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না অভিযানের জন্য?

[নেপথ্য থেকে পত্রিকার হকারের ডাক শোনা যায়।]

হকার । (নেপথ্যে) পত্রিকাটা নেবেন !

[বাইরে থেকে ছুঁড়ে দেওয়া পত্রিকাটা ওদের পায়ের সামনে এসে পড়ে। গোপা ছোঁ মেরে তুলে নিয়ে দেখতে থাকে সেটা অন্য দুই একজনও ওর ঘাড়ের ওপর দিয়ে গলা বাড়িয়ে পত্রিকাটা দেখতে থাকে।]

কেয়া । আচ্ছা, পত্রিকায় একটা বিজ্ঞাপন দিলে কেমন হয় ?

শিখা । কি বিজ্ঞাপন ?

কেয়া । দুরূহ অভিযানে বাহির হইতে চাই। উপযুক্ত স্থান প্রয়োজন। যে কেহ জানাইয়া বাধিত হইতে পারেন।

শিখা । (রাগত ভাবে) তোমার মাথা !

গোপা । (আনন্দে চীৎকার করে) পেয়ে গেছি।

শিখা । কি ?

গোপা । ভূতুড়ে বাড়ি।

মিতা । (সভয়ে) ভূতুড়ে বাড়ি !

[গোপা চীৎকার করে পত্রিকা থেকে সংবাদটা পড়তে থাকে]

গোপা । দীঘার নিকট একটি গ্রামে একটি পোড়ো বাড়িতে অদ্ভুত ভূতের উপদ্রব শুরু হইয়াছে। অবিশ্বাস্য সব ভৌতিক ক্রিয়াকলাপে সমগ্র অঞ্চলে আতঙ্কের সৃষ্টি হইয়াছে। রাত্রে দূরের কথা, দিনের বেলাও কেহ ঐ বাড়ির নিকটে যাইতে সাহস পায় না। (পত্রিকাটা নামিয়ে) এই বাড়ি দিয়েই শুরু করব আমরা। আমাদের 'বেপরোয়া বালিকা-সংঘে'র এটাই হবে প্রথম অভিযান।

শিখা । প্রস্তাবটা মন্দ নয়।

মিতা । কিন্তু ভূতটুত নিয়ে মিথ্যে নাড়া চাড়া করতে গিয়ে লাভ কি ?

গোপা । কেন, ভয় পাচ্ছিস্ ?

মিতা । না, ভয় না। কিন্তু, মানে—

শিখা । কে কে ভূতে বিশ্বাস কর, হাত তোল।

[কেউ হাত তোলে না। সবাই সবার মুখের দিকে তাকায়। কিন্তু সোমা অর্ধেক হাত তোলে।]

শিখা । তুই ভূতে বিশ্বাস করিস ?

সোমা । এখনও করি না, তাই অর্ধেক হাত তুলেছি। কিন্তু হঠাৎ কোনদিন সামনে এসে দাঁড়ালে বিশ্বাস করব কিনা, হলপ করে বলতে পারছি না ভাই।

শিখা । ঠিক আছে, তাহলে বাদ যা। আমরাই যাচ্ছি।

সোমা । বাদ যাবার প্রশ্ন আসছে কিসে ? বিশ্বাস অবিশ্বাসের প্রশ্ন উঠেছিল, তাই বললাম।

শিখা । (সবার দিকে তাকিয়ে) তাহলে আমরা ভূতুড়ে বাড়ির অভিযানে বেরুচ্ছি ? কারো কোন আপত্তি নেই ?

সবাই । না।

শিখা । (উল্লাসে) বেপরোয়া বালিকা-সঙ্ঘ—

সবাই । জিন্দাবাদ!

[হন্তদন্ত হয়ে ঠাকুমা ছুটে আছে।]

ঠাকুমা । বন্ধ কর, বন্ধ কর ; এখনি সব দরজা জানলা বন্ধ কর।

শিখা । কেন ঠাকুমা ?

ঠাকুমা । জিন্দাবাদের মিছিল বেরিয়েছে। এখনই আবার হুম-দাম শুরু হয়ে যাবে'খন।

মিতা । (হেসে) না ঠাকুমা, আমরা জিন্দাবাদ দিচ্ছিলাম।

ঠাকুমা । (অবাক হয়ে) তোরা ! সেই জন্যই কেমন যেন নরম

নরম গলা লাগছিল। তা তোরাও কি সব দলে নাম লিখিয়েছিস ?

শিখা । না ঠাকুমা, আমরা আমাদের 'বেপরোয়া বালিকা সংঘে'র নামে জিন্দাবাদ দিচ্ছিলাম।

ঠাকুমা । কি সংঘ ?

শিখা । বেপরোয়া বালিকা-সংঘ।

ঠাকুমা । ওমা, এ আবার কেমন নাম ? তা তোরাও কি সব মারপিট করতে বেরুবি ?

কেয়া । মারপিট করব কেন ? আমরা অভিযানে বেরুব। আমরা প্রমাণ করে দেব যে, এ যুগের মেয়েরা, আমরা, ছেলেদের চেয়ে কোন অংশে কম যাই না।

ঠাকুমা । এ আবার অলুক্ষণে কথা। এমনিতেই তো আজকালকার মেয়েদের ধিঙ্গিপনা দেখে আমাদের চক্ষু চড়কগাছ। তার ওপর আবার ছেলেদের মত ধেই ধেই করে অভিযান ? তা, ওদের যা সয়, তোদের তা সইবে কেন ?

শিখা । এ সব ভয় দেখিয়েই তো আমাদের চিরদিন দমিয়ে রেখেছে। নিজেরাই নিজেদের অপমান বাড়িয়েছ।

ঠাকুমা । হাটে বাজারে ধেই-ধেই করে না নেচে বেড়ালেই বুঝি অপমান করা হয় ?

মিতা । সে আপনারা বুঝবেন না ঠাকুমা। আজকাল দিনকাল পাল্টে গেছে। ইউরোপ আমেরিকায় মেয়েরা এখন যে কোন ব্যাপারে ছেলেদের সঙ্গে টেক্কা দিয়ে এগিয়ে যাচ্ছে এ যুগটাই ঠাকুমা নারী প্রগতির যুগ।

সোমা । শুধু বিদেশে কেন ? আমাদের দেশে প্রধানমন্ত্রী মেয়ে নয় ? আপনাদের সময়; আপনারা ভাবতে পারতেন এ কথা ? কিন্তু তাতে কি দেশটা রসাতলে গিয়েছে ?

ঠাকুমা । আর বাকীই বা কি আছে মা, তাও তো বুঝছি না।

[শিখার মেজদি শান্তা প্রবেশ করে। বয়স বছর কুড়ি হবে। বিবাহিতা।]

শান্তা । কি রে, তোরা বলে সব কিসের অভিযানে বেরুচ্ছিস ?

কেয়া । হ্যাঁ মেজদি, যে ক'দিন পরীক্ষার রেজাল্ট-না বেরোয়, ঘরে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। তাই আমরা—

শিখা । তুই থাম তো। যেন শুধু সময় কাটানর জন্যই বেরুচ্ছি আমরা! (দিদির দিকে ফিরে) আমরাও প্রমাণ করতে চাই যে, অভিযানের কৃতিত্বটা শুধু ছেলেদের নয়। শৌর্যে, বীর্যে, তারপর ইয়েতে মানে—

মিতা । কষ্টসহিষ্ণুতায়—

গোপা । সাহসে—

কেয়া । কূট-কৌশলে—(শিখা শাসনের ভঙ্গীতে আড় চোখে তাকায়। শুধরে নেয় কেয়া) না, না, শুধু কৌশলে মানে কুশলতায়—

শিখা । আমরা ছেলেদের চেয়ে কোন অংশে কম যাই না। তাই আমরা ঠিক করছি—

শান্তা । (কৌতুকের হাসি চেপে) পাহাড়, না সমুদ্র ?

সোমা । ভূতের বাড়ি।

শান্তা । ওঃ, অভূতপূর্ব। তা, ভূতপূর্ব অভিযাত্রীদের হাল কি হয়েছিল খোঁজ টোজ নিয়েছিস তো ?

শিখা । ভূতপূর্ব কেউ নেই। কেউ সাহস পায় নি। আমরাই প্রথম।

শান্তা । সেদিক দিয়েও তাহলে অভূতপূর্ব। কিন্তু ভূতুড়ে বাড়িতে

আরশোলা থাকে যে। আগে তাহলে কর্পোরেশন থেকে যাতে টিক-টুয়েন্টি ছড়িয়ে আসে সে ব্যবস্থা করিস!

শিখা । দেখ মেজদি, সব সময় ইয়ার্কি ভাল লাগে না।

সোমা । তাছাড়া ওটা কর্পোরেশনের বাইরে মেজদি। দীঘায়।

শান্তা । এই সেরেছে, একেবারে গেঁয়ো ভূতের আখড়ায় অভিযান! নাঃ, এবার তোরা একটা বিশ্ব-রেকর্ড সৃষ্টি না করে ছাড়বি না দেখছি। তা কবে রওনা হচ্ছিস?

কেয়া । এখনও ঠিক হয়নি। মাত্র জায়গাটার হদিস পেলাম। এখনও পুরো প্ল্যান করা হয় নি।

শান্তা । আচ্ছা! তা তোদের সঙ্গে আর কে কে যাচ্ছে? পানু, পিকলু, মণ্টুরাও যাচ্ছে তো?

শিখা । কেন? আমরা মেয়েরা নিজেরাই যেতে পারি না?

শান্তা । তা পারবি না কেন? তবে পথে বেরুলেই আজকাল নানা ঝামেলা তো। লাইন দিয়ে টিকিট কাটা, কুলি সামলান, হোটেল ঠিক করা, চোর-বাটপাড় আটকান— নানান হাঙ্গামা। দু'চার জনকে না হয় শেরপা হিসেবেই সঙ্গে নে। বড় বড় মেয়েদের অভিযাত্রী দলও তো তাই করে। শুধু ফ্ল্যাগটা পোঁতার সময় ওদের ধারে কাছে আসতে দিবি না, তাহলেই হল!

শিখা । (ধমকের সুরে) মেজদি।

শান্তা । (হেসে) ঠিক আছে, তোরা প্ল্যান ঠিক কর। উইশ ইউ সাকসেস্!

যায়। ওরা গম্ভীর ভাবে পরিকল্পনার জন্য এক হয়ে বসে।]

শিখা । তাহলে এ অভিযান প্রসঙ্গে সবাই এক মত?

সকলে । হ্যাঁ।

শিখা । কিন্তু আমরা গিয়ে উঠব কোথায়? সরাসরি ভূতের বাড়িটায়, না হোটেলে।

মিতা । প্রথমে হোটেলে ওঠাই ভাল। সেখান থেকে ভাল করে খোঁজ-টোজ করে তারপরে—

কেয়া । সেটাই ভাল রে শিখা। যাচ্ছিই যখন, কয়েক দিন একটু সমুদ্রপাড়ে বেড়িয়ে-টেড়িয়ে তারপর না হয়—

গোপা । আচ্ছা, ওখানে গ্রীষ্মকালেও সি-ফিস ধরে তো। ওঃ, পম্পেট মাছ যা টেস্টফুল না!

শিখা । তোদের কি ধারণা আমরা ওখানে সামার ভেকেশানে হাওয়া খেতে যাচ্ছি। অভিযানে যেতে হলে যে কোন রকম কষ্ট স্বীকার করার জন্য প্রস্তুত থাকতে হবে। এমনও হতে পারে যে, সাত দিন পেটে কিছু পড়লই না।

কেয়া । সে তো সমুদ্র বা পাহাড় অভিযানে। দীঘায় আজকাল পায়ে পায়ে হোটেল নাকি।

গোপা । শুনেছি কফিও পাওয়া যায় নাকি।

সোমা । হ্যাঁ, আজকাল সবই পাওয়া যায়। এমন কি শাড়ির দোকানও হয়েছে শুনলাম।

শিখা । (হতাশ ভাবে) ওঃ, হোপলেস্!

কেয়া । সরি। এই সব চুপ। ভূত ছাড়া এখন কোন আলোচনা ডিস-এ্যালাউড!

শিখা । যাবার দিন-টিন, কোথায় ওঠা হবে সে সব খোঁজ করার দায়িত্ব থাকবে মিতার ওপর। সব রাজী?

সবাই । রাজী।

শিখা । কেয়ার মাসতুতো দাদার শালার ভাইপো একটা দৈনিক পত্রিকায় চাকরি করে বলেছিলি না ?

কেয়া । হ্যাঁ, কেন বলতো ?

শিখা । তোর ওপর থাকবে প্রচারের দায়িত্ব। আমরা রওনা হবার আগেই যাতে সংবাদটা সমস্ত খবরের কাগজে বেশ ফলাও করে প্রচার হয়, সেদিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। রওনা হবার দিন হাওড়া স্টেশনে অভিযাত্রীর পোশাক পরা আমাদের ফটো তোলার ব্যবস্থাও সেই সঙ্গে রাখতে হবে।

মিতা । শাড়ি-টাড়িগুলো নেব না, দীঘায় এখন প্রচুর লোকজন যায় আসে।

শিখা । আমরা কি শাড়ির এক্সিবিশন দেখাতে যাচ্ছি ?

মিতা । না, তা নয়। তবে—

সোমা । অভিযাত্রীর পোশাক-টোশাকগুলো ওখানে গিয়ে পরলে হয় না ?

শিখা । না, হয় না। অভিযানে বেরুতে হলে সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ ভয় ত্যাগ করে যেতে হবে। যে পারবে না তার যাবার দরকার নেই।

কেয়া । পোশাক কোত্থেকে পাব ? কিনতে হবে ?

শিখা । হ্যাঁ। সে জন্য কাল থেকেই পাড়ায় চাঁদা তুলতে বেরুতে হবে সবার।

কেয়া । (উৎসাহের সঙ্গে) তার চেয়েও ভাল হয়, আমাদের উদ্দেশ্য ঘোষণা করে যদি সাহায্যের জন্য আমরা কাগজে একটা বিজ্ঞপ্তি দিই তাতে প্রচারটাও এগিয়ে থাকবে।

শিখা । রাইট। সাধে তোকে পাবলিসিটি অফিসার করেছি। ঠিক আছে, আজ তো অনেক বেলা হয়ে গেল, ও

বেলায় আবার আসিস সব। পুরো প্ল্যানটা তখন ঠিক করে নেওয়া যাবে।

মিতা । ঠিক আছে। বাই-বাই!

[সবাই মিলে হৈ-চৈ করতে করতে বেরিয়ে যায়। বাইরে থেকে ওদের শ্লোগান শোনা যায়:
'বেপরোয়া বালিকা-সংঘ—জিন্দাবাদ'।
হন্তদন্ত হয়ে ঘরে প্রবেশ করেন ঠাকুমা।]

ঠাকুমা । এবারও কি তোরা, না ওরা? কাদের জিন্দাবাদ রে? (কাউকে না দেখে) জিন্দাবাদ দিতে দিতে মেয়ে-গুলো কি এখনই অভিযানে বেরিয়ে পড়ল নাকি আবার? ও বড় বৌমা বড়-বৌমা!

[ডাকতে ডাকতে বেরিয়ে যাবার মুখে প্রবেশ করে শান্তা।]

শান্তা । তোমার আবার কি হল চেঁচাচ্ছো কেন?

ঠাকুমা । তোর মাকে খুঁজছিলাম। মেয়েগুলো বোধহয় সর্বনাশ ঘটাতে গেল।

শান্তা । কোথায়?

ঠাকুমা । অভিযান না কিসে যেন। ছেলেদের মত কি সব করবে নাকি ওরা।

শান্তা । তোমার কিছু ভয় নেই ঠাকুমা। পরীক্ষা হয়ে গেছে, শখের প্রাণ গড়ের মাঠ, একটু না হৈ-চৈ?

ঠাকুমা । সে তো সারা বছরই করছে। পথে-ঘাটেও করছে। কিন্তু অভিযান না করলে কি সাধ মেটে না? কি যে দিন কাল পড়ল মা! তোরা মেয়ে, মেয়ের মতই থাক না। ওই অভিযান-টভিযান, ভূত-টুতের পেছনে লেগে তোদের কি লাভ?

শান্তা । আরে বাবা সে রকম প্রত্যক্ষ ভূতের হাতে পড়লে নিজেরাই পালিয়ে আসতে পথ পাবে না। এত ভাবছ কেন? চল, চল, ভেতরে চল।

[ঠাকুমাকে নিয়ে ভেতরে চলে যায় শান্তা]

॥ দ্বিতীয় দৃশ্য ॥

[দীঘা। হোটেলের একটি ঘর। রাত প্রায় এগারোটা। টেবিলের ওপর, মেঝেতে ওদের জিনিসপত্র ছড়ান। ঘর খালি। শিখা, মিতা, গোপা, কেয়া, সোমা বাইরে থেকে ফিরে ঘরে এসে ঢোকে। শিখার হাতে একটা গোল করে পাকানো কাগজ।

ওরা কথা বলতে বলতেই ঘরে ঢোকে। যে যার কোমরের লুকোন জায়গা থেকে মাঝারি সাইজের ভোজালী বের করে টেবিলের ওপর রেখে দেয়।

সোমা ক্লান্ত ভঙ্গীতে বিছানার ওপর গড়িয়ে পড়ে।]

শিখা । এই সোমা শুলি কেন, এদিকে আয়।

[সোমা উঠে আসে। শিখা সবার সামনে হাতের কাগজটা মেলে ধরে।]

শিখা । তাহলে সবাই দেখে রাখ। এই হল গোটা-গ্রামটা আর ওই হল ভূতুড়ে বাড়ি। এই পথটা সোজা চলে গেছে জঙ্গলের দিকে। খুব সম্ভবতঃ এখান থেকেই কেউ এসে, কোন অসৎ উদ্দেশ্যে, সারা রাত ভূতের কাণ্ড-কারখানা করে।

মিতা । আমারও তাই মনে হয়। কেন না, সত্যি ভূত তো আর থাকতে পারে না, না রে?

শিখা । (তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে) কেন, তোর এখনও সন্দেহ আছে নাকি ?

মিতা । না তা নয়। এমনি বলছিলাম।

শিখা । (আবার কাগজের দিকে তাকিয়ে) কাল বিকেলে আমরা তাহলে এখান থেকে রওনা হচ্ছি।

গোপা । খাওয়া দাওয়াটা কি সেরেই যাব ?

শিখা । এই টেনশনের সময়ও তোর খাওয়ার কথা মাথায় আসে !

গোপা । না, এমনি বলছিলাম !

শিখা । খাবার আমাদের সঙ্গে যাবে। তাছাড়া বিকালে ঐ গ্রামের একটা ক্লাব থেকে আমরা রওনা হবার আগে আমাদের সংবর্ধনার ব্যবস্থা করছে। সুতরাং বিকেলের চা-টা নিশ্চয়ই ওখানেই হবে।

কেয়া । সম্ভব হলে ওরা ফটো তোলার ব্যবস্থাও করবে বলেছে। গ্রামে একটি ছেলের একটা ক্যামেরা আছে, সেটা সারাতে দিয়েছে নাকি।

শিখা । তাহলে আজ আর দেরি নয়। সব শুয়ে পড়। কাল আমাদের অভিযান, সুতরাং আজ সবার সাউণ্ড স্লিপ হওয়া প্রয়োজন।

[ঢালা বিছানায় ওরা যে যার জায়গায় শোবার তোড়জোড় শুরু করে।

হঠাৎ পাশের ঘর থেকে একটা টেবিল বা খাট টানার শব্দ শোনা যায়। ওরা অনেকেই চমকে ওঠে।

শিখা লক্ষ্য করে বলে—]

শিখা । কি রে, কি হল ?

সোমা । না, মানে পাশের ঘর থেকে শব্দটা এল না ?

শিখা । তাতে কি হয়েছে?

মিতা । কিন্তু ঘরটা খালি ছিল না?

শিখা । কেন, তোরা জানিস না, আজ বিকেলে ওঘরে নতুন বোর্ডার এসেছে, একটা মুসলমান ফ্যামিলি মনে হল। বোরখা পরা এক ভদ্রমহিলাকে দেখলাম। কেন, তোরা কি ভেবেছিলি ভূত?

সোমা । (আবার সাহস ফিরে পেয়ে) দূর, তা ভাবব কেন? ভাবলাম, চোর-টোর কিনা।

মিতা । আমিও তাই মনে মনে তৈরী হচ্ছিলাম ব্যাটাদের এক হাত দেখে নেবার জন্য।

শিখা । আচ্ছা ঠিক আছে, গুড-নাইট। সব শুয়ে পড়া যাক।

[আলো নিভিয়ে শুয়ে পড়ে ওরা। রাস্তার এক ফালি আলো এসে ঘরে পড়ায় ঘরটা আবছা আলোয় ভরে থাকে।
কিছুক্ষণ পর ওরা ঘুমিয়ে পড়ে বোধহয়। কারো সাড়াশব্দ পাওয়া যায় না।
হঠাৎ এক সময় ঘরের কোণের টেবিলের তলা থেকে নাকি সুরে একটা স্বর ভেসে আসে—]

স্বর । শিঁখা, মিঁতা, গোঁপা, কেঁয়া, সোঁমা!

মিতা । (চমকে মাথা তুলে) কে?

স্বর । ওঁদেরও তোঁল। কঁথা আঁছে।

[মিতা আতঙ্কে সবাইকে ধাক্কা দিয়ে তোলে।]

স্বর । তোঁমাদের স্পর্ধা দেঁখে আঁমি খুঁব ক্রুদ্ধ হঁয়েছি।

শিখা । আ-আপনি কে?

স্বর । যাঁর বাঁড়ি তোঁমরা কাঁল অঁভিযান কঁরতে যাচ্ছ, তাঁর মাঁলিকানি। ওঁটা ত একশ পুঁরুষের ভৌতিক ভিঁটে

অাঁমাদের। তোঁমাদের এত সাহস--

কেয়া। আ-আমরা ভেবেছিলাম—

স্বর। থাঁম। ভূঁতে বিশ্বাস কঁর না তোঁমরা ?

মিতা। এতদিন করতাম না, কিন্তু এখন—

স্বর। কেঁন কঁরতে না ?

সোমা। আ-মি করতাম।

স্বর। তোঁমাদের নেঁতা কে ?

শিখা। আমরা মা-মানে, স-সবাই নেতা। আ-আলাদা কেউ নেতা নেই।

স্বর। মিঁথ্যে কঁথা। নেঁতা ছাড়া অঁভিযান হয় ? দেঁখবে, তোঁমাদের নেঁতাকে অাঁমি দেঁখিয়ে দেঁব ?

গোপা। না না, আপনার আর কষ্ট করে সামনে আসতে হবে না। আ-আমরাই বলে দিচ্ছি। শি-শিখাই আমাদের নেতা।

স্বর। শিঁখা, তাঁহলে মিথ্যে বললে কেঁন ? মাঁনুষের মত অাঁমরা মিথ্যে বঁলিও না, সঁহ্যও কঁরতে পাঁরি না।

শিখা। আ-আমার অন্যায় হয়ে গেছে ভূতদি—

স্বর। ভূঁতদি কি ? ভঁদ্রতাও শেঁখনি ?

শিখা মাপ করবেন। এর আগে ভূ-ভূতদের সঙ্গে তো কো-কোন দিন আ-আলাপ পরিচয় হয় নি, তাই জানতাম না। কি বলব ?

স্বর। বিঁদেহিনী দেঁবী। তাঁ ভূঁতে অাঁর এঁখন অঁবিশ্বাস নেই তো ?

সবাই। না!

স্বর। কাঁল তাঁহলে অঁভিযানে যাঁচ্ছ নাঁ তো ?

শিখা। না, ভূত বিদেহিনীদি।

স্বর । মঁানুষকে অঁামরা বিঁশ্বাস কঁরি নাঁ। লিঁখে দাঁও তাঁহলে।

শিখা । (হাত বাড়িয়ে কাগজ ও পেন নিয়ে) কি লিখব ?

স্বর । (থেমে থেমে বলতে থাকে) অঁামরা ভূঁতে পূর্ণ বিঁশ্বাসী। তাঁহাদের অঁামরা শ্রঁদ্ধা করি। জীঁবনে অঁার কোঁনদিন ভূঁত নিঁয়া হাঁসি-ঠাট্টা কঁরিব না। যেঁখানে ভূঁতের বাঁসা তাঁর একশঁ মাঁইলের মধ্যে কোনরূপ অঁভিযান কঁরিতে যাঁইব না।

শিখা । (মুখে বলে বলে লেখে) করিতে যাইব না (মুখ তুলে) আর কি লিখব ?

স্বর । শেঁষ লাঁইনে লেঁখ, ফিরিয়া গিঁয়া এই অঁভিযান প্রঁসঙ্গে বঁন্ধু বাঁন্ধব বা কাঁহারো নিঁকট কোন গুঁল মাঁরিব নাঁ।

শিখা । (লেখা শেষ হলো) লিঁখেছি।

স্বর । বঁ্যস, কাঁগজটা এঁবার টেঁবিলের ওঁপর এসে রেঁখে যাও অঁামি নিঁয়ে নিচ্ছি।

শিখা । ও-ওখানে যেতে হবে ? এখানেই রেখে দিই না ? আপনি পরে কোন সময় নিয়ে নেবেন ?

স্বর । কেঁন, ভঁয় পাঁচ্ছ ? ভঁয় নেই, কোঁন ভঁয় নেই।

শিখা । (আর সবাইকে) চ-চল না, সবাই মিলেই যাই। ইনি বলছেন যখন !

[দল বেঁধে ওরা সবাই জড়িত পদক্ষেপে টেবিলের কাছে যায়। চিঠিটা সেখানে চাপা দিয়ে রাখে।

কিন্তু ওরা ঘুরতেই একটা হাত জানলার আড়াল থেকে চিঠিটা নিয়ে নেয়।]

স্বর । দাঁড়াও। (ওরা চমকে থেমে পড়ে) এঁত কঁষ্ট কঁরলে

তোঁমাদের বিঁদেহিনীদিকে দেঁখবে না ?

[সুইচের শব্দের সঙ্গে সঙ্গে ঘরের আলো হঠাৎ জ্বলে ওঠে। আলনার আড়াল থেকে শান্তাদি হাসতে হাসতে বেরিয়ে আসে। হাতে শিখার লেখা কাগজটা।]

শিখা । মেজদি ! তুই !

শান্তা । দাঁড়া বাবা, ওঃ, মশায় খেয়ে একেবারে শেষ করে দিয়েছে।

মিতা । তা, আপনি হঠাৎ কি করে—

শান্তা । আজ বিকেলেই এসেছি। তোমাদের পাশের ঘরে উঠেছি।

গোপা । কিন্তু ওখানে নাকি এক—

শান্তা । মুসলমান পরিবার তো ? বোরখা পরা সেই মহিলা আমিই।

কেয়া । তা, এই ঘরে ঢুকলে কি করে ? আমরা বাইরে আসার সময় তো তালা দিয়ে বেরিয়ে ছিলাম।

শান্তা । আরে বাবা, তালাটাও তো মার ট্রাঙ্ক থেকেই খুলে এনেছিস শিখা। আর কাছে ডুপ্লিকেট চাবি ছিল। সেটা দিয়েই তালা খুলে ভেতরে ঢুকে বিদেহিনীদি হয়েছিলাম এতক্ষণ। তোদের জামাইবাবু আবার বাইরে থেকে তালা দিয়ে দিয়েছিল।

মিতা । জামাইবাবুও এসেছেন তাহলে ?

শান্তা । না হলে আর কার সঙ্গে আসব ? আমি তো আর তোদের মত বেপরোয়া না।

শিখা । (হঠাৎ চীৎকার করে মেজদির ওপর ঝাঁপিয়ে পড়ে) অসহ্য, ইতর, ছোটলোক।

শান্তা । (ওকে সামলাতে সামলাতে হেসে নাকি সুরে) ওঁরে, তোঁদের বেঁপরোয়া নেঁতাকে সাঁমলা। ভূঁতের ওঁপর অভিযান চাঁলিয়েছে রে। ভূঁতকে প্রাঁণে মেরে ফেঁলল রে!

[সবাই মিলে হৈ-হৈ করে শিখাকে ছাড়িয়ে আনার চেষ্টা করে।]

[পর্দা নেমে আসে]



বরেন গঙ্গোপাধ্যায়

হিং টিং ছট

চরিত্রলিপি

হবুচন্দ্র	...	...	রাজা
গবুচন্দ্র	...	...	মন্ত্রী
লক্কর সিং	...	...	সভাসদ
ঠক্কর সিং	...	...	সভাসদ

চৌকিদার, পথিক এবং রাজার কয়েকজন প্রজা।

অভিনয়ের আগে

এক যে রাজা, নাম তার হবুচন্দ্র। তার মন্ত্রী গবুচন্দ্র। রবীন্দ্রনাথ এদের নিয়ে লিখলেন 'হিং টিং ছট' অর্থাৎ প্রথমেই তিনি বললেন,

"স্বপ্ন দেখেছেন রাত্রে হবুচন্দ্র ভূপ
অর্থ তার ভাবি ভাবি গবুচন্দ্র চুপ।"

আদৌ হবুচন্দ্র ভূপ নামে কোন রাজা ছিল কিনা বলতে পারি না। তবে আজ থেকে প্রায় চারশ বছর আগের কথা, এমন একটা সময় গিয়েছে যখন জোর যার মুলুক তার। ফলে সমস্ত বাংলাদেশে তখন রাজা-রাজড়ার ছড়াছড়ি। এঁরা প্রায় সকলেই বার হাত কাঁকুড়ের তের হাত বিচির মত অদ্ভুত সব ভাবতেন, স্বপ্ন দেখতেন আর সেই স্বপ্নকে কাজে লাগাবার চেষ্টা করতেন। রাজায় রাজায় বনিবনাও খুব যে একটা ছিল এমন নয়। বাদ বিসম্বাদ একজনের সাথে আর একজনের লেগেই থাকত। হ'ত যুদ্ধ বিগ্রহ, প্রাণ যেত উলু খাগড়ার।

এমনি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজায় বাংলাদেশ যখন বিভক্ত তখন এলো বম্বেটে পর্তুগীজ দস্যুরা, মগেরা, সুদূর আরাকান দেশ থেকে। এদের অত্যাচারে নিরীহ প্রজাদের দুঃখের আর সীমা রইল না। এ যুগের কোন কোন রাজা-মহারাজারা তাদের রাজ্য শাসন ব্যাপারে কতদূর যে অজ্ঞ ছিল সেই ছবিই এই নাটিকায় তুলে ধরবার চেষ্টা হয়েছে। হবুরাজা আর গবুমন্ত্রীর ঐতিহাসিক মূল্য তাই এদিক থেকে অনেকখানি।

প্রথম দৃশ্য

(পর্দা উঠতেই দেখা যাবে একজন চৌকিদার ঢোল পিটিয়ে রাজ্যময় রাজার আদেশ জারি করছে। তাই শুনে দু' একজন লোক আগ্রহ নিয়ে এগিয়ে আসছে চৌকিদারের কাছে।)

ঢোলের শব্দ : ডুম ডুম ডুডুম ডুডুম, ডুম ডুম ডুডুম ডুডুম, ডুম ডুম……

চৌকিদার। (চেঁচিয়ে) মহারাজাধিরাজ হবুচন্দ্রের রাজ্যে আজ থেকে নতুন আইন জারি হ'ল। সকলে শ্রবণ কর।

(ঢোলের শব্দ : ডুডুম ডুডুম।)

চৌকিদার। মহারাজাধিরাজ আজ থেকে নতুন আইন জারি করছেন যে তাঁর কোন প্রজা রাত্রিবেলা ঘুমুতে পারবে না। অর্থাৎ—

(ঢোলের শব্দ : ডুডুম ডুডুম।)

চৌকিদার। অর্থাৎ দিনেরবেলা সবাইকে ঘুমিয়ে রাত্রিতে কাজকর্ম করতে হবে। মহারাজের এই আইন অমান্যকারী প্রজাকে শূলে চড়িয়ে চরম দণ্ড দেওয়া হ—বে —।

(ঢোলের শব্দ : ডুডুম ডুডুম ডুম ডুম।)

১ম ব্যক্তি। হ্যাঁ বাবা চৌকিদার, এ কেমন ধারা কথা শোনাচ্ছ ?

২য় ব্যক্তি। নেশা টেশা কিছু করনি তো বাবা ?

চৌকিদার। কী, আমাকে বলছ নেশাখোর ? জানো তোমাদের ধরে নিয়ে গিয়ে শূলে চড়াতে পারি ?

১ম ব্যক্তি। তা পার।

২য় ব্যক্তি। কিন্তু বাবা রাতে জেগে থাকব আর দিনে ঘুমুব এ কেমন ধারা আইন হ'ল ?

চৌকিদার। যেমন দেশের লোক তেমন তো তার আইন। কথায় বলে না যেমনি কুকুর তেমনি মুগুর। দেখছ না, চোর ডাকাতে দেশটা কেমন ছেয়ে গেছে; আজ এখানে চুরি কাল ওখানে ডাকাতি, এসব বন্ধ করতে হলে সবাইকে মিলে রাত না জাগলে চলবে কি করে।

২য় ব্যক্তি। এঁ্যা!

১ম ব্যক্তি। রাতে সবাই ঘুমুই তাই চুরি হয়, কিন্তু দিনে যখন সবাই ঘুমুব তখন বুঝি আর দিনে চুরি হবে না?

চৌকিদার। মগজে দেখছি মণ দেড়েক গোবর ভরে রেখেছ। রাজা হবুচন্দ্র আর তাঁর মন্ত্রী গবুচন্দ্র কি তোমার মতো গবেট নাকি? না বুঝে, না ভেবেই আইন করেছেন। রাজ্যটা শুধু হাওয়ায় চলছে না হে,—বুদ্ধি দিয়ে চালাতে হচ্ছে। দিনে সূর্য ওঠে, তা জানো তো?

১ম ব্যক্তি। হ্যাঁ সূর্য—

চৌকিদার। ব্যস ব্যস, সূর্যের আলোয় কোন্ ব্যাটার সাহস আছে যে চুরি করবে? এসব তোমার আমার বুদ্ধি না হে, তোমার আমার বুদ্ধি না। রাজা-রাজড়ার বুদ্ধি।

৩য় ব্যক্তি। তাই বলে দিনে ঘুমিয়ে রাত জেগে থাকা?

চৌকিদার। কেন, অসুবিধা কি হ'ল? চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে আট ঘণ্টা ঘোঁৎ ঘোঁৎ করে ঘুমুতে পারলেই তো হ'ল। চুলচেরা হিসেব করা সব।

১ম ব্যক্তি। কিন্তু চৌকিদার মশাই, আমি বলছিলাম কি—

চৌকিদার। নাঃ, আমার এখন গজর গজর করলে চলবে না। যাই, সবাইকে খবরটা পৌঁছে দিতে হবে তো।

১ম ব্যক্তি। আহা হা, শোনই না ভায়া। এখনো তো ঢের বেলা। আমি

বলছিলাম কি, রাতে চুরি হয় তাই চুরি বন্ধ করতে হলে কিছু চৌকিদার বাড়ালেই তো হয়, অনর্থক—

৩য় ব্যক্তি। তাতেও কোন লাভ হবে না ভায়া।

১ম ব্যক্তি। কেন হবে না ?

৩য় ব্যক্তি। আলবৎ হবে না। আমি বলছি হবে না! চৌকিদাররা রাতের বেলায় নাকে তেল দিয়ে না ঘুমিয়ে চোর ধরার জন্য জেগে থাকবে, দায় পড়েছে বড়।

চৌকিদার। কী, আমরা নাকে তেল দিয়ে ঘুমুই ? আর যত সব চোর ডাকাত সবাই উড়ে এসে ধরা দেয়, না ? জানো, আমি তোমাদের শূলে চড়াতে পারি ?

৩য় ব্যক্তি। এই দ্যাখো, চৌকিদারদাদা আবার রাগ করে বসলে! আরে আমি কি তোমার কথা বলছি নাকি! না, তোমাকে ওরকম বলতে পারি মুখোমুখি দাঁড়িয়ে। আমি বলছি তোমাকে বাদ দিয়ে। তোমার মতো সবাই যদি ভালো হ'ত তাহলে কি আর দুঃখু ছিল কোন।

চৌকিদার। তাই বল। ভাবছিলাম বুঝি আমাকেই বলছ। যাক, বেলা হয়ে যাচ্ছে, এবার পথ ছাড় দেখি ; আমায় আবার রাজ্যিময় ঘুরতে হবে এই ঢোল কাঁধে করে।

১ম ব্যক্তি। আরে যেতে তো হবেই। অত ব্যস্ত কেন ? দু'চারটে গল্প টল্প শোনাও না রাজবাড়ির।

চৌকিদার। না না, আমার আর সময় নেই।

ঢোলের শব্দ ঃ ডুম ডুম ডুডুম ডুডুম, ডুম ডুম ডুডুম ডুডুম, ডুম ডুম—

চৌকিদার। (চেঁচিয়ে) মহারাজাধিরাজ হবুচন্দ্রের রাজ্যে আজ থেকে নতুন আইন জারি হয়েছে, তোমরা সবাই শ্রবণ কর—

(ঢোলের শব্দ ঃ ডুডুম ডুডুম।)

চৌকিদার। মহারাজাধিরাজ আজ থেকে নতুন আইন জারি করেছেন যে তাঁর কোন প্রজা রাত্রিবেলা ঘুমুতে পারবে না। অর্থাৎ

(ঢোলের শব্দ : ডুডুম ডুডুম।)

চৌকিদার। অর্থাৎ দিনের বেলা সবাই ঘুমিয়ে…

(বলতে বলতে ধীরে ধীরে প্রস্থান)

১ম ব্যক্তি। আচ্ছা আইন রে বাবা। আমি না হয় রাতে ঘুমুলুম না। দিনের বেলা নাকে তেল দিয়ে প্রাণ ভরে ঘুমুলুম কিন্তু আমার হাল চষার বলদ দুটো কি রাতের বেলা না ঘুমিয়ে হাল চষতে যাবে? ওরা আমার কথা শুনবে?

২য় ব্যক্তি। গাই বলদকে মারধর করেই মাঠে নিয়ে যেতে পার কিন্তু আমার যে এদিকে আর এক বিপদ।

১ম ব্যক্তি। কি আবার?

২য় ব্যক্তি। আমার যে জাত ব্যবসা কাপড় কাচা। রাতের বেলা কাপড় কেচে যদি দিনের বেলা ঘুমুই তবে কাপড় শুকোবে কখন? তোমরাই বল, কি বিপদেই না পড়া গেল—

৩য় ব্যক্তি। তোমরা ভাই যে যার নিজের নিজের কথা ভাবছ, কিন্তু আমার নাপতেগিরি এবার শিকেয় তুলতে হবে। দিনের আলোতেই ভয়ে ভয়ে চুল দাড়ি কাটি, কখন কেটেকুটে যায়! রাতের অন্ধকারে কেউ কি আর চুলদাড়ি কাটতে আসবে আমার কাছে? হায় হায়, আমার জাত ব্যবসা ছেড়ে এবার না খেয়েই মরতে হবে দেখছি।

১ম ব্যক্তি। আরে চুল দাড়ি তো আর বড় কথা নয়। বড় কথা হচ্ছে পেটের ভাত। তাই যদি না হল, চাষবাস যদি শিকেয় তুলতে হয় তাহলে পেটের ভাত আসবে কোত্থেকে শুনি?

২য় ব্যক্তি। যা হবার তাতো হবেই, অতশত আর ভেবে লাভ কি?

চল, বাড়ির দিকে পা চালাই। সবাইকে সাবধান টাবধান না করে দিলে বলা তো যায় না কে আবার কি কেলেঙ্কারী বাধিয়ে বসে। (প্রস্থানোদ্যত)

১ম ব্যক্তি। আরে! আমাদের হরিমুদি আসছে না! বড় তিড়িং বিড়িং করে লাফাচ্ছে, এখনো বোধ হয় আইনের কথাটা শোনেনি।

২য় ব্যক্তি। দেখাই যাক, এদিকেই তো আসছে।

(হরিমুদির প্রবেশ। হাসিখুশি মুখ)

হরিমুদি। একেই বলে চিচিংফাঁক। শুনেছ নাকি আলিবাবার গল্প, আমফাঁক, জামফাঁক, কাঁঠালফাঁক তারপরে চিচিংফাঁক। হুররে।

১ম ব্যক্তি। লোকটা কি পাগল হয়ে গেল নাকি?

২য় ব্যক্তি। আরে মুদিমশাই, দেশে যে নতুন আইন হয়েছে শুনেছ?

৩য় ব্যক্তি। আইনের কথা শুনলে ওর মুণ্ডু শুদ্ধ ফাঁক হয়ে যাবে।

হরিমুদি। আইনের কথা না শুনেই কি অত লাফাচ্ছি? আগে নিজের কানে শুনেছি, তারপর দশজনকে শুনিয়েছি। এবার তোমাদের শোনাতে এলাম। চিচিংফাঁক। হুররে।

১ম ব্যক্তি। সেকি, খুব যে খুশিতে আটখানা!

৩য় ব্যক্তি। সব কেমন যেন গোলমেলে ঠেকছে।

হরিমুদি। তবে কি কাঁদব নাকি? বেঁচে থাকুন আমাদের রাজামশাই। এবার থেকে আমার পোয়াবারো।

২য় ব্যক্তি। আহা, কী এমন সুবিধে হ'ল তোমার?

হরিমুদি। বল কিহে, সুবিধে নয়? একেবারে চিচিংফাঁক। তেলের দাম এবার চড়িয়ে দেব একশগুণ। কিনবে তো কেন না কিনবে মর অন্ধকারে। তবে হ্যাঁ, ধারবাকি আজ থেকে এ শর্মা

আর কাউকে দেবে না বুঝেছ ? এখনও সময় আছে গিয়ে লাইন দাও আমার দোকানের সামনে। হুররে। চিচিংফাঁক।

৩য় ব্যক্তি। একশগুণ মানে কত টাকা ?

২য় ব্যক্তি। ধুত্তোর ! দিনেও ঘুমুব, রাতেও ঘুমুব। চব্বিশ ঘণ্টাই হাসবনা, খেলবনা, কাঁদবনা, কাজ করবনা, এমন কি উঠেও বসবনা, কেবল ঘুমুব।

১ম ব্যক্তি। হ্যাঁ, তাই কোরো। যদি কুম্ভকর্ণ না হয়েছ তবে কি বললাম।

২য় ব্যক্তি। না, লম্বকর্ণ হয়ে শুনব ওসব ছাই ভস্ম।

হরিমুদি। একশগুণ মানে কত টাকা জানো ? এই তোমার মাথায় যত চুল তার চেয়ে কিছু কম টাকা।

২য় ব্যক্তি। বাপরে !

হরিমুদি। বাপরে না, চিচিংফাঁক। বেঁচে থাকুন রাজামশাই। দীর্ঘজীবী হোন রাজামশাই। চৌকিদারের মুখে ফুলচন্দন পড়ুক। আমার মুদিখানায় গণেশ বাঁধা থাক। রাতে ঘুমুনো আর চলবে না, দিনের বেলা ঘুম। হাঃ হাঃ হাঃ, চিচিংফাঁক।

১ম ব্যক্তি। একি অন্যায় বল তো দেখি !

হরিমুদি। কিসের অন্যায় ! হবুচন্দ্র রাজা আর গবুচন্দ্র মন্ত্রী সাতদিন সাতরাত ভেবে ভেবে তবে এই আইন করেছেন। এসব বাবা আমার তোমার গোবর পোরা মাথা না হে, গোবর পোরা মাথা না।

১ম ব্যক্তি। সবই তো বুঝলুম কিন্তু কিছুই তো মাথায় ঢুকছে না।

হরিমুদি। তা রাজ দরবারে গিয়ে মাথায় ফুটো ফুটো করে আসলেই তো পার। এখনো বলছি সময় আছে, আমার মুদিখানার সামনে গিয়ে লাইন দাও, কাজ হবে। আমি যাই, সবাইকে

আমার দোকানের কথাটা একবার স্মরণ করিয়ে দিয়ে আসি। চিচিংফাঁক। হুররে।

(হরিমুদির প্রস্থান)

৩য় ব্যক্তি। হরিমুদির তো চিচিংফাঁক হ'ল, আমাদের হ'ল আমফাঁক, জামফাঁক, কাঁঠালফাঁক আর মুণ্ডুফাঁক। চল এবার বাড়ি যাই।

সকলে। তাই চল।

(সকলের প্রস্থান)

দ্বিতীয় দৃশ্য

(নগর নিস্তব্ধ। খাঁ খাঁ রোদ্দুর। রাস্তা ঘাট, বাড়ি ঘর, গাড়ি ঘোড়া সব কিছুই যেন ঘুমে ঢুলে আছে! এমন সময় একজন পথিকের প্রবেশ। হাতে তার একটা লাঠি, পিঠে একটা কাপড়ের বোঁচকা।)

পথিক। এ কেমন দেশে এলাম রে বাবা! একটা লোকও দেখা যাচ্ছে না। সবাই কি মরে পড়ে আছে নাকি এরাজ্যে। (এদিকে ওদিকে ঘুরে ঘুরে) এত সব বাড়ি-ঘর এত গাড়ি-ঘোড়া, কিন্তু লোকগুলো গেল কোথায়? একি, একি ভূতের দেশ নাকি রে বাবা। দিনের বেলা ভর দুপুরে কারো টিকিরও দেখা নেই। নাঃ, সামনের ঐ বড় বাড়িটায় একবার খোঁজা যাক। (উইংসের একপাশে এসে) কেউ বাড়ি আছেন? ও মশাইরা, কেউ শুনতে পাচ্ছেন? নাঃ, বাড়িতেও কেউ আছে বলে তো মনে হচ্ছে না। আবার ডাকি, কেউ শুনতে পাচ্ছেন? কেউ বাড়ি আছেন কি? (এমন সময় বাড়ির ভেতর থেকে সাড়া এলো) কে? কে ডাকছে এই ভর দুপুরে? চৌকিদার নাকি?

পথিক। আচ্ছা মশাই, একটু বাইরে আসুন না। বড় জল তেষ্টা পেয়েছিল। আর সেই সকাল থেকে লোকজন না দেখে দেখে হাঁপিয়ে উঠেছি। একটু বাইরে আসুন না মশাই, মুখখানা দেখি। দুটো কথা বলি।

(গৃহকর্তা বাড়ির বাইরে এলেন)

গৃহকর্তা। কাকে চান? কোত্থেকে আসছেন? এই ভর দুপুরে কি মনে করে ডাকাডাকি করছেন?

পথিক। মশাই কি এতক্ষণ ঘুমুচ্ছিলেন নাকি ?

গৃহকর্তা। ও বুঝেছি, গোপনে খোঁজ নিতে এসেছেন আমি ঘুমিয়ে আছি কিনা। বাড়ির ভেতরে এসে দেখতে পারেন। আমার ছেলে মেয়ে হ্যাবলা, ক্যাবলা, বোঁচা, খাঁদু, বউ, ভাই সবাই ঘুমুচ্ছে। আমরা মশাই রাজার আদেশ অমান্য করবার মত লোক নই।

পথিক। কি বলছেন আপনি!

গৃহকর্তা। কেন আমি ঘুমুচ্ছিলাম না বলে নালিশ করবেন নাকি ? সত্যি বলছি, এই আপনাকে ছুঁয়ে বলছি আমি ঘুমুচ্ছিলাম। আমার চোখ দেখে আপনি বুঝতে পারছেন না ?

পথিক। এই দুপুর বেলা সবাই একরকম মড়ার মতো ঘুমুচ্ছেন ?

গৃহকর্তা। বিশ্বাস না হয় আসুন না ভেতরে। স্বচক্ষেই দেখে যান। আমরা সবাই ঘুমুচ্ছি। নেহাত আমার নাক ডাকাটা আসে না তাই আপনি পাহারা দেবার সময় তা শুনতে পান নি।

পথিক। দাঁড়ান দাঁড়ান, আমি তো মশাই এর মাথা মুণ্ডু কিছুই বুঝতে পারছি না।

গৃহকর্তা। এই জন্যেই মশাই আপনাদের ওপর রাগ হয়। বলছি তো বিশ্বাস না হয় দেখেই যান বাড়ির ভেতর ঢুকে। আমরা কেউ রাজার আদেশ অমান্য করছি না।

পথিক। তা আপনারা যা ভালো মনে করেন করবেন। কিন্তু দয়া করে আমাকে একটু ব্যাপারটা খুলে বলবেন কি ?

গৃহকর্তা। হ্যাঁ, এখন আপনার সাথে বসে গজর গজর করে সারা দুপুর কাটিয়ে দেই আর কি। আজকের ঘুমটাই মাটি করে দিলেন তো। সন্ধ্যে হতে না হতেই তো উঠে হাত মুখ ধুয়ে চা

খেয়ে বাজার যেতে হবে। আপনার মতলবখানা কি শুনি ?

পথিক। দেখুন, আমি আসছি অনেক দূর দেশ থেকে। রাজবাড়িটা কোন দিকে একটু দেখিয়ে দিতে পারেন ?

গৃহকর্তা। (স্বগতোক্তি) লোকটা দেখছি পাকা ঘুঘু। একেবারে যেন কিছুই জানে না এমন ভাব দেখাচ্ছে। নাঃ, ওর সাথে বেশি কথা বলে কাজ নেই। শেষে হয়ত বলে বসবে দিনে না ঘুমিয়ে গল্প করছিলাম, তার চে—হ্যাঁ শুনুন, আমি আদার ব্যাপারী জাহাজের খবর আমার কাছে নেই বুঝলেন। আপনি দেখতে চেয়েছিলেন আমরা সবাই ঘুমুচ্ছি কিনা তাতো দেখা হয়ে গেছে, এবার যেতে পারেন। আমি এখন ঘুমুব। (গৃহকর্তার প্রস্থান)

পথিক। বারে বাঃ, এতো মজা মন্দ নয়। ও দাদা শুনছেন। আরে দরজাটাই বন্ধ করে দিলেন দেখছি। রাজবাড়ি না হয় নাই দেখালেন, অন্তত একগ্লাস খাবার জল যদি দিতেন। ধুত্তোর, লোকটার মাথাই খারাপ। আজব দেশেই এলাম দেখছি। কাকপক্ষী কারো টিকিরই দর্শন পাওয়া ভার। নাঃ, ঐ সামনের বাড়িটায় ডাকাডাকি করে দেখা যাক। বাড়িতে কে আছেন ? (আরো জোরে চিৎকার করতে করতে) আরে বাড়িতে কেউ আ—ছে—ন ?

(দ্বিতীয় গৃহকর্তার প্রবেশ)

গৃহকর্তা। কে, কাকে চাই ?

পথিক। আজ্ঞে আমি বহুদূর দেশ থেকে আসছি। যাব রাজবাড়িতে। তাই আপনাদের ডেকে—

গৃহকর্তা। জেনে নিচ্ছেন আমরা ঘুমিয়ে আছি কি নেই। হ্যাঁ মশাই, বাড়িতে পর্যন্ত ঢুকে হামলা করতে চান?

পথিক। আজ্ঞে!

গৃহকর্তা। ওহ, কিছুই যেন জানেন না। সাধু? তা সন্ধ্যের সময় আসলেই তো পারেন। আমার কাঁচা ঘুম না ভাঙিয়ে।

পথিক। দেখুন, বড় অন্যায় করে ফেলেছি। কিন্তু কোন উপায় ছিল না।

গৃহকর্তা। তা থাকবে কেন? রাজ্যে এত বাড়ি থাকতে আমার—

পথিক। না না, কে কে ঘুমুচ্ছে না ঘুমুচ্ছে তা জেনে আমার লাভ কি! কিন্তু—

গৃহকর্তা। কিন্তু টিন্তুর দরকার নেই মশাই, দেখেই যান। পরে আবার অন্য কথা বলতে পারবেন না।

পথিক। আচ্ছা ভেজালেই পড়লাম দেখছি। দেখুন, একটা কথা জিজ্ঞেস করব?

গৃহকর্তা। সব কিছু খোলাখুলি করে রাখাই ভালো। নিশ্চয়ই, বলুন আপনার কি বলবার?

পথিক। আচ্ছা, এই অসময়ে পড়ে পড়ে আপনারা এভাবে ঘুমুচ্ছেন কেন? কোন কাজ কর্ম নেই নাকি আপনাদের? আর কাজ কর্ম না থাকলেই বা এভাবে সমস্ত দিন নাকে তেল দিয়ে ঘুমুনো যায়?

গৃহকর্তা। একেবারে সাধু সেজে এসেছেন দেখছি।

পথিক। সত্যি বলছি আমি কিছুই জানি না। কিছু বুঝতেই পারছি না। এ রাজ্যে সবাই এভাবে ঘুমোয় নাকি?

গৃহকর্তা। তা বাড়ি বাড়ি ডেকে ডেকে জিজ্ঞেস করেই দেখুন না। আমাকে অনর্থক কাঁচা ঘুম ভাঙিয়ে না তুলে—

(দূর থেকে চৌকিদারের গলা শোনা গেল)

এইরে চৌকিদার বোধ হয় শুনতে পেয়েছে। যান যান মশাই, আমাকে আবার বিপদে ফেলবেন না যেন। আমি ঘুমুচ্ছিলুম আবার ঘুমুতে চললুম। (প্রস্থান)

পথিক। যাব্‌বাবাঃ! এবার দেখছি উল্টো বুঝলি রাম না হয়ে বসে। আচ্ছা মুশকিলেই পড়লাম। নাঃ, চুপচাপ একটু বসে জিরিয়েই নিই।

চৌকিদার (নেপথ্যে)। কার যেন গলা শোনা যাচ্ছে,—কে ঘুমুচ্ছে না ?

পথিক। ও চৌকিদার দাদা, আরে এসো এসো। এতক্ষণ যাহোক তবু একজন জেগে থাকা লোক পাওয়া গেল।

(চৌকিদারের প্রবেশ)

চৌকিদার। কে হে তুমি? ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছ? খবরদার, নড়োনা বলছি। এক লাঠিতে মুণ্ডু ঘুরিয়ে দেব।

পথিক। আজ্ঞে! আমি বহু দূর দেশ থেকে আসছি। একটু বিশ্রাম করছি এখানে।

চৌকিদার। এ্যই এ্যই, লাঠিটাকে সরিয়ে রাখ। হ্যাঁ আর ছোরা টোরা কোথাও লুকিয়ে রাখনি তো ?

পথিক। তুমি আমাকে চোর ঠাউরেছ নাকি! তা তিন চার দিন যাবৎ ঘুরে ঘুরে চোরের মত দেখতে হয়েছি বুঝি ?

চৌকিদার। হুঁ, পাকা লোক দেখছি। এ লাইনে কত দিন আছ? রাজার আইনের কথা মনে নেই বুঝি? শূলে চড়বার সখ হয়েছে ?

পথিক। আজ্ঞে, আমি এ রাজ্যের কোন নিয়ম কানুনই জানি না। কিছু বুঝতেও পারছি না।

চৌকিদার। তা পারবে কেন? দেখি উঠে দাঁড়াও বাপু? এবার বল, কি কি জিনিস চুরি করেছ, কোথায় কোথায় করেছ, কখন কখন করেছ।

পথিক। চুরি!

চৌকিদার। ন্যাকামি রেখে চটপট বলে ফেল তো বাবা। ডাকাতি টাকাতি করে কখনো কখনো আবার মানুষ খুব করনি তো?

পথিক। কি বলছ যা-তা?

চৌকিদার। দলের আর সব লোক কোথায়? টুকটুক করে সবার নামগুলো বলে ফেল, বলে ফেল।

পথিক। তুমি আমাকে চোর বলছ?

চৌকিদার। না না, চুরি কি আর তুমি করতে পার। তুমি চোর হবে কোন দুঃখে? তুমি ডাকাতি করতে ভালবাস তা আমাকে বললেই হয়, তোমাকে ডাকাত বলেই ডাকব।

পথিক। আমি চেঁচিয়ে লোক জড় করব বলছি।

চৌকিদার। তা না হয় পরেই কোরো। এবার তোমার হাত দুটো দাও দেখি বেঁধে ফেলি।

পথিক। আচ্ছা রাজ দরবারে নিয়ে যাবে তো? আমি ওখানেই যেতে চাচ্ছিলাম। ওখানেই তোমার মজা দেখাব। আমি এমনিতেই যাচ্ছি চল।

চৌকিদার। উঁহুঁ। হাতদুটো দাও আগে বেঁধে নি।

পথিক। আরে, সত্যি সত্যি আমাকে বেঁধে ফেলছ যে? আমি কি করলাম, কি মুশকিল! আমি কিছু জানি না।

চৌকিদার। তা রাজ দরবারেই বোল। আমার কাজ আমি করছি।

পথিক। এ তোমার কেমন কাজ শুনি? একজন নিরীহ লোককে

বেঁধে নিয়ে—ও চৌকিদারদাদা তোমার তুটো পায়ে পড়ি। আমাকে ছেড়ে দাও। ছেড়ে দাও না!

চৌকিদার। নাও নাও, মেলাই আর বোকো না। চল চল। তোমার বিদ্যেবুদ্ধি সব এবার বার করছি। আমার চোখে ধুলো দেওয়া! হুঁ হুঁ বাবা।

পথিক। আমি কিছু জানি না। আমি কি করলাম। আমাকে ছেড়ে দাও।

চৌকিদার। চল চল

(গোঁফে তা দিতে দিতে পথিককে নিয়ে চলল চৌকিদার)

২

তৃতীয় দৃশ্য

[রাজ দরবার। রাজা হবুচন্দ্র সিংহাসনে বসে আছেন। গবুচন্দ্রমন্ত্রী তাঁর একপাশে একটা চেয়ারে বসে। সিংহাসনের পিছনে দাঁড়িয়ে একজন পাখায়ালা পাখা দিয়ে বাতাস করছে রাজার মাথায়। সভাসদ্দের মধ্যে লক্কর সিং আর ঠক্কর সিং সভা জাঁকিয়ে বসে আছেন। উইংসয়ের একপাশে একজন সেপাই এ্যাটেন্শন্ হয়ে দাঁড়িয়ে পাহারারত।]

হবুচন্দ্র। আচ্ছা লক্কর সিং, আমি যদি সমস্ত পৃথিবীর রাজা হতাম, তাহলে কি করতাম বল দেখি?

লক্কর সিং। মহারাজ, আমার ক্ষুদ্র বুদ্ধিতে মনে হচ্ছে, আপনি একটা প্রমোদ-কাননের জায়গায় একশোএকটা প্রমোদ-কানন করতেন। সেখানে নাচ গান গল্প আড্ডা কথকতা আরো আরো কত কি সব হ'ত। আপনি হাতীতে চড়ে—

হবুচন্দ্র। উঁহুঁ, হ'ল না। তুমি বল তো ঠক্কর সিং আমি কি করতাম পৃথিবীর একছত্র অধিপতি হলে?

ঠক্কর সিং। মহারাজ, এতো সোজা প্রশ্ন। আপনি পৃথিবীর রাজা হয়ে সমস্ত দেশের রাজা মহারাজাদের ধরে এনে আপনার নফর বানাতেন। পৃথিবীর হীরে, জহরৎ, মণি, মুক্তো এনে আপনার প্রাসাদ সাজাতেন। তারপর—

হবুচন্দ্র। উঁহুঁ, হ'ল না। তুমি বল তো গবুচন্দ্র, দেখি মন্ত্রীত্ব করার বুদ্ধি তোমার সত্যি পাকা কিনা? বল, আমি যদি পৃথিবীর সম্রাট হতাম তবে কি করতাম?

গবুচন্দ্র। মহারাজ, আমার মনে হয় পৃথিবী জুড়ে আপনি আপনার সেই দিনে ঘুমিয়ে রাতে জেগে থাকার আইনটি ছেড়ে

দিতেন। কী খাসা আইন আপনি মাথা খাটিয়ে বার করেছেন মহারাজ, রাজ্যের চুরি ডাকাতি এক নিমেষে কর্পূরের মতো উবে গেছে। দিকে দিকে আপনার গুণ কীর্তন হচ্ছে মহারাজ।

হবুচন্দ্র। উঁহুঁ, এও হ'ল না। তোমাদের কারুর মাথাতেই কিছু নেই। আচ্ছা সময় দিলাম একটু ভেবে বলো। মনে কর আমি এখন সমস্ত পৃথিবীর রাজা। কেবলমাত্র বাংলা-দেশের এককোণায় পড়ে থাকা সামান্য একটুখানি জায়গার রাজা নই। আমি বাংলাদেশের পঞ্চাশটা রাজাকে হারিয়ে ফেললাম। তারপর ধীরে ধীরে পুরো ভারতবর্ষটাকে জয় করে নিলাম, তারপর ফিরিঙ্গিদের দেশগুলো, এমনি করে সবগুলো দেশ। মানে সব মাটি। আর শুধু মাটিই নয় সবগুলো সাগর। আকাশ মাটি জল সব আমার—বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ডটাই আমার। আমি এখন কি করব? কী করতে পারি?

গবুচন্দ্র। মহারাজ, আমার মাথায় তো কিছুই আসছে না। আমি আপনার মন্ত্রী, পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি রাজাধিরাজ শ্রীশ্রীহবুচন্দ্র ভূপের মন্ত্রী গবুচন্দ্র। মহারাজ, আপনি হয়ত রাজা হয়ে কিছু না কিছু একটা করবেন কিন্তু আমি পাগল হয়ে যাব। এখনই আমার মাথায় বন্-বন্ শব্দ হতে শুরু হয়েছে।

হবুচন্দ্র। তাহলে বলি শোন। আমি যদি পৃথিবীর রাজা হই তাহলে কি করব জানো?

সকলে। কী, কী?

হবুচন্দ্র। তোমাদের তিনজনকে রাজ্য থেকে তাড়িয়ে দেব।

গবুচন্দ্র। মহারাজ, একী অদ্ভুত চিন্তা করছেন আপনি!

লক্কর সিং। মহারাজ কি সত্যি আমাদের জন্য বিরক্ত হচ্ছেন? তাহলে বলুন—

ঠক্কর সিং। হ্যাঁ, বলুন মহারাজ, আমরা আর আপনাকে বিরক্ত করবার জন্য আসব না।

হবুচন্দ্র। তোমরা দেখছি নেহাতই ছেলেমানুষ। আরে পাগল, তোমাদের সাথে কি আমার সেই সম্পর্ক নাকি! যা ইচ্ছে তাই করব! আমি শুধু তোমাদের চোখ মুখের অবস্থা লক্ষ্য করবার জন্য এমনি একটা উড়ো কথা বললাম। আমিও পৃথিবীর রাজা হচ্ছি, আর তোমরাও রাজ্য থেকে বিতাড়িত হচ্ছ। যত সব বুজরুকি চিন্তা।

সকলে। না মহারাজ, আমরা এতে অপমান বোধ করছি।

হবুচন্দ্র। এই ছ্যাখ। সত্যি তোমরা চটে গেছ দেখছি। কৈ দেখি আমার রূপোর থালাটা। (সেপাই একটা রূপোর থালা এগিয়ে নিয়ে এলো। তাতে প্রচুর সোনা-গহনা, টাকা-পয়সা) এই নাও তোমাদের বকশিষ আজ প্রথমেই দিচ্ছি। কিছু মনে করো না। (তিনজনকে তিন মুঠো অর্থ দান)

গবুচন্দ্র। সত্যি মহারাজ, এই জন্যেই আপনাকে এতো ভালো লাগে। এতো খোলাখুলি আপনি মনের ভাব ব্যক্ত করতে পারেন।

লক্কর সিং। মহারাজা চিরজীবী হোন।

ঠক্কর সিং। মহারাজ আমি বহু দেশ বিদেশ ঘুরেছি। কিন্তু আপনার মতো আর দ্বিতীয় রাজার সংস্পর্শে আসি নি। প্রজাদের মঙ্গলের দিকে এমন ভাবে আর কাউকে ভাবতে দেখি নি।

গবুচন্দ্র। মহারাজ, আমিও বলছি আপনার জুড়ি নেই। আপনি এখন

পৃথিবীর একচ্ছত্র অধিপতি না হতে পারলেও পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ রাজা এ বিষয়ে কোন ভুল নেই।

হবুচন্দ্র। যাক, সবার মুখে হাসি ফুটেছে তাহলে। নাও ধর। (তিনজনকে আবার বকশিষ দিলেন মহারাজ) তোমরাই আমার ভরসা এ কথা কি আমি ভুলে যেতে পারি।

ঠক্কর সিং। মহারাজের জয় জয়কার হোক। আপনি পৃথিবীর শ্রেষ্ঠ দানবীর।

হবুচন্দ্র। আচ্ছা গবুচন্দ্র, এবার একটু কাজের কথা হোক। আমার রাজ্যের আর সব খবর ভালো তো? নতুন কোন ঘটনা থাকলে বলো।

গবুচন্দ্র। খবর সব কুশল মহারাজ। আপনাকে বিরক্ত করার মতো এমন কোন খবর নেই।

লক্কর সিং। আপনার অবর্তমানে দেশে কোন বিশৃঙ্খলা হতে পারে একথা যেই বিশ্বাস করুক না কেন আমি করি না।

হবুচন্দ্র। তা হলে আমার নতুন আইনখানা দেশের লোক মন দিয়েই গ্রহণ করেছে, কি বলো?

গবুচন্দ্র। সে কথা আর বলতে মহারাজ! এবার আপনি অনায়াসেই সেই পা ওপরে তুলে হাত দিয়ে চলাফেরা করার আইনটাও চালিয়ে দিতে পারেন।

ঠক্কর সিং। এ আবার কেমন আইন? মাথা টাথা সব নিচের দিকে আর পাগুলো আকাশের দিকে।

হবুচন্দ্র। আরে না না, ও আইন এখনই ছাড়বার দরকার কি! মুচিরা যদি ষ্ট্রাইক করে তবেই ওটা ছেড়ে দেব। তাহলে জুতো পায়ে থাক না থাক কিছুই যাবে আসবে না।

গবুচন্দ্র। ঠিক মহারাজ, ও আইনটা তাহলে এখন থাক।

লক্কর সিং। আমারও মনে হয় একেবারে এতগুলো আইন চালিয়ে দিলে উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে হয়ে যেতে পারে।

(এমন সময় সেপাই পথিককে নিয়ে প্রবেশ করল। পথিকের হাত দুটো দড়ি দিয়ে বাঁধা।)

সেপাই। (মহারাজাকে সেলাম ঠোকার পর) মহারাজ, এই লোকটিকে সন্দেহ করে ধরে এনেছি। মনে হয় লোকটি ডাকাত। দিনের বেলা না ঘুমিয়ে চুরির সন্ধানে ঘুরে বেড়াচ্ছিল রাজপথে।

গবুচন্দ্র। কে? নাম কি এর?

সেপাই। নাম বলো। মহারাজাকে কুর্ণিশ করো।

পথিক। আজ্ঞে আমার নাম বসন্ত কাঁসারী। আমি বহু দূর দেশ থেকে আসছি, মহারাজের কৃপাপ্রার্থী হয়ে।

হবুচন্দ্র। কোন দেশ? সে দেশের রাজার নাম? রাজাদের নামের লিষ্ট ঘেঁটে দেখ তো গবুচন্দ্র, মেলে কি না।

পথিক। আজ্ঞে মহারাজ, আমি আসছি রাজা প্রতাপাদিত্যের দেশ থেকে। রাজা প্রতাপাদিত্যের নাম নিশ্চয়ই শুনেছেন।

গবুচন্দ্র। কি অভিসন্ধিতে এসেছ বাবা? কোন গুপ্ত সংবাদ নেবার জন্য নাকি?

পথিক। আজ্ঞে না মহারাজ। আমি সামান্য একজন চাষাভূযো লোক। আমার বাড়ি-ঘর স্ত্রী-পুত্র সব ফিরিঙ্গিদের অত্যাচারে ধ্বংস হয়ে গেছে। ওরা আমার ঘরবাড়ি সব জ্বালিয়ে পুড়িয়ে সর্বনাশ করে দিয়েছে। আমার স্ত্রী আর আর দুটো ছেলে কারোরই কোন খবর পাচ্ছি না মহারাজ। আমি প্রাণের ভয়ে পালিয়ে এসেছি।

হবুচন্দ্র। তা আমার দেশে কি মতলবে? রাজা প্রতাপাদিত্যের কাছে গেলেই তো পারতে।

পথিক। মহারাজা প্রতাপাদিত্যের যদি শক্তিই থাকত তবে কি আর আমার মতো গরীব চাষীর এই দশা হয় আজ। শুনলাম আপনার রাজ্যের প্রজাদের সুখের অবধি নেই। তাই আজ থেকে আপনার দয়ায় আপনার শ্রীচরণে আমাকে একটু আশ্রয় দিন মহারাজ।

গবুচন্দ্র। দেখলেন তো মহারাজ, শুধু প্রতাপাদিত্যের দেশেই নয় এমনি ভাবে সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে গেছে আপনার যশ।

ঠক্কর সিং। উঁহুঁ, মহারাজ। লোকটি কিন্তু সন্দেহমুক্ত নয়। আমি কি ওকে দু' চারটে কথা জিজ্ঞেস করতে পারি?

হবুচন্দ্র। নিশ্চয়ই। বিদেশী লোককে কি সহজে বিশ্বাস করা যায়? যা দিনকাল। তারপর হয়ত দেখব সূঁচ হয়ে ঢুকল আর বেরুল ফাল হয়ে।

ঠক্কর সিং। আচ্ছা বসন্ত, সেপাই তোমাকে ধরে এনেছে কেন?

পথিক। আমি তো কিছু বুঝতে পারছি না মহারাজ। আমি তো কোন অন্যায় করি নি। একটা গাছতলায় দুপুরবেলা বসে ক্লান্তি দূর করছিলাম। এমন সময়—

ঠক্কর সিং। কি বলছ, দুপুরবেলা? রাজার আইন ভঙ্গ করছিলে?

হবুচন্দ্র। ঠিক, ঠিক ধরেছ ঠক্কর সিং। প্রতাপাদিত্যেরা তা হলে লোক পাঠিয়ে অন্যায় ভাবে আমার আইন ভঙ্গ করাচ্ছিল। আমার যশ আর রাজ্য শাসন দেখে ওর ঈর্ষা হয়েছে।

গবুচন্দ্র। মহারাজ, এই দুর্বৃত্তকে শূলে চড়াবার অনুমতি দিন, আর চিন্তা করবেন না। শত্রুর শেষ রাখতে নেই।

পথিক। মহারাজ, আমি আপনার কথা বুঝতেও পারছি না। আপনি আমাকে বাঁচান।

হবুচন্দ্র। না না মহারাজ, শত্রুকে বিশ্বাস নেই। জহ্লাদকে ডাকা ভালো। জহ্লাদ! (জহ্লাদের প্রবেশ)

জহ্লাদ। (কুর্নিশ করার পর) মহারাজ।

পথিক। মহারাজ, আমাকে বাঁচান, বাঁচান। আপনার রাজ্যে অন্যায় অবিচার করবেন না। আমি গরীব। আশ্রয় দিন মহারাজ। আমি চিরকাল আপনার দাসানুদাস হয়ে থাকব। (জহ্লাদ গবুচন্দ্রের আদেশে পথিককে কোতল করবার জন্য নিয়ে যেতে উদ্যত হ'ল।)

লক্কর সিং। দাঁড়াও। মহারাজ বিচারে একটু ভুল থেকে যাচ্ছে। যদি আদেশ করেন নির্ভয়ে বলি।

হবুচন্দ্র। নিশ্চয়ই, অন্যায় অবিচার করে আমি নাম খারাপ করতে চাই না।

পথিক। আমাকে ছেড়ে দিন মহারাজ, আমি কিছু জানি না।

লক্কর সিং। আচ্ছা সেপাই, তুমি কখন এই লোকটিকে ধরেছ? দুপুর-বেলা তো?

সেপাই। আজ্ঞে হ্যাঁ। দিনে না ঘুমিয়ে ও পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিল।

লক্কর সিং। বেশ। তা হলে তুমিও দিনের বেলা না ঘুমিয়ে পথে পথে ঘুরে বেড়াচ্ছিলে, তাই না? তুমিও তো তবে রাজার আইন ভঙ্গ করছিলে।

হবুচন্দ্র। ঠিক, ঠিক বলেছ লক্কর সিং। জহ্লাদ, সেপাইকেও শূলে চড়াও।

সেপাই। সেকি মহারাজ! আমি যে আপনারই কাজ করছিলাম। আপনার বেতনভূক ভৃত্য আমি। দেশে আইন ভঙ্গ হয় কি না দেখতে বেরচ্ছিলাম। আপনি আমার মা-বাপ। আমাকে রক্ষা করুন —

লক্কর সিং। আর কোন কথা নয়। জহ্লাদ, নিয়ে যাও সেপাইকে। আর পথিকের হাতের বাঁধন খুলে দাও। মহারাজ, এলোক সতি বিদেশী, একে ছেড়ে দিন।

গবুচন্দ্র। কি প্রমাণ আছে এ বিদেশী ?

লক্কর সিং। প্রতাপাদিত্যের দেশের খবর যদি আমাদের না দিতে পারে ও, তাহলে তো ওকেও শূলে চড়ানো হবে। প্রথমেই ওকে কোতল করে প্রতাপাদিত্যের খবরগুলো থেকে আমরা বঞ্চিত হব কেন ? কি মহারাজ কিছু অন্যায় বলছি ?

হবুচন্দ্র। ঠিক। ঠিক বলেছ লক্কর সিং। সেপাইকেই শূলে চড়াও। যাও সব আয়োজন কর। আমি অনেকদিন শূলে চড়ানো দেখি নি। যাও।

সেপাই। (চিৎকার করে) মহারাজ, মহারাজ, মহারাজ! আমাকে বাঁচান, বাঁচান!



হাসি দাসগুপ্তা

পিঠে খাওয়ার মজা

[পাঁচ থেকে সাত বছরের শিশুদের জন্যে]

চরিত্রলিপি

রণ্টু	গৃহস্থের ছেলে
ঝণ্টু	ঐ "
ঝুমঝুম—ঐ পোষা মুরগী	
মুনি	ঐ মুরগীর ছানা
চুনি	ঐ "
কুনি	ঐ "
টুনি	ঐ "
সোনামণি—গৃহস্থের হাঁস	
রুলি	ঐ হাঁসের ছানা
বুলি	ঐ "
টুলি	ঐ "
ভুলো	ঐ কুকুর
কালো	ঐ "
মেনী	ঐ বিড়াল
পুষি	ঐ "

প্রথম দৃশ্য

[বাড়ির পাঁচিলের পাশে বসে ঝুমঝুম রোদ পোয়াচ্ছে আর ঝিমোচ্ছে। তাকে ঘিরে খেলা করছে তার তিন বাচ্চা মুনি, টুনি আর কুনি।]

(চুনি ঢুকলো)

চুনি। মা ও মা!

মুনি। আঃ ডাকছিস কেন? মা ঘুমোচ্ছে দেখছিস না?

চুনি। বারে! মা ঘুমোবে কেন? ওরা যে পিঠে খাচ্ছে।

মুনি ও টুনি। (সমস্বরে) পিঠে খাচ্ছে? পিঠে আবার কিরে?

চুনি। সে চমৎকার জিনিষ। আঃ কি মিষ্টি আর নরম!

কুনি। তুই কি করে জানলি নরম আর মিষ্টি?

চুনি। কেন! খেয়ে দেখলাম,

কুনি ও টুনি। কি করে খেলি?

চুনি। ওই রন্টু ঝন্টু খেতে খেতে জানলা দিয়ে এক টুকরো ফেলে দিল—আমিও টুক করে খেয়ে ফেললাম।

মুনি, কুনি ও টুনি। (সমস্বরে) আমরাও খাব মা! আমরাও খাব!

ঝুমঝুম। (ঘুম ভেঙ্গে)—আরে! আরে! এতো চিৎকার কিসের?

চুনি। আমরা পিঠে খাব মা!

মুনি। তুমি আমাদের পিঠে বানিয়ে দাও। আমরা পিঠে খাব।

ঝুমঝুম। পিঠে খাওয়া কি সোজা কথা। পিঠে করতে কত জিনিষ লাগে জান?

চুনি। বল না কি কি জিনিষ লাগে? আমরা সব এনে দেব।

ঝুমঝুম। ময়দা লাগবে, মাখন লাগবে, চিনি লাগবে, দুধ লাগবে। এসব তোমরা পাবে কোথায় শুনি?

টুনি। ওই ভাঁড়ার ঘরে তো সব আছে। আমরা এক একজন

করে একটা একটা জিনিষ নিয়ে আসব। হ্যাঁ মা, আমরা পিঠে খাব।

ঝুনি। পিঠে খাব, পিঠে খাব বলে খুব তো লাফাচ্ছ, বলি ভাঁড়ার ঘরে ঢুকবে কেমন করে বলো দেখি?

মুনি। তাও তো বটে! ভাঁড়ার ঘরের পাশেই থাকে ভুলো আর কালো। এইয়া তাদের কান (হাত দিয়ে দেখাল) আর এতো বড় তাদের দাঁত! যদি দেখতে পায়?

ঝুমঝুম। ওরে বাপরে! দেখতে পেলে আর রক্ষে আছে? দাঁত দিয়ে টুক্‌রো টুক্‌রো করে ফেলবে। খবরদার! ভাঁড়ার ঘরের দিকে যাবে না।

মুনি। তার চেয়ে আয় না ওই রান্নাঘরের পেছনে কত ভাতের দানা পড়ে আছে খুঁটে খুঁটে খাই গিয়ে!

টুনি। যা-যা রোজ রোজ ওই একঘেয়ে জিনিষ খাওয়া যায় নাকি? আজ আমরা পিঠে খাব।

চুনি। বেশ, তবে সাহস করে আমার সঙ্গে আয়। চুপি চুপি আমরা ভাঁড়ার ঘরে ঢুকে পড়ি গে।

ঝুমঝুম। নাঃ, পিঠে খাওয়ার লোভে এরা শেষকালে কুকুর-বেড়ালের পেটেই যাবে দেখছি। শুধু ভুলো-কালো নাকি? ওই পুষি-মেনী—ওরা?

মুনি। ওরে বাবা! ভুলেই গেছিলাম—ওই পুষি আর মেনী: সব সময় ভাঁড়ার ঘরে ইঁদুর ধরে বেড়ায়! এইয়া ওদের গোঁফ আর ধারালো তাদের নখ—যদি দেখতে পায়?

চুনি। আঃ, মুনিটাকে নিয়ে আর পারা যায় না। অত ভয় করলে কি আর পিঠে খাওয়া যায়? থাক্ তুই মার ডানার তলায় বসে, আমরা চললাম।

টুনি। হ্যাঁ হ্যাঁ, চল্ চল্। আমরা লুকিয়ে যাব আর চুপটি করে নিয়ে চলে আসব।

কুনি। মুনি তাহ'লে যাবে না তো? তবে থাক্ আমরা যাই।

টুনি। ও কিন্তু তাহ'লে পিঠে পাবে না।

মুনি। না না আমি পিঠে খাব, আমিও যাব।

চুনি। তবে চলে আয়। কিন্তু ভয় পেয়ে কান্নাকাটি করা চলবে না। মা আমরা যাচ্ছি।

ঝুমঝুম। খুব সাবধানে যাবে।

টুনি। হ্যাঁ হ্যাঁ খুব সাবধানে যাব—তুমি দেখে নিও। চল্ চল্।

(সকলে চলে গেল)

ঝুমঝুম। ছানাগুলো এখন ফিরলে বাঁচি। কুকুর বেড়ালের পেটে ক'টাকে যেতে হয় কে জানে।

(হাঁসগিন্নী সোনামণি তার বাচ্চা বুলি, টুলি ও রুলিকে নিয়ে ঢুকলো)

সোনামণি। কি গো মুরগীগিন্নী, একা একা রোদে বসে কি এতো ভাবছ?

ঝুমঝুম। আর বলো কেন ভাই। বাচ্চাগুলোর জন্যে ভেবে মরছি।

সোনামণি। কেন? তারা কি করেছে?

ঝুমঝুম। এই দেখ না, তোমারও তো বাচ্চারা রয়েছে—আমার বাচ্চাদের মতো এমন আজে বাজে বায়না ধরছে কি এরা?

সোনামণি। তা তোমার বাচ্চারা আবার কি আজে বাজে বায়না ধরল?

ঝুমঝুম। মুরগীর ছানা হয়ে তাদের হ'ল পিঠে খাবার সখ!

বুলি। ওমা, পিঠে! কি ভালো খেতে। আমরা খেয়েছি।

সোনামণি। ওমা, তোরা আবার পিঠে খেলি কোথায়?

টুলি। কেন? ওই যে রন্টু ঝন্টুদের থালা ধোবার সময় রামু মাঠে

ফেলেছিল পিঠের টুকরো—আমরা তো তখনই খুঁটে খুঁটে খেয়ে দেখেছি। আঃ, কি ভাল খেতে।

সোনামণি। বটে বটে! তা পিঠে ওরা পাবে কোথায়?

ঝুমঝুম। তবে আর বলছি কি? পিঠে বানাবার জিনিষ আনতে ওরা গেছে ওই ভাঁড়ার ঘরে।

সোনামণি। ভাঁড়ার ঘরে? সর্বনাশ! ভাঁড়ার যে ভুলো কালো পাহারা দেয়! বাচ্চাদের ওখানে পাঠাতে আছে?

রুলি। আমরা পিঠে খাব মা।

সোনামণি। পিঠে খাওয়া সোজা কথা? দেখছিস মুরগীগিন্নীর বাচ্চাগুলো ময়দা চিনি আনতে গিয়ে ফিরছে না। বুঝলে মুরগীগিন্নি, ওদের ছেড়ে দিয়ে ভালো কাজ করনি। পিঠে খাবার লোভে ভাঁড়ারে গিয়ে এতক্ষণে হয়তো বেড়াল কুকুরের পেটে গিয়ে বসে আছে।

বুলি, রুলি ও টুলি। ওরে বাবা, আমরা পিঠে খাব না মা!

সোনামণি। এই তো লক্ষ্মী ছেলে-মেয়ের মতো কথা। চল চল এতক্ষণে বোধহয় ওদের ভাত নেবেছে। ফ্যানে ভাতে খাবে চল।

(সোনামণি ছানাদের নিয়ে চলে গেল)

ঝুমঝুম। হাঁসগিন্নীর কথা শোন! আমার বাচ্চারা কুকুর বেড়ালের পেটে গেছে? কেন যাবে? ওদের বুদ্ধি নেই? ওই হাঁসগিন্নীর ছানাগুলোর মতো ওরা বোকা নাকি?

দ্বিতীয় দৃশ্য

[ভাঁড়ার ঘর। নানা টিন ও থলের সারি। ভুলো আর কালো দরজার পাশে ঘুমোচ্ছে।]

(চুনি, মুনি, টুনি ও কুনি ঢুকলো)

চুনি। (ভুলো-কালোকে দেখতে না পেয়ে) চুপ্‌ চুপ্‌ খুব সাবধান! একদম আওয়াজ করবি না, শুনতে পেলেই ভুলো, কালো ছুটে আসবে।

মুনি। আজ ভুলো-কালো পাহারা দিচ্ছে না কেন রে?

টুনি। (মুখ ভেঙ্‌চে) নিচ্ছে না কেন রে? তোর অত খবরে দরকার কি? যা করতে এসেছিস করে—চল্‌ চট্‌পট্‌ পালিয়ে যাই।

কুনি। আমার যেন কেমন ভয় ভয় করছে। কাছাকাছি যদি থাকে, যদি দেখতে পায়?

চুনি। যদি দেখতে পায় তবে ঘাড় মটকে দেবে, এ তো জানা কথাই।

মুনি। ঘাড় মটকে দেবে! এঁ্যা এঁ্যা (কাঁদতে লাগল)।

টুনি। আহা, এতো ভালো ফ্যাসাদ। আগে দেখতে পাবে তবেই তো ঘাড় মটকাবে।

কুনি। তাই তো! অত ভয় পেলে চলে!

চুনি। তুই পিঠেও খাবি আবার ভয়ও পাবি? অত ভয় যদি তো যা মার কাছে ফিরে যা।

মুনি। না, আমি পিঠে খাব।

টুনি। তবে মুখ বুজে আয় জিনিষগুলো নিয়ে যাই।

কুনি। (ময়দার টিনের কাছে এসে) আমি বাবা ময়দা নিই।

(হাত ঢোকাতে গিয়ে ময়দার টিন উল্টে গেল, সেই শব্দে কালো ভুলোর ঘুম ভেঙ্গে গেল)

ভুলো। কে রে! কে রে? ভাঁড়ার ঘরে কে ঢুকেছে রে! (উঠে বসল)

চুনি। সর্বনাশ! ভুলো কালো দরজার পাশে শুয়ে আর আমরা দেখতেই পাই নি! আয় লুকাই।

(চুনি, কুনি, টুনি ও মুনি একটা থলের আড়ালে লুকিয়ে পড়ল)

কালো। চল্ তো ভুলো, দেখি কোথায় লুকিয়ে পড়ল সব। (এদিক ওদিক দেখতে লাগল)।

(আড়ালে দাঁড়িয়ে মুনি ভয়ে কেঁদে ফেলল)

মুনি। এঁ্যা এঁ্যা (কাঁদতে লাগল)।

চুনি। আঃ, চুপ্ চুপ্ শুনতে পাবে।

টুনি। আমারও ভয় করছে। এঁ্যা এঁ্যা (কাঁদতে লাগল)।

কুনি। আমারও কান্না পাচ্ছে। এঁ্যা এঁ্যা (কাঁদতে লাগল)।

চুনি। (তাদের থামাতে চেষ্টা করতে করতে) আহা কাঁদিস না, শুনে ফেলবে বলছি!

ভুলো। (কান পেতে শুনে) কালো!

কালো। (এদিক-ওদিক খুঁজতে খুঁজতে) কিরে ভুলো?

ভুলো। শুনতে পাচ্ছিস?

কালো। (কান পেতে শুনে) কে যেন কাঁদছে।

ভুলো। হ্যাঁ হ্যাঁ, ওই থলেটার কাছ থেকে শব্দ আসছে। আয় তো দেখি (কালো উঁকি মারল)

কালো। আরে দেখ্ দেখ্ ঝুমঝুম মুরগীর ছানাগুলো এসেছে।

ভুলো। এই কুচেছানার দল—এখানে কি করছিস দাঁড়া এখনই তোদের শেষ করছি।

টুনি, কুনি ও মুনি—(সমস্বরে)—এঁ্যা এঁ্যা এঁ্যা…

ভুলো। চুপ কর। আগে বল কেন এসেছিস ?

চুনি। ভুলোদাদা, ও ভুলোদাদা—

ভুলো। কি বলছিস বল্।

চুনি। আমরা পিঠে খাব।

কালো। পিঠে! সে আবার কি ?

চুনি। পিঠে জান না ? ময়দা মাখন আর চিনি দিয়ে বানায়।

ভুলো। বুঝেছি। [ও সব দিয়ে কি যেন একটা বানায়, না রে কালো ?

কালো। দুধ ময়দার জিনিষ! সে কি আমাদের মুখে দেবার জো আছে! মেনী আর পুষি সব সাবাড় করে রাখে আগে থাকতেই।

ভুলো। তা তোরা পিঠে খাবি কি রকম? কে বানাবে পিঠে ?

কুনি। আমাদের মা। এঁ্যা এঁ্যা (কাঁদল)।

কালো। দু'ত্তোর কেঁদে মরলি যে! তোদের মা পিঠে যে করবে তা জিনিষ-পত্তর পাবে কোথায় ?

চুনি। তাই তো নিতে এসেছিলাম এখানে। তোমরা পিঠে খাবে ভুলোদাদা, কালোদাদা ?

ভুলো ও কালো—(একসঙ্গে) আমরা পিঠে খাব!

টুনি। হ্যাঁ, পিঠে খাবে ? খুব ভাল খেতে। নারে চুনি ?

চুনি। হ্যাঁ খুব মিষ্টি খেতে। আমি খেয়ে দেখেছি।

ভুলো। কি রে কালো, খাবি পিঠে ?

কালো। দুধের পিঠে সে আবার কেমন তর ?

ভুলো। হ্যাঁ সে আবার কেমন তর! মাংসের পিঠে হয় না ? তা হলে বরং খেয়ে দেখা যায়।

চুনি। হ্যাঁ, খুব হয়। আমরা এখুনি গিয়ে মা'কে বলছি, মাংসের পিঠে করে দেবে তোমাদের জন্য। চল মুনি, কুনি, টুনি মা'কে গিয়ে বলিগে। আহা দাঁড়িয়ে রইলি কেন, চল। (ঠেলা দিয়ে এগিয়ে দিল) চল না, এখন না পালাতে পারলে আর রক্ষে নেই।

(সকলে দৌড়ে চলে গেল)

ভুলো। চলে গেল !

কালো। তাই তো চলে গেল !

ভুলো। বলি তুই যে বড় ওদের চলে যেতে দিলি ?

কালো। আমি দিলাম না তুই দিলি ? মাংসের পিঠে খাবার লোভে অমন কচি কচি মুরগীর ছানাগুলিকে ছেড়ে দিলি ! হায় হায়—(মাথায় হাত দিল)

ভুলো। আহা অত দুঃখ করিস কেন ? মাংসের পিঠেই বা মন্দ কি। দেখাই যাক্ না মুরগীগিন্নীর রান্নার হাতটা কেমন।

কালো। তা যা বলেছিস। মাংসের পিঠে তো কখনও খাইনি। খেয়ে দেখা যাক মন্দ কি।

ভুলো। চল বাগানে বার কয়েক দৌড়ে খিদেটাকে চাঙা করে নেওয়া যাক্।

কালো। সেই ভাল। চল বাগানে যাই।

(দুজন চলে গেল। অন্য দিক দিয়ে মেনী ও পুষি ঢুকলো)

মেনী। আয় পুষি, এখানে বেশ ফাঁকা আছে, একটু বসা যাক্।

পুষি। কালো ভুলোকে দেখছি না তো।

মেনী। বোধহয় বাগানে দৌড়োচ্ছে।

পুষি। পারেও বাবা এত দৌড়োতে।

মেনী। আহা দৌড়ে খিদে বাড়ায়। এসেই এত মাংস খাবে দেখিস্ (হাত দিয়ে দেখাল)।

পুষি। দূর, কি সুখে যে ওরা মাংসগুলো খায়! মাছ তার চেয়ে ঢের ভাল।

মেনী। সে আর বলতে। মাছের মুড়ো। উঃ কি জিনিষ। (কান পেতে শুনল) কার পায়ের শব্দ শুনছি যেন।

পুষি। (নাকে শুঁকে) তাই ত! মুরগী মুরগী গন্ধ কেন পাই।

মেনী। (আগ্রহে) ঝুমঝুমের ছানাগুলো আসছে না তো।

পুষি। আহা কচি মুরগীর ছানা কি ভাল খেতে।

মেনী। যদি আসে আজ একটাকে ধরতেই হবে। একবার ঘরে ঢুকুক না, খপ্ করে ধরে ফেলব।

(ধরবার ভঙ্গী করল)

পুষি। ধরবি কি করে? আমাদের দেখলেই তো পালাবে।

মেনী। দেখা দেব কেন। চল না ওই টিনটার পিছনে লুকিয়ে পড়ি।

(টিনের পিছনে লুকালে দরজা দিয়ে চুনি, মুনি, টুনি ও কুনি ঢুকলো)

চুনি। কালো ভুলো বাগানে গেছে এই বেলা আয় নিশ্চিন্তে জিনিষগুলো নিয়ে যাই।

মুনি। কিন্তু মেনী পুষি যদি এসে পড়ে।

টুনি। তাই তো বলছি তাড়াতাড়ি কর।

কুনি। হ্যাঁ হ্যাঁ জিনিষগুলো নিয়ে পালাই চল।

চুনি। আমি ময়দা নি। তোরা মাখন আর চিনি নে।

(ময়দার টিনের কাছে গেল। যেমনি ময়দা নিতে যাবে অমনি টিনের পিছন থেকে মেনী তার পা চেপে ধরল)

চুনি। টুনি, দেখতো আমার পা কে চেপে ধরল।

টুনি। (উঁকি মেরে কেঁদে উঠল) ওরে বাবা এ যে মেনী পুষি। চুনিকে খেয়ে ফেলল (এঁ্যা এঁ্যা করে কেঁদে উঠল)।

মেনী। এতদিন পর একটাকে ধরেছি। এই পুষি শিগ্‌গীর আয় একটাকে ধর।

পুষি। ধরবই তো। (ধরতে হাত বাড়ালো)

টুনি মুনি ও কুনি—(সমস্বরে) ওগো মাগো আমাদের খেয়ে ফেলল এঁ্যা এঁ্যা (কাঁদতে লাগল)।

চুনি। মেনীদিদি ও মেনীদিদি। একটা কথা শোন।

মেনী। কি কথা শুনবো আবার। এখন তোকে ধরব আর খাব।

চুনি। ধরেছ যখন তখন খাবেই তো। তার আগে পিঠেটা খেয়ে নাও না।

মেনী। পিঠে। সে আবার কি জিনিষ?

চুনি। ওমা, পিঠে কি জান না? ময়দা চিনি দুধ দিয়ে ঝণ্টুর মা বানায় সেই পিঠে।

পুষি। হ্যাঁ হ্যাঁ আজ বানিয়েছিল। আহা বড্ড ভাল খেতে।

মেনী। তা সে পিঠে পাব কোথায় শুনি?

মুনি। আমার মা বানাবে।

মেনী। বটে! তোদের মা বানাবে?

টুনি ও কুনি। (একসঙ্গে) বানাবেই তো।

চুনি। সেইজন্যেই তো ময়দা চিনি দুধ নিতে ভাঁড়ার ঘরে এসেছি।

কুনি। মেনীদিদি চুনিকে ছেড়ে দাও। মা পিঠে বানালে তোমাদের দেব।

মেনী। কি রে পুষি? খাবি নাকি পিঠে?

পুষি। তা খেয়ে দেখলে মন্দ হয় না। গিন্নীর পিঠেয় কম পড়েছিল। আমাদের জন্যে মোটেই ছিল না। আমি বাটিটা একটু

চেটে দেখেছি (চাটবার ভঙ্গী করল) আঃ ক্ষীর ক্ষীর মিষ্টি মিষ্টি কি ভাল খেতে।

মেনী। (চুনিকে) তোদের মা সত্যি পিঠে বানাবে ?

চুনি। সত্যি বানাবে। তুমি আমার পাটা ছেড়ে দাও, আমরা জিনিষগুলো নিয়ে যাই। মা বলেছে দুধের ক্ষীর করে তাতে ময়দা চিনি দিয়ে সুন্দর পিঠে করবে।

পুষি। (ঠোঁট চাটতে চাটতে) ছেড়ে দে ছেড়ে দে মেনী। মুরগীর ছানা তো ঢের খেয়েছি। আজ একটু পিঠেই খেয়ে দেখা যাক্।

চুনি। তবে আমরা ময়দা চিনি নিয়ে যাচ্ছি ?

মেনী। (তার পা ছেড়ে দিয়ে) যা তবে নিয়ে। পিঠে চাই কিন্তু আমাদের। মাকে বলে দিবি ভাল করে বানায় যেন।

পুষি। আমরা কিন্তু একটু পরেই আসব।

মেনী। চল তো পুষি গিন্নীর পিঠের বাটিটা একটু চেটে দেখি গিয়ে পিঠের স্বাদটা কেমন।

পুষি। সেই ভাল। আমরা যাই। ঝুমঝুম ততক্ষণ পিঠে বানাক। এই ছানাগুলো, চট্‌পট্ জিনিষ নিয়ে যা। আমরা বেশী দেরী করতে পারব না কিন্তু। চল মেনী।

(মেনী পুষি চলে গেল)

মুনী। (হাততালি দিয়ে) কি মজা! কি মজা! কালো ভুলোও খেল না, মেনী পুষিও খেল না।

সকলে। (সমবেত) কি মজা। কি মজা।

তৃতীয় দৃশ্য

[বাড়ীর পাঁচিলের পাশে। মাঝে ঝুমঝুম ও চারিদিকে গোল হয়ে ছানারা বসে। ঝুমঝুম পিঠে ভাগ করে দিচ্ছে, মুনি, কুনি, চুনি আর টুনি মনের আনন্দে পিঠে খাচ্ছে।]

টুনি। আঃ বড় ভাল পিঠে হয়েছে। আর দুটো দাও না মা খাই।

চুনি। সব পিঠে আবার খেয়ে ফেলিস না—ভুলোদাদা আর কালাদাদার কথা মনে রাখিস।

কুনি। আর মেনীদিদি, পুষিদিদি!

ঝুমঝুম। ভুলোদাদা, কালোদাদা! মেনীদিদি, পুষিদিদি! ওদের কথা কেন?

চুনি। বারে! ওরা যে খেতে আসবে।

টুনি। ভুলোদাদার মাংসের পিঠে—সে তো বানানোই হয় নি।

ঝুমঝুম। এ সব তোরা আগে বলিসনি কেন? আর পিঠে আছে নাকি?

চুনি। ইস্, পিঠে খাবার লোভে সব ভুলে গেছি। আর পিঠে নেই?

ঝুমঝুম। কি করে থাকবে, তোমরা সব খেয়ে ফেললে।

মুনি। পিঠে নেই! তবে কি হবে! এঁ্যা এঁ্যা (কাঁদতে লাগল!)

চুনি। থাম্ থাম্ ভাবতে দে কি করা যায়।

ঝুমঝুম। কি আর করবে। কুকুর বেড়াল ছিঁড়ে খাবে। তখন বুঝবে মজা। হায় হায় কি হল……(মাথায় হাত দিয়ে বসল)

(সোনামণি ও তার ছানাদের প্রবেশ)

সোনামণি। ওমা ঝুমঝুম, এই তো তোমার বাচ্চারা এসে গেছে। কি রে পিঠে খেলি তোরা ?

ঝুমঝুম। খেল বৈকি। পিঠে খেল, এবার পেটে যাবে।

সোনামণি। কেন ? কেন ?

ঝুমঝুম। যাকে যেখানে পেয়েছে, পিঠে খাবার নেমন্তন্ন করে এসেছে—অথচ একটা পিঠেও আর নেই।

সোনামণি। কাকে আবার নেমন্তন্ন করে এল ?

চুনি। ময়দা মাখন চিনি আনতে গিয়েছিলাম—কালোদাদা আর ভুলোদাদা খেতে এল—তাই তো তাদের পিঠে খাবার নেমন্তন্ন করে এসছি।

মুনি। আর মেনীদিদি পুষিদিদি তাদেরও তো বলে এলে।

চুনি। বললাম তো—নইলে আঁচড়ে কাম্‌ড়ে দিত না শেষ করে

ঝুমঝুম। কিন্তু এখন উপায় ?

সোনামণি। যেমন পিঠে খাবার লোভ—এখন বোঝ ঠেলা।

বুলি। (পিঠের বাটিতে হাত বুলিয়ে) উঃ কি সুন্দর ! মা আমরাও পিঠে খাব।

সোনামণি। আহা পিঠে খাবার মজাটা দেখছ না। আবার পিঠে খাবে। ওই দেখ কালো ভুলো আসছে।

বুলি, রুলি ও টুলি—ওরে বাবা, কালো ভুলো আসছে। (মায়ের পিছনে লুকোল)

চুনি। এই তোরা ভয় পেয়ে যাস্‌ না—সব ঠিক দাঁড়িয়ে থাক। পালালেই মরবি।

মুনি। কি হবে ! এ্যাঁ এ্যাঁ...

চুনি। মুনিটা বড় ছিচ্‌কাঁদুনী। চুপ কর না। দেখতে দে ওরা কি বলে।

(ভুলো ও কালো ঢুকলো)

ভুলো। কই মুরগী-গিন্নী কোথায় ?

কালো। এই যে ঝুমঝুম—কই পিঠে আন খাই।

ভুলো। আহা দাঁড়িয়ে রইলি কেন সব হাঁ করে ? আসন দিবি তো বসতে ! নে চুনি আসন দুটো পেতে দে বসি।

(চুনি আসন পেতে দিল)

ভুলো। (বসে) দে দে দু গ্লাস জল দে। এই ঝুমঝুম আনো তোমার পিঠে।

কালো। আগে মাংসের পিঠেগুলো আনো। আগে নোনতা খাই, তারপর মিষ্টি খাব। কি দাঁড়িয়ে কেন, যাও !

(ঝুমঝুম চলে গেল)

ভুলো। (সোনামনিকে দেখে) আরে, হাঁসগিন্নী যে ! তোমারও বুঝি পিঠে খাওয়ার নেমন্তন্ন ? বোসো, আগে আমরা খেয়ে কটা থাকে দেখ।

চুনি। ভুলোদাদা !

ভুলো। কিরে, কি বলছিস ?

চুনি। মাংসের পিঠে……

কালো। হ্যাঁ, মাংসের পিঠে—তা কি হল ? মুখটা অত কাঁচু-মাচু কেন ?

চুনি। পুষিদিদি আর মেনীদিদি না…

ভুলো। (রেগে উঠে দাঁড়াল) পুষিদিদি, মেনীদিদি কি ? বল না ছাই—

মুনি। পুষিদিদি মেনীদিদি (ভ্যাঁ ভ্যাঁ করে কেঁদে ফেলল)

কালো। এ আচ্ছা জ্বালা ত ! বলি কাঁদিস কেন ? বলবি তো কি হল !

ভুলো। এটা বুঝছিস না? ওহে মেনী পুষি এসে মাংসের পিঠেগুলো সব খেয়ে গেছে। ওরা ভয়ে বলতে পারছে না।

কালো। উঃ কি আস্পর্দা দেখেছ! ওদের সাহস যে কি বেড়েছে তা আর বলবার নয়।

ভুলো। দাঁড়াও না। মজা দেখাচ্ছি।

(মেনী পুষি এসে ঢুকল)

মেনী। কই রে তোদের পিঠে কোথায়?

ভুলো। বটে! একবার খেয়ে সাধ মেটেনি আবার এসেছ।

পুষি। এই যে ভুলো কালো তোরা এখানে কি করছিস? চুনি আমার পিঠে কোথায়?

চুনি। তোমার মিষ্টি পিঠের কথা বলছ পুষিদিদি?

পুষি। হ্যাঁ! কেন বল তো? এই ভুলো কালো বুঝি সব পিঠে খেয়ে ফেলেছে?

ভুলো। ওঃ মাংসের পিঠে খেয়ে গিয়ে আবার এসেছে মিষ্টি পিঠে খেতে! দাঁড়াও খাওয়া বার করছি।

মেনী। পুষি, আস্পর্দাটা দেখেছিস ভুলোটার! আমাদের পিঠেগুলো সব খেয়ে আমাদের সঙ্গেই ঝগড়া করতে এসেছে! আয় দেখি তোদের সাহস। (মেনী ঘুঁষি বাগাল। পুষি পাশ থেকে ফোঁস ফোঁস করতে লাগল)।

কালো। ভুলোদাদা, এরা যে তেড়ে আসে রে! দাঁড়া তোদের দেখাই মজা।

পুষি। আয় দেখি।

ভুলো। আয় দেখি।

(চার জনে প্রচণ্ড মারামারি করতে লাগল। মুনি, টুনি, কুনি ও ও রুলি টুলি ও বুলি সমস্বরে কাঁদতে লাগল)।

(রন্টু ঝন্টু দৌড়ে এল লাঠি হাতে)

রন্টু। কি ব্যাপার! এত গণ্ডগোল কেন?

ঝন্টু। এই দেখ, এরা কি রকম ঝগড়া লাগিয়েছে।

রন্টু। ঝুমঝুম আর সোনামণির ছানাগুলোকে খাবার মতলব!

ঝন্টু। দাঁড়া তোদের লোভের সাজা দিচ্ছি।

(লাঠি দিয়ে মারতে মারতে চারজনকে নিয়ে গেল)

চুনি। বাবাঃ, হাফ ছেড়ে বাঁচলাম! ওমা! মা! দেখ এসে কি মজা হয়েছে।

রুলি, বুলি ও টুলি। (মায়ের পিছন থেকে বেরিয়ে) ওমা ওরা পিঠে খেল—পেটে গেল না তো!

(ঝুমঝুম ঢুকলো)

ঝুমঝুম। সাবাস আমার বাচ্চারা! পিঠে খেল পেটে গেল না।

(গান)

চুনির দল। পিঠে খেলাম, পেটে গেলাম না—

রুলি, বুলি, টুলি। (হায় হায়) সাহস নেই তাই পিঠে পেলাম না।

চুনির দল। পিঠে খাবি?

রুলির দল। হ্যাঁ পিঠে খাব।

চিনি ময়দা আনতে যাব।

চুনির দল। মেনী, পুষি, কালো ভুলো?

রুলির দল। কেয়ার করব না।

চুনির দল। পিঠে খেলাম, পেটে গেলাম না!

রুলির দল। (হায় হায়) সাহস নেই তাই পিঠে পেলাম না।

————

রুদ্রপ্রসাদ চক্রবর্তী

প্রমিথিউস বন্দী হলেন

চরিত্রলিপি

প্রথম দেবদূত	সেনাপতি
দ্বিতীয় দেবদূত	যুদ্ধরাজ
দেবরাজ	যন্ত্ররাজ
প্রমিথিউস	প্রথম অনুচর
কণিষ্ক	বণিকরাজ
পরাশর	হরিপদ

[স্বর্গের রাজসভা। দেবরাজকে গোমড়া মুখে সিংহাসনে বসে থাকতে দেখাযাবে। দেবদূতেরা করজোড়ে সিংহাসনের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন। দুজন দেবদূত কানে কানে কি যেন বলাবলি করছেন। প্রথম দেবদূত কিছুটা সামনে এগিয়ে এসে বলবেন]

প্রথম দেবদূত। হে স্বর্গবাসি দেবগণ, একটা বিশেষ জরুরী প্রয়োজনে আপনাদের এই সভায় আহ্বান করা হয়েছে। আপনারা দেবরাজকে গম্ভীর দেখে নিশ্চই বুঝতে পেরেছেন আমাদের দেবরাজ খুব রেগে গেছেন! অবশ্যই রাগের কারণ আছে।

আপনারা জানেন, একদিন তিনি প্রমিথিউসকে আদেশ করেছিলেন—"যাও প্রমিথিউস মানুষ তৈরী কর।" তাঁর আদেশে প্রমিথিউস পৃথিবীতে গিয়ে মানুষ তৈরী করল। আর সেই মানুষের জন্যে স্বর্গ থেকে নিয়ে গেল আগুন। হ্যাঁ, আগুন, দেবরাজকে লুকিয়ে গোপনে। এই আগুন হাতে পেয়ে মানুষ হ'ল সভ্য, মানুষ হ'ল শক্তিমান, ঠিক দেবতার মতো। দেবরাজ সে কথা জানতে পেরে প্রমিথিউসকে দিলেন কঠিন শাস্তি। সেই শাস্তির কথা ভাবলে আমাদের গায়ে কাঁটা দেয়।

দেবরাজ। আঃ থামো, ওসব কথা দেবতারা জানে। (দ্বিতীয় দেবদূতকে উদ্দেশ্যকরে) দেবদূত!

দ্বিতীয় দেবদূত। আদেশ করুন প্রভু।

দেবরাজ। প্রমিথিউস এখনো আসছেনা কেন?

দ্বিতীয় দেবদূত। আপনার আদেশে চারজন দেবদূত তাকে ধরে আনতে চলে গেছে প্রভু।

প্রথম দেবদূত। আমার মনে হয় প্রমিথিউস ককেশাস পর্বতের সেই অন্ধকার গুহাটার মধ্যে ঘুমিয়ে পড়েছে। আপনার আদেশে একদিন কোথায় যেন যাচ্ছিলাম, কানে এল নাক ডাকার সে কি আওয়াজ! ঘড়র ঘঁাই ঘড়র ঘঁাই—।

দেবরাজ। আঃ, তুমি থামবে দেবদূত!

দ্বিতীয় দেবদূত। ওই তো প্রমিথিউস আসছে। নিশ্চই ঘুমচ্ছিল; এখনও হাই তুলছে।

[প্রমিথিউসের প্রবেশ]

প্রমিথিউস। (হাই তুলে) দেবরাজের জয় হোক! আমাকে ডেকেছেন প্রভু?

দেবরাজ। সেই কোন সকালে তোমার কাছে দূত পাঠিয়েছি—আসতে তুপুর হয়ে গেল ?

প্রমিথিউস। (হাই তুলে) ঘুমিয়ে পড়েছিলাম দেবরাজ। আজ কতকাল ধরে ঘুমোচ্ছি কে জানে। ওরা গিয়ে নাকে কানে শুড়শুড়ি না দিলে আরও কত হাজার বছর ধরে ঘুমতুম কে জানে।

দেবরাজ। কাজের মধ্যে তো কেবল ঘুম আর ঘুম। সেই একবার মানুষ তৈরী করার কাজ করেছ—অবশ্য তার সঙ্গে করেছ একটি অপকর্ম। স্বর্গ থেকে আগুন চুরি করে মানুষের হাতে দিয়ে এসেছ।

প্রমিথিউস। আগুন না পেলে মানুষ যে সভ্য হ'ত না প্রভু !

দেবরাজ। সভ্য না হলে—না হত—

প্রমিথিউস। সভ্য না হলে মানুষ কাঁচা মাংস খেত। দিনরাত নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি করত। আজ মানুষ কত সভ্য, আমার হাতে পুতুলের মতো তৈরীকরা মানুষ—আজ দেবতা হয়ে উঠেছে !

দেবরাজ। আর তোমার দেবতার মতো সেই সভ্য মানুষ আজ নিজেদের মধ্যে মারামারি কাটাকাটি ছাড়া আর কিছুই করেনা। এক একজন সত্যি দেবতার মতো হয়ে ওঠে, কিন্তু তাদের শক্তিকে লক্ষ লক্ষ মানুষ ব্যবহার করে ধ্বংসের কাজে। তখন অমৃত হয়ে ওঠে বিষ।

প্রমিথিউস। ওঃ একি ভয়ঙ্কর কথা প্রভু আমি যে সহ্য করতে পারছি না !

দেবরাজ। অথচ আমাকে দিনের পর দিন এই ধ্বংসের লীলা চোখে দেখতে হচ্ছে, সহ্য করতে হচ্ছে। ওঃ প্রমিথিউস, কি করলে !

অন্ধস্নেহে ভুলে স্বর্গের আগুন চুরি করে দিয়ে এলে মানুষের হাতে!

প্রমিথিউস। আমি ওদের মঙ্গল চেয়েছিলাম প্রভু! কিন্তু ওরা যখন নিজেদের মঙ্গল চায় না তখন আমার সৃষ্টিকে আপনি ধ্বংস করুন।

দেবরাজ। না-না প্রমিথিউস অত সহজে তুমি রেহাই পাবেনা। এর জন্যে তোমাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।

প্রমিথিউস। শাস্তি তো অনেক দিয়েছেন প্রভু, আজও চোখ বন্ধ করলে ককেশাস পর্বতের সেই শকুনটাকে আমি দেখতে পাই। কালো ডানায় চারিদিক অন্ধকার করে দিয়ে আমার শরীরের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবার জন্যে উড়ে আসছে। এবার শাস্তি কি তার চেয়েও কঠিন?

দেবরাজ। হ্যাঁ—তার চেয়েও কঠিন! (একজন দেবদূতকে উদ্দেশ্যকরে)। দেবদূত!

দ্বিতীয় দেবদূত। আদেশ করুন প্রভু!

[দেবরাজ তাকে ইঙ্গিতে কি যেন আনতে বললেন। দেবদূত নিয়ে এলেন একটি নেভানো মশাল।]

দেবরাজ। এই মশাল হাতে নাও প্রমিথিউস!

প্রমিথিউস। (মশাল হাতে নিয়ে) নিলাম মশাল। এখন কি করতে হবে?

দেবরাজ। এই মশাল হাতে নিয়ে তুমি পৃথিবীতে যাও,—যে আগুন একদিন স্বর্গ থেকে চুরিকরে নিয়ে গিয়েছিলে সেই আগুন তোমাকেই স্বর্গে ফিরিয়ে আনতে হবে।

প্রমিথিউস। ওঃ কি ভীষণ আদেশ প্রভু! এর চেয়ে আমাকে অন্য কোন শাস্তি দিন দেবরাজ, আমি মাথা পেতে নেব, কিন্তু

আমার নিজের হাতে তৈরী করা মানুষ আবার অসভ্য পশু হয়ে যাবে, তা আমি সহ্য করতে পারবনা। তার চেয়ে আর একটা ভয়ঙ্কর শকুন তৈরী করুন, সে এসে আমার শরীরের মাংস ছিঁড়ে খাক—সহ্য করব—কিন্তু মানুষের হাত থেকে আগুন—সভ্যতার প্রদীপ—আমি ছিনিয়ে আনতে পারব না।

দেবরাজ। (রেগে) একাজ তোমাকেই করতে হবে প্রমিথিউস। কারণ আগুন তুমিই চুরি করে দিয়েছ—আর কেউ নয়!

প্রমিথিউস। বেশ, আপনার আদেশে আমি মানুষের কাছ থেকে আগুন আনতে চললাম। কিন্তু এর চেয়ে অন্য কোন কঠিন শাস্তি আমার কাছে সহজ বলে মনে হ'ত।

দেবরাজ। দাঁড়াও প্রমিথিউস! দেবদূতেরা মানুষের অসংখ্য অপরাধের কাহিনী লিখে রেখেছে, সঙ্গে নিয়ে যাও। এই সব কাহিনী পাঠ করলে তুমি নিজেই বুঝতে পারবে মানুষের হাতে আগুন দিয়ে তুমি কি ভুল করেছ। দেবদূত!

[দেবরাজের ইঙ্গিতে একজন দেবদূত প্রমিথিউসের হাতে একটি খেরো বাঁধানো খাতা দেবেন। এক হাতে খাতা, অন্য হাতে মশাল নিয়ে প্রমিথিউস চলে যান। মঞ্চ অন্ধকার। আলো জ্বললে দেখা যাবে পৃথিবী। একটা বেদীর ওপরে বসে আছেন প্রমিথিউস।]

প্রমিথিউস। আজ ক'দিন হ'ল পৃথিবীতে এসেছি। ঘুরেছি পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে অন্য প্রান্ত। দেখেছি দু'চোখ ভরে মানুষ। আমার নিজের হাতে পুতুলের মতো তৈরী করা মানুষ—স্নেহের, বড় আদরের। তবু জানি এই মানুষের কাছ থেকেই আমাকে আগুন নিয়ে যেতে হবে। ওই যে দু'টি ছেলে এদিকে আসছে, ওদের সঙ্গে একটু কথা বলে দেখি।

[কণিষ্ক আর পরাশরের প্রবেশ। ওরা প্রমিথিউসকে দেখে একটু থমকে দাঁড়াল।]

কণিষ্ক। বুড়োলোকটা কে বল তো পরাশর ?

পরাশর। আমিও তো তাই ভাবছি। দেখে মনে হয় অনেককাল আগের মানুষ। হঠাৎ যেন ঘুম থেকে উঠে এসেছে।

প্রমিথিউস। এই শোন শোন, তোমরা কোথায় যাচ্ছ ?

কণিষ্ক। আমরা খেলতে যাচ্ছি। তুমি কে বল তো ?

প্রমিথিউস। আমাকে চিনতে পারলেনা, আমি প্রমিথিউস।

পরাশর। প্রমিথিউস! সেই যে দেবরাজের আদেশে প্রথম মানুষ সৃষ্টি করেছিল। আর চুরি করে এনে দিয়েছিল আগুন ?

কণিষ্ক। তার জন্মেই দেবরাজ তোমাকে দিয়েছিলেন কঠিন শাস্তি!

প্রমিথিউস। সে শাস্তি কি ভীষণ তোমরা কল্পনা করতে পারবে না বালক।

পরাশর। জানি, রোজ একটা শকুন এসে তোমার শরীরের মাংস ছিঁড়ে ছিঁড়ে খেত। তারপর একদিন মহাবীর হারকিউলিস সেই শকুনটাকে বধ করে তোমাকে উদ্ধার করেন।

প্রমিথিউস। হ্যাঁ—হারকিউলিস। ধন্য সেই বীর, তার জন্মে আমি গর্ব বোধ করি।

পরাশর। কিন্তু এতদিন পরে তুমি আবার পৃথিবীতে এসেছ কেন প্রমিথিউস ?

প্রমিথিউস। কারণ দেবরাজ আমাকে আর একটা কঠিন শাস্তি দিয়েছেন।

কণিষ্ক। কি সেই শাস্তি ?

প্রমিথিউস। স্বর্গের চুরি করা আগুন আবার আমাকেই ফিরিয়ে নিয়ে যেতে হবে।

পরাশর। সেকি! আগুন হ'ল সভ্যতা, সেই আগুন তুমি ফিরিয়ে নিয়ে যাবে?

প্রমিথিউস। হ্যাঁ, দেবরাজের আদেশ।

কণিষ্ক। কেন প্রমিথিউস?

প্রমিথিউস। মানুষকে সভ্য করে আমি খুব ভুল করেছি বালক। এখন সেই ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করব।

পরাশর। তোমার কথা ঠিক বুঝতে পারছিনা প্রমিথিউস, আমাদের বুঝিয়ে বল।

প্রমিথিউস। সত্যি তোমরা জানতে চাও?

কণিষ্ক ও পরাশর। আমরা জানতে চাই প্রমিথিউস। কি অপরাধে আমরা তোমার দেওয়া আগুন হারাব!

প্রমিথিউস। বেশ, তাহলে এই ডাইরীটা পড় তাহলেই বুঝতে পারবে।

কণিষ্ক। এতে কি আছে?

প্রমিথিউস। এতে আছে দেবদূতের তৈরী করা মানুষের ইতিহাস। নাও পড়! আমি ততক্ষণ আর একবার পৃথিবীটা ঘুরে আসি।

[বালকেরা দেবদূতের ডাইরী নিয়ে মঞ্চের একান্তে গিয়ে সেই বেদীর উপর বসবে এবং পড়তে আরম্ভ করবে। সঙ্গে সঙ্গে সেদিকটা অন্ধকার হয়ে অন্যপ্রান্তে জ্বলে উঠবে আলো। সেই আলোয় দেখা যাবে যুদ্ধের পোষাক পরা একটা লোক দেবরাজের সিংহাসনে বসে আছে। চারিদিকে যুদ্ধের সাজপরা অনুচরগণ।]

যুদ্ধরাজ। সেনাপতি, যন্ত্ররাজকে সংবাদ দিয়েছ?

সেনাপতি। সংবাদ তো কখন দিয়েছি মেশো!

যুদ্ধরাজ। আবার মেশো! তোমায় না বলেছি আমাকে আর মেশো মেশো বলে ডেকোনা। আমি হলুম যুদ্ধরাজ! তাই আমাকে বলবে যুদ্ধরাজ।

সেনাপতি। হ্যাঁ-হ্যাঁ মহারাজ! আসলে ব্যাপারটা কি জানেন, গ্রাম সম্পর্কে আপনি তো আমার মেশো তাই মহারাজ বলতে গিয়ে মুখ ফসকে বলে ফেলি—মেশো।

যুদ্ধরাজ। এত করে বলি, সেনাপতি খাওয়াটা একটু কমাও—ভুঁড়ির সঙ্গে সঙ্গে তোমার বুদ্ধিটাও মোটা হচ্ছে।

সেনাপতি। খাওয়া কমাতে কমাতে রোগা হয়ে যাচ্ছি মেশো—থুড়ি মহারাজ। আর ওদিকে নজর দেবেন না।

প্রথম অনুচর। ওই যে যন্ত্ররাজ, এসে গেছেন।

যন্ত্ররাজ। মহারাজের জয় হোক!

যুদ্ধরাজ। এসো এসো যন্ত্ররাজ, তোমার পথ চেয়ে বসে আছি।

যন্ত্ররাজ। আদেশ করুন মহারাজ!

যুদ্ধরাজ। তুমি তো জানো যন্ত্ররাজ, এবংপুরের সঙ্গে আমার অনেক দিনের শত্রুতা?

যন্ত্ররাজ। জানি মহারাজ! এবংপুর জয়ের ইচ্ছা আপনার অনেক দিনের। কেবল—

যুদ্ধরাজ। কেবল তোমার মত সুদক্ষ যন্ত্ররাজ আমার ছিল না তাই এতদিন এবংপুর জয় করা হয়নি। যন্ত্ররাজ, তোমাকে আমি এক লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা দেব—এমন এক অস্ত্র তৈরী করে দাও যার আঘাতে সমস্ত এবংপুর পুড়ে ছারখার হয়ে যায়।

যন্ত্ররাজ। এ আর এমন কি শক্ত কাজ মহারাজ! কেবল টাকার অঙ্কটা আর একটু বাড়িয়ে দিন, দেখবেন এমন অস্ত্র তৈরী করে দেব যে শুধু এবংপুর কেন সারা পৃথিবীটাই ধ্বংস হয়ে যাবে।

যুদ্ধরাজ। সেনাপতি! শুনলে তো কথাটা। সাধে কি ওর নাম দিয়েছি যন্ত্ররাজ। বলে কিনা সারা পৃথিবীটাই ধ্বংস করা

যাবে। তাহলে—তাহলে আমি হ'ব পৃথিবীর রাজা। ওরে, কে আছিস আনন্দের বাজনা বাজা, আনন্দের বাজনা বাজা।

[যুদ্ধের বাজনা বেজে ওঠে। বাজনা থামলে]

এমন অস্ত্র তৈরীর কৌশল তুমি কেমন করে আবিষ্কার করলে যন্ত্ররাজ ?

যন্ত্ররাজ। ওকথা বলে আমাকে লজ্জা দেবেন না মহারাজ। কৌশল আমার নয়। কৌশল টৌশল আবিষ্কার করেছেন বুড়ো হাবড়া বৈজ্ঞানিকগুলো—বলে কিনা ভাল কাজ হবে, মানুষের কল্যাণ হবে। আমি মহারাজ ও সব কল্যাণ টল্যাণ বুঝিনা। ওরা আগুন জ্বেলে গেল আর আমি সেই আগুন ধরিয়ে দিলুম শত্রুর ঘরে।

যুদ্ধরাজ। যন্ত্ররাজ! তোমাকে আমার যন্ত্রেশ্বর বলে ডাকতে ইচ্ছে করছে। আজ থেকে তুমি হলে যন্ত্রেশ্বর। ওরে কে আছিস, আনন্দের বাজনা বাজা।

[আবার যুদ্ধের বাজনা বেজে ওঠে]

[মঞ্চের আলো এসে পড়বে কণিষ্ক এবং পরাশরের উপর। অন্যপ্রান্ত তখন অন্ধকার।]

কণিষ্ক। সত্যিই রে পরাশর, আমরা বিজ্ঞানকে ঠিক কাজে লাগাতে পারিনি।

পরাশর। আমাদের সায়েন্সের টিচার অশোকবাবুও সেই কথা বলবেন। আলফ্রেড্ নোবেল ডিনামাইট আবিষ্কার করেছিলেন—মানুষ পাহাড় ভেঙে রাজপথ তৈরী করবে বলে, আর—

কণিষ্ক। আর আমরা তাকে ব্যবহার করেছি মানুষ মারার কাজে।

পরাশর। দেবদূতের ডাইরীতে এদেরই নাম যুদ্ধরাজ আর যন্ত্ররাজ। পাতা ওল্টা আর একটু পড়ি।

[ডাইরীর পাতা ওল্টায়। সঙ্গে সঙ্গে অন্ধকার হয়ে মঞ্চের অন্যপ্রান্তে জ্বলে ওঠে আলো। যুদ্ধরাজের সিংহাসনে বসে আছেন একজন ব্যবসাদার, হাতে টাকার থলি। পাশে দুজন অনুচর।]

বণিকরাজ। যাও তো হরিপদ, ওষুধের ফাইলটা নিয়ে এসো দেখি, কেমন হ'ল।

[হরিপদর প্রস্থান]

বুঝলে ভূতনাথ, এবার বাজারে এমন ওষুধ ছাড়ব যে আসলটাকেই মনে হবে নকল আর আমার ওষুধ চলবে আসল বলে।

[ওষুধ হাতে হরিপদর প্রবেশ]

হরিপদ। নিন স্যার—টেরা টেস্‌কামিন!

বণিকরাজ। বা-বা-বা এক নম্বর—অরিজিনাল। কালকেই এটা বাজারে ছাড়ব। ভালোয় ভালোয় উতরে গেলে বেবিফুডের কারবারে হাত দেব। হরিপদ!

হরিপদ। আজ্ঞে স্যার!

বণিকরাজ। বেশ মোটাসোটা একটা বাচ্চার ছবি তুলে রেখো। ফুডের কৌটোয় সেঁটে দিতে হবে। নাম দেব…নাম দেব শোটা। বেবিফুড শোটা খেলে হবে মোটা। [এর পর একত্রে সুর করে বলতে থাকবে]

বেবিফুড শোটা খেলে হবে মোটা।

[এমন সময় মশাল হাতে আসবেন প্রমিথিউস। কোরাস থামবে।]

বণিকরাজ। এখানে এলে কেমন করে? কে তুমি?

প্রমিথিউস। আমাকে চিনতে পারলে না বণিকরাজ, আমি হলাম প্রমিথিউস।

বণিকরাজ। প্রমিথিউস—প্রমিথিউস আবার কে? (অনুচরদের প্রতি) তোমরা কেউ একে চেনো?

[অনুচরগণ নীরবে মাথা নাড়ে]

প্রমিথিউস। আমি কে? যে তোমাদের স্বর্গ থেকে সভ্যতার আগুন এনে দিয়েছে। একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখতো চিনতে পার কিনা।

বণিকরাজ। আমি তোমাকে চিনিনা—কোনদিন দেখিনি—দেখতেও চাই না।

হরিপদ। (কানে কানে) আমার মনে হয় স্যার বুড়োটা পুলিশের চর। টিকটিকি!

বণিকরাজ। (কানে কানে) আমারও তাই মনে হয়। দাঁড়াও, একবার ভাল করে বাজিয়ে দেখি। তেমন তেমন বুঝলে টাকা দিয়ে মুখ বন্ধ করতে হবে। মিঃ প্রমিথিউস, আপনার হাতে ওটা কি?

প্রমিথিউস। মশাল! স্বর্গীয় মশাল!

বণিকরাজ। ওটা দিয়ে কি করবেন?

প্রমিথিউস। আগুন নিয়ে যাব। মানুষ—তুমি আগুন নিয়ে খেলা শুরু করেছ। (সহসা আবেগ রুদ্ধ কণ্ঠে) এই জন্যেই কি হাজার হাজার বছর ধরে আমি শকুনির চঞ্চুবিদ্ধ হবার জ্বালা সহ্য করেছি! ককেশাস পর্বতের সেই অন্ধকার গুহা আজও আমার চোখের জলে আর রক্তে পিছল হয়ে আছে।

[সকলে একত্রে করতালি দিয়ে ওঠে]

সকলে। আবার বলুন, আবার বলুন।

বণিকরাজ। (হরিপদকে কাছে ডেকে কানে কানে) মনে হচ্ছে, লোকটা এককালে ভালো অভিনেতা ছিল এখন পাগল

হয়ে পথে পথে অভিনয় করে বেড়ায়। দেখছ না, কথা বলার মধ্যে কেমন একটা এ্যাকটিং এ্যাকটিং ভাব আছে।

প্রমিথিউস। কি, আমি পাগল! হ্যাঁ-হ্যাঁ পাগল, তা না হলে স্বর্গের আগুন চুরি করে তোমাদের হাতে এনে দেব কেন?

বণিকরাজ। তখন থেকে কি স্বর্গের আগুন-আগুন করছেন মশাই। এই দেখুন আগুন আমরা পকেটে নিয়ে ঘুরে বেড়াই।

(পকেট থেকে লাইটার বের করে জ্বালাল)

প্রমিথিউস। ওরে মূর্খ, যে আগুন না পেলে ওই আগুনকে হাতের মুঠোয় বন্দী করা যেত না—সেই আগুন—আমি—এই প্রমিথিউস তোমাদের জন্যে এনেছিলাম। কিন্তু আর নয়, এই মশালে স্বর্গের আগুন তুলে নিয়ে আমি ফিরে যাব।

[অন্ধকার। কণিষ্ক আর পরাশরের উপর আলো এসে পড়ল। অন্য প্রান্ত অন্ধকার।]

কণিষ্ক। কি ভাবছিস পরাশর?

পরাশর। তুই যা ভাবছিস!

কণিষ্ক। আমি আর কি করে ভাবব বল, আমার তো মাথা নেই। দেখিস নি ইতিহাসের ছবিতে, কণিষ্কের মাথা নেই।

পরাশর। এখন ফাজলামো রেখে ব্যাপারটা নিয়ে একটু সিরিয়াসলি ভাবতে হবে কণিষ্ক। সভ্যতার আগুন যদি চলে যায়—আমরা সকলেই হয়ে যাব—

কণিষ্ক। অসভ্য-বর্বর-পশু! কাঁচা মাংস খাব আর লেজ নাড়ব।

পরাশর। ঠিক তাই। আচ্ছা প্রমিথিউস যখন ডাইরী নিতে আসবে তখন ওকে একটু বুঝিয়ে বললে হয় না।

কণিষ্ক। কি বলবি?

পরাশর। বলব, জ্ঞানের আগুনকে আমরা ধ্বংসের কাজে ব্যবহার

করেছি। কিন্তু যুদ্ধরাজ, যন্ত্ররাজ, বণিকরাজের মতো আমাদের এই মানুষের ঘরেই তো জন্ম নিয়েছেন বুদ্ধ-খৃষ্ট-মহম্মদ-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজীরা।

কণিষ্ক। ঠিক বলেছিস। মহাপুরুষদের কথাও তো ডাইরীতে লেখা আছে।

পরাশর। তাহলে এই কথাই রইল। আমরা পৃথিবী থেকে আগুন নিয়ে যেতে দেব না। আয় শপথ করি, যদি প্রয়োজন হয় তাহলে—[কানে কানে কথা]

পরাশর ও কণিষ্ক। আমরা প্রতিজ্ঞা করছি—বুদ্ধ-খৃষ্ট-মহম্মদ-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজীর এই পৃথিবী থেকে আমরা স্বর্গীয় আগুন নিয়ে যেতে দেব না।

(কোরাসের শব্দ থেমে যায়। প্রবেশ করেন প্রমিথিউস)

প্রমিথিউস। বালকগণ, আমার বিশ্বভ্রমণ শেষ হল। এবার তোমাদের কাছে বিদায় নেব। আর যাবার আগে জ্বালিয়ে নিয়ে যাব হাতের এই মশাল।

কণিষ্ক ও পরাশর। তোমাকে আমরা আগুন নিয়ে যেতে দেব না প্রমিথিউস।

প্রমিথিউস। দেবে না—হা-হা-হা, বালক, জানিস না প্রমিথিউসের কি অসীম ক্ষমতা। এক মুহূর্তে আমি পৃথিবীর আগুন এই মশালে তুলে নিতে পারি।

পরাশর। কিন্তু তার আগে তোমার মশালের পলতেটা আমরা বুকের রক্তে ভিজিয়ে দেব। ভেজা পলতেয় আগুন ধরবে না।

প্রমিথিউস। (মনে মনে) কি সর্বনাশ! দেবদূতের ডাইরীতেই লেখা আছে, বুকের রক্তে যদি কেউ মশালের পলতে ভিজিয়ে দেয় তাহলে আমি আর স্বর্গীয় আগুন নিয়ে যেতে পারব না।

(পরাশরের প্রতি) কিন্তু কেন তোমরা জীবন দেবে বালক? নাও মশাল ছাড়ো, আমাকে স্বর্গীয় আগুন নিতে দাও। (প্রার্থনার ভঙ্গীতে) হে আগুন, স্বর্গীয় আগুন, তুমি বিশ্বচরাচরে পরিব্যপ্ত হয়ে রচনা করেছ—সভ্যতার প্রথম সোপান। (কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে) দেবরাজের অগ্নিকুণ্ড থেকে আমিই তোমাকে চুরি করে এনেছিলাম। [ধীরে ধীরে মঞ্চের আলো আগুনের মত লাল হয়ে উঠবে। সহসা প্রমিথিউসের কোমর থেকে তলোয়ার খুলে নিয়ে পরাশর এবং কণিষ্ক নিজেদের বুকে বসাতে যায়। বাধা দেন প্রমিথিউস] কি করছো বালক?

পরাশর ও কণিষ্ক। বুকের রক্তে তোমার মশালের পলতে ভিজিয়ে দিচ্ছি!

প্রমিথিউস। দাঁড়াও, আমাকে এক মুহূর্ত ভাবতে সময় দাও। তোমরা ফুলের মতো দুটি বালক, জীবন দিয়ে এই সভ্যতাকে বাঁচাতে চাও?

পরাশর ও কণিষ্ক। চাই।

প্রমিথিউস। কেন?

কণিষ্ক। কারণ যুদ্ধরাজ-যন্ত্ররাজ-বণিকরাজেরা যেমন মানুষের ঘরে জন্মেছে, তোমার আগুন নিয়ে খেলা করেছে, তেমনি আমাদের এই ঘরেই এসেছেন বুদ্ধ-খৃষ্ট-মহম্মদ-রবীন্দ্রনাথ-গান্ধীজীরা। মানব কল্যাণে তাঁদের আত্মত্যাগের কাহিনী তো তোমার অজানা নয় প্রমিথিউস।

প্রমিথিউস। তলোয়ার ফিরিয়ে দাও বালক! তোমাদের আত্মহত্যার প্রয়োজন নেই।

পরাশর। তাহলে তুমি আগুন নেবে না?

প্রমিথিউস। না। তোমরা তাকে বাঁচিয়ে রেখো। আমি ফিরে যাচ্ছি। জানি দেবরাজ আমাকে কঠিন শাস্তি দেবেন। হয়তো কোন অন্ধকার গুহায় আমাকে বন্দী হয়ে থাকতে হবে, কোন বিশাল শকুনি এসে ছিঁড়ে ছিঁড়ে খাবে আমার শরীরের মাংস, তবু তোমরা, হে মানুষের সন্তান—পবিত্র আগুন বাঁচিয়ে রাখো। কেবল কোন অন্যায় করার আগে মনে রেখো, তোমাদের জন্য, কেবল তোমাদেরই জন্য অন্ধকার গুহায় আমি বন্দী হয়ে আছি।

(প্রমিথিউস চলে যান। মাটিতে প্রার্থনার ভঙ্গীতে বসে কণিষ্ক ও পরাশর)

কণিষ্ক ও পরাশর। আমরা প্রতিজ্ঞা করছি বুদ্ধ-খৃষ্ট-মহম্মদ-রবীন্দ্রনাথ গান্ধীজীর দেশ এই পৃথিবীতে কল্যাণের জন্য, মঙ্গলের জন্য ব্যবহার করব স্বর্গীয় আগুন।

(কথাগুলি প্রতিধ্বনিত হতে থাকবে, বহু কণ্ঠে ধ্বনিত হতে হতে মিলিয়ে যাবে।)



হরলাল বর্ধন

পুতুলের বিয়ে

স্থান ঃ—খেলবার ঘর

সখীগণ। (গান)

আজ পুতুলের বিয়ে গো
আজ পুতুলের বিয়ে ;
সারাদিন কাটিবে গো
এই খেলাই নিয়ে।

(প্রস্থান)

কর্তা। (প্রবেশ)

সকাল থেকে হৈ চৈ (ছড়া)
ছোটাছুটিই যত,
এটা এনো ওটা কেনো
তাতেই ব্যস্ত রত॥
কেউ যারে বলে ভাল
করে কত সুখ্যাতি ;

তাকেই কেউ দেয় ফেলে
বলে কর্তার হয়েছে কি ভীমরতি?
একি বিপদ হয়েছে আমার
কন্যে কর্তা হয়ে
হাজার জনের হাজার মত
মরছি তার ভয়ে। (প্রস্থান)

সখীগণ। (প্রবেশ)
আজ পুতুলের বিয়ে গো (গান)
আজ পুতুলের বিয়ে। (প্রস্থান)

গিন্নী। (প্রবেশ)

গিন্নী হওয়ার কত জ্বালা (ছড়া)
বুঝতো যদি কেউ
সাধ করে পুতুলের বিয়ে
দিত নাকো কেউ।
সকাল থেকে খেটে খেটে
হয়ে গেনু সারা,
তবু কারো কাজ পাই না
দিই না যতই তাড়া।
ব্যস্তবাগীশ যাদের দেখ
কাজের কেউ নয়;
নিজেকে নিয়ে মস্‌গুল তারা
কাজকে পায় ভয়। (প্রস্থান)

সখীগণ। (প্রবেশ)

আজ পুতুলের বিয়ে গো (গান)
আজ পুতুলের বিয়ে ;
আজ ভারী মজা গো
পুতুল খেলা নিয়ে।
রঙিন রঙের জামা পরে
মণ্ডা মিঠাই খাব ভরে
হেসে খেলে নেচে বেড়াব গো
আনন্দে তালি দিয়ে।
শানাই যখন বাজবে সুরে
বলব মোরা মধুর করে
ঐ বর আসছে গো !
টোপর মাথায় দিয়ে।

গিন্নী। (প্রবেশ)

হৈ হৈ ছেড়ে দিয়ে (ছড়া)
কাজ কিছু কর,
খেলা ধোলার চেয়ে
কাজটাই যে বড়।

সখীগণ। নাগো নাগো না,
আজ শুধু করি খেলা
পুতুলের বিয়েতে ;
বসাই আনন্দ-মেলা।

গিন্নী। তোদের দিয়ে হবে না কিছু (ছড়া)
শুধুই কনের মাসি
কাজকর্ম ছেড়ে দিয়ে
বাজাস শুধু বাঁশি।

সখীগণ। আজকে নতুন খেলা গো (গান)
আজকে নতুন খেলা,
পুতুলের বিয়ে দিতে গো
কাটবে সারা বেলা। (প্রস্থান)

কর্তা। (প্রবেশ)
ভয়ে আমি জড়সড়
নড়ছি নাকো একটু তর
এগিয়ে আসে সবে সত্বর
তারি তরে ডর ডর।

গিন্নী। অমনি করে থাকলে বসে
করবে কাজ কেইবা এসে
ভাবছ বুঝি অমনিই হবে
যাদুর কাঠি বুলিয়ে তবে।
অত যদি সোজাই হত
কেউ কখন খাটত অত ?
অফিস কাছারি উঠত যত
সবাই তখন যাদু শিখত।

কর্তা। এমন দিন যদি আসত
যাদুর মন্ত্র সবাই মানত,
উল্টে যেত রাজা প্রজায়
থাকত সবে কেমন মজায়!

তাহলে কেমন ব্যাপার হত
লোকে সবে আনন্দে রত
নারী পুরুষ থাকত যত
করত নাকো মাথা নত।

বামুন। (খুন্তি হাতে প্রবেশ)
উনুন জ্বলে দাউ দাউ
বাজার আসেনি এখনো
সরকার চায় খালি ফাউ
বলে দর বেড়েছে কখনো।

গিন্নী। খ্যান্ত হয়ে থেক না বসে
করবে না কাজ কেউ এসে।

কর্তা। হুকুম আর তাড়ায় তাড়ায়
প্রাণটা বুঝি বৃথাই হারায়। (প্রস্থান)

গিন্নী। মেনুটাত আছে মনে
লোক খাবে পাঁচশ জনে
সাদাসাপটা খাওয়া দিয়ে
হবে না আমার পুতুলের বিয়ে।
চপ কাটলেট ফ্রাই
পোলাও কোর্মা ড্রাই
সন্দেশ রসগোল্লা মালাই
মিনিমাম এইটুকু চাই।

বামুন। রঁাধুনির কারিকুরি
তাতেই আছে বাহাদুরি,
খাবে যারা ভুলবে নাকো
তারিফ করে বলবে, ডাকো

কোথায় পেলে ঠাকুর এমন
হাজারেও মেলে না যখন। (প্রস্থান)

২য় সখী। (প্রবেশ)
কাঁসি হাতে খেঁদি পিসি
সন্দেশ ভরা রাশি রাশি
শাড়ী সিন্দুর আলতা নিয়ে
এসেছে খেতে পুতুলের বিয়ে। (প্রস্থান)

গিন্নী। চারিদিকে কত কাজ
করব কখন
যেই দিকে তাকাই আজ
ক্ষতিই তখন।
কি ঝঞ্ঝাটে পড়েছি গো
পুতুলের বিয়ে দিয়ে
খেটে খেটে মরছি যে গো
প্রাণটি বুঝি দিয়ে। (প্রস্থান)
(পুতুলকে সাজাতে সাজাতে)

১ম সখী। ওরে আয়রে ওরে আয়রে (গান)
নতুন করে সাজারে
পুতুলেরে।

সখীগণ। (প্রবেশ)
কুমকুম চন্দনে
বেনারসী বসনে
অলঙ্কার অঙ্গনে
সাজারে।
নয়নে নয়নে দিই কাজলে

মালায় দিনু ভরে গলে,
নূপুর পরিলে চরণ তলে
বাজিবেরে। (প্রস্থান)

৩য় সখী। (প্রবেশ)
ক্ষণে ক্ষণে বহে যায় সময়ের ধারা
(আবৃত্তি)
দলে দলে আসে সব নিমন্ত্রিত যারা ;
চারিদিকে ওঠে শুধু গুঞ্জন ধ্বনি
ঐ আসে ঐ আসে বর এখুনি।

(গিন্নী ও সখীগণের প্রবেশ)

গিন্নী। সময় ত বহে গেল (ছড়া)
তবুও তারা না এল
কি জানি কি হল!
চিন্তা ত বেড়ে গেল।

সখীগণ। ঐ দেখা যায় দূরে
তুরী ভেরীর নিনাদ সুরে,
পথে আতস বাজি পুড়িয়ে
আসবে তারা দলে দলে
মালা দেব গলে গলে।
উলুধ্বনি দাও সকলে
শঙ্খ বাজাই সবাই মিলে।

(বরযাত্রীদের বর সমেত প্রবেশ। বেয়ান দান সামগ্রী দেখে অত্যন্ত বিরক্ত হয়ে)

বেয়ান। হবে না হবে না এ বিয়ে (গান)
আয় তুলে বর নিয়ে,

যত মিথ্যাবাদী ঠগের সাথে
দেব না বিয়ে এ রাতে।

গিন্নী। কি হল কি হল তাত বুঝি না (ছড়া)
ওগো বেয়ান তুমি রাগ কর না;
যা তুমি চাও তাই দেব।
যা বলো তাই মেনে নেব।

বেয়ান। আমার ছেলেত ফেলনা নয় (ছড়া)
তার ত আছে বাজারে দাম
এই দিলে কি বিয়ে হয়
আমার আছে কত সুনাম।

গিন্নী। ধরি তোমার পায়
করি শত নমস্কার।
জান ত আমি দুর্ভাগা হায়
মেনে নাও করে তিরস্কার।

সখীগণ। আয়রে আয়রে আয় সবাই (গান)
বরের পাশে কনে বসাই।
হোক ওদের মধুর মিলন
গড়ুক ওদের সুখের জীবন।

বেয়ান। হবে না হবে না এ বিয়ে
আয় তুলে বর নিয়ে।

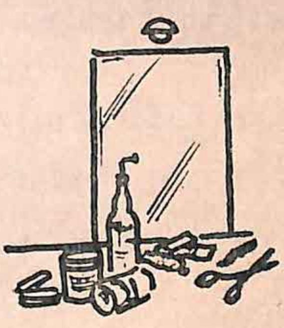
গিন্নী। হায় হায় কি হয়ে গেল (ছড়া)
ওরা সবে বর তুলে নিল
কি করি কি করি কি
তোমরা কেউ জানো নাকি।

সখীগণ। দেব না যেতে দেব না তারে (গান)
নিয়ে যাও কনেকে সাথে করে,
তোমার জিনিস তুমি নিয়ে যাও
তুমিই তাকে ঘরে মেনে নাও।

বরযাত্রীরা। যাব না যাব না বর তুলে নিয়ে (গান)
সব কি যায় গো পাওয়া অর্থ দিয়ে।
আমরা এসেছি দিতে পুতুলের বিয়ে
ফিরব আমরা ওগো কনেকে নিয়ে।

বরযাত্রী। বাজাও শঙ্খ দাও গো উলুধ্বনি
ও সখিগণ হেথায় যারা আছি মোরা
সবে শুনি।

হল ওদের মধুর মিলন
সাঙ্গ হল খেলা এতক্ষণ।
আজ পুতুলের বিয়ে হল
আজ পুতুলের বিয়ে
সারাক্ষণ কাটল কেমন
আনন্দ দিয়ে॥



বিজয় দেব

সিংহ ও মেষশাবক

লিওনার্দ দা ভিঞ্চির রূপকথা অবলম্বনে

[নিস্তব্ধ অরণ্য সময় বিকেল। ঝিঁ ঝিঁ পোকার ডাক। মাঝে মাঝে পাখির ডাক জেগে উঠেই থেমে যাচ্ছে। হঠাৎ নির্জন বনভূমি যেন কেঁপে উঠলো।]

[সিংহ অস্থির হয়ে পায়চারী করছে। রাগে ফুঁসে উঠছে। পাশে দাঁড়িয়ে মোসাহেব রামছাগল।]

সিংহ। (হুঙ্কার) সব শেষ করে ফেলব—

রামছাগল। সত্যিই তো, এ আর সহ্য করা যায় না।

সিংহ। কোন খবর পেলে ?

রামছাগল। এই মাত্র তো দেখে এলাম। না কোথাও দেখা পেলাম না।

সিংহ। আবার তা হলে স্বরূপ ধরতে হবে!

রামছাগল। হ্যাঁ রাজামশাই। এরা সব কী পেয়েছে! রাজভোগ নিয়ে কথা। তারও একটা নিয়ম বেঁধে দেয়া হয়েছে।

সিংহ। ভেবেছে রাজামশাইর—

রামছাগল। রক্তে মাংসে একেবারে অরুচি ধরে গেছে !

সিংহ। অথচ যখনই এদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়তে যাই অমনি—

রামছাগল। সবাই কাতরস্বরে মিনতি জানাবে, রাজামশাই, পালা করে দিন—আমরা তাই মেনে চলব।

সিংহ। কিন্তু কদিন ? তারপর এই পাজীগুলো ভুলেই যায়।

রামছাগল। না এভাবে আর বাড়তে দেয়া উচিত নয়। আচ্ছা, সেদিন তো চোখের সামনে—

সিংহ। ঘটে গেলো। কি দৌড় ! সবাই কি না ভয় খেয়েছিল ! তবুও এদের কি কোন জ্ঞান হলো !

রামছাগল। হ্যাঁ, বুনো মোষটি যুদ্ধও করেছিল !

সিংহ। ব্যাটা, তুই কি না রাজাকে মারতে এলি ! কেমন হলো বল্। যখন হুঙ্কার ছেড়ে লাফ দিলাম—

রামছাগল। আমি তো ভয়ে কাঠ হয়ে গিয়েছিলাম। আর দেখছিলাম পশু, পাখি যে যার প্রাণ নিয়ে পালাচ্ছে।

সিংহ। কি তাক্ ! একেবারে পুরু ঘাড়টি মট্‌কে গেলো !

রামছাগল। কি টাট্‌কা রক্ত ! ফিনকি দিয়ে ছুটছিল। রাজামশাই, শিকারের খবরটি—

সিংহ। এনে দিয়েছিলে তুমি। সব একসঙ্গে পাবে !

রামছাগল। মনে আছে রাজামশাই !

সিংহ। সব মনে আছে।

রামছাগল। কত শিকার ভুলিয়ে এনেছি- -

সিংহ। তোমার ঋণ কি ভুলতে পারি রাম ? (স্বগতঃ) যখন বুড়ো হয়ে যাব তখন তো তোমাদের পালই আমার সম্বল হবে —সেই তো তোমার পুরস্কার। কি খিদে পেয়েছে যে !

রামছাগল। এই জানলে না হয় আমি এতক্ষণে কোন—।

সিংহ। শিকার ভুলিয়ে এনে এখানে হাজির করতাম।

রামছাগল। ঠিক রাজামশাই! বেয়াড়া নীলগাই কেমন করে মরলো!

সিংহ। গত পরশুর কথা বলছো? সময় নিয়েছিল বটে! সারা বনও কেঁপে উঠেছিল!

রামছাগল। মনে হয়েছিল বুঝি সারা বনে প্রলয় শুরু হলো।

সিংহ। আমার সময়ও লেগেছিল। ব্যাটা জানেনা আমি রেগে গেলে আগুন ধরে যায় বনে—

রামছাগল। সেদিকে যেন কারুর হুঁসও নেই—পুঁচকে মেষটাও দেখছি একেবারে—

সিংহ। না আর পারা যায়না।

রামছাগল। দেখে আসব?

সিংহ। (হুঙ্কার) তাও কি বলে দিতে হবে!

[অস্থিরভাবে পায়চারী করছে]

সিংহ। না না আর সহ্য করা যায়না। এদিকে বেলা যে পড়ে এলো। কিন্তু কোথায় সে! এখনো আসার যে নাম নেই—

রামছাগল। (দৌড়ে এসে) এসেছে রাজামশাই—ঐ দূরে—

সিংহ। আসুক আজ কি শিক্ষা দিই দেখবে। (হুঙ্কার)

মেষশাবক। (প্রবেশ) নেচে নেচে মনের আনন্দে তৃণভরা প্রান্তর পেরিয়ে—সিংহের গুহার কাছা কাছি এগিয়ে আসছে—
হা রে রে—হু রে রে মনের সুখে নাচিরে আপন মনে গাইরে
কি মজার দিনরে, বেলা বয়ে যায়রে—

রামছাগল। (ধীরে ধীরে) হেই, মুখ কাঁচুমাচু করে রাজামশাইর কাছে মাপ চাইবি --

মেষশাবক। কেন ?

সিংহ। (হুঙ্কার) কি কথা বলছিস! তোর এতক্ষণে সময় হলো!

রামছাগল। কি রে, তোরা কি পেয়েছিস ?

মেষশাবক। (থমকে) রাজামশাই—

সিংহ। বেয়াদব!

মেষশাবক। (নাচতে নাচতে এগিয়ে এসে) কি হলো রাজামশাই!

রামছাগল। ব্যাটা মরবি—আবার ন্যাকামি করছিস।

সিংহ। তোর স্পর্ধা তো কম নয়! দুধের বাচ্ছা হয়ে তুই রসিকতা শুরু করেছিস ? (হুঙ্কারে বনভূমি কেঁপে উঠলো—পাখির ঝাঁক আকাশে ভেসে মিলিয়ে গেল)

মেষশাবক। তুমি আমাকে কিছু বলছো রাজামশাই ?

সিংহ। (স্বগতঃ) কি কচি নধর কান্তি! জিবের জল যে থামছেনা। কাকে বলছি তা তুই বুঝতে পারছিসনা? একেবারে যে বোকা সেজেছিস রে—

মেষশাবক। আচ্ছা, তুমি এত রেগে আছো কেন রাজামশাই ?

রামছাগল। তুই আবার হেঁয়ালী শুরু করেছিস ? (নীচু কণ্ঠে) কি করে কথা বলতে হয় জানিসনে ?

সিংহ। অর্বাচীন, জানিস এর কি শাস্তি ?

মেষশাবক। শাস্তি কেন বলছো ?

সিংহ। ব্যাটা, তুই ভেবেছিস কি ? আমি তোর হাসির পাত্র! বল, কেন এত দেরী করে এসেছিস ?

মেষশাবক। দেরী কোথায় রাজামশাই!

সিংহ। দেরী নয় ? আমি মরছি খিদেয় আর বলছিস দেরী হয়নি।

মেষশাবক। কি করব রাজামশাই! সেই সকাল বেলায় গিয়েছিলাম হরিণমারির মাঠে খেলতে। ওখানেই তো—

সিংহ। আমাকে উদ্ধার করেছিস আর কি। এবার দেখছি তোর বাবা মাকে—ওরা কি তোকে এখানে আসতে বলেনি ?

মেষশাবক। হ্যাঁ, বলবেনা কেন ? বাবা বললো ঃ রাজামশাইর সঙ্গে দেখা করে আয়।

সিংহ। (চীৎকার করে) দেখা করে আয়! আর তোর এতক্ষণে আসা হলো ?

মেষশাবক। কি করব রাজামশাই! সঙ্গে যে বন্ধুরা ছিলো! আর খেলতে গিয়ে যে—

সিংহ। ওসব ভুলে গেলাম—ব্যাটা পাজী! নে তৈরী হয়ে নে!

মেষশাবক। কেন রাজামশাই।

সিংহ। কিছু বুঝিসনে—একেবারে কচিখোকা—এদিকে আমার নাড়িভুঁড়ি জ্বলতে শুরু করেছে জানিস। দেখ আকাশের দিকে চেয়ে স্থূয্যিঠাকুর ডুবতে বসেছে!

মেষশাবক। খেয়ে নিলেই পারতেন রাজামশাই।

সিংহ। তোর সাহস যে বেড়ে যাচ্ছেরে হতভাগা! (স্বগতঃ) জিবের যে আর তর সইছে না!

মেষশাবক। রাজামশাই! আপনার শরীর খারাপ হয়েছে, তাই তো মাথা গরম—

সিংহ। (হুঙ্কার) চুপ কর—কি বললি ?

মেষশাবক। মাথাগরম।

রামছাগল। এবার তুই মরবি!

সিংহ। সাহস যে বেড়েই চলেছে। রাম দেখেছিস ? রাজাকে একেবারে পাত্তাই দিচ্ছে না!

মেষশাবক। কি বলছো রাজামশাই।

সিংহ। জানিস, কত শিশু, কিশোর, যুবা, বুড়ো পশু এখানে এসেছে।

মুখ খুলতে সাহস হয়নি কারুর আর তুই কি না রসিকতা করছিস? মামার বাড়ি পেয়েছিস?

মেষশাবক। আমি সত্যি বলছি রাজামশাই—ডাক্তার ডেকে আনব?

সিংহ। (চীৎকার) বড্ড বেড়ে গিয়েছিস?

মেষশাবক। আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না!

সিংহ। আবার কথা! যারাই এখানে আসে সবাই ভয়েই একেবারে কাঠ হয়ে যায়! আর বনের সবাই তাই দেখে 'মরে গেলাম গো' বলে ছুটে পালায়—

মেষশাবক। কেন রাজামশাই?

সিংহ। জানিসনে? এখনি দেখবি—

মেষশাবক। তুমি খুলেই বল না রাজামশাই। ওদের কেন এত ভয়?

সিংহ। আমাকে ভয় পাবে না! রাজাকে মেনে চলবে না! বলছিস কিরে! জানিস, সেই সুন্দরবনের বাঘ থেকে শুরু করে—ছোট্ট ক্ষুদে খরগোস পর্যন্ত ভয়ে পালায়—

মেষশাবক। কেনই বা তোমাকে মিছিমিছি ভয় পায়?

সিংহ। শেষবারের মতো ভগবানকে একবার ডেকে নে।

রামছাগল। হ্যাঁ নামজপ কর।

মেষশাবক। কি হবে ডেকে?

সিংহ। বুঝলিনে? এ যে দেখছি একেবারে গবেট।

মেষশাবক। দেরী করে এসেছি বলে তোমার রাগ হয়েছে?

সিংহ। (গ-র্-র্) খিদের জ্বালায় পেট জ্বলছে—এদিকে ব্যাটার মস্করা হচ্ছে।

মেষশাবক। আমি তো সত্যি কোন অসভ্যতা করিনি রাজামশাই।

সিংহ। (চীৎকার) এদিকে আয়।

রামছাগল। এবার খেল খতম!

মেষশাবক। (ফ্যাল-ফ্যাল করে তাকিয়ে)—আসতে বলছো !

সিংহ। নাহলে কি যেতে বলছি !

মেষশাবক। (নাচতে নাচতে একেবারে কোলের কাছে ঘেঁসে এসে দাঁড়ালো) রাজামশাই তুমি ক-ত — ব-ড় তাই না ! একেবারেই ধরা যায় না।

রামছাগল। এবার শেষ করে ফেলুন ! আর কেন !

সিংহ। (বিরাট গর্জন করে মেষশাবকের ওপর লাফিয়ে উঠতেই— সিংহের কোল ঘেঁসে মেষশাবক দাঁড়ালো। গর্জন শুনে বনের পাখিরা আকাশে ছড়িয়ে পড়লো। কিন্তু সিংহ থেমে গেল) থমকে—(স্বগতঃ) এ যে দেখছি ভয় কাকে বলে জানে না ! না কি বিশ্বাস। (বিস্ময়ের সুরে)— কিরে তোর ভয় করছে না ?

মেষশাবক। ভয় ? কিসের ভয় ?

সিংহ। যাকে সবাই ভয় করে বনের পাশ দিয়ে পালায় তাকে ভয় করছে না ?

মেষশাবক। তোমাকে ভয় পাব কেন ?

সিংহ। তুই যে একেবারে গায়ের ওপর এসে পড়েছিস !

মেষশাবক। তুমি তো রাজা !

সিংহ। তোদের মেরেই তো আমার খিদে মেটে !

মেষশাবক। কে বলে তুমি সবাইকে মেরে ফেল। ও মিছে কথা !

সিংহ। মিছে নয়। সত্যি ! জিজ্ঞেস কর না রামছাগলকে।

রামছাগল। সব সত্যি !

মেষশাবক। যাঃ—তুমি যে সবার রাজা। তুমি তাদের মারতে পার ? তুমি যে সবাইকে বিপদ থেকে রক্ষা করো ! রাজাও তো বাবা মার মতো। (আরও কোলের কাছে সরে গেল)

সিংহ। (স্বগতঃ) একি ! আজ আমার কি হলো। মনটায় কেন জোর পাচ্ছিনে ! একে কি সত্যি খাওয়া যায় ?

মেষশাবক। কি ভাবছো রাজামশাই ? বলেছিলে না খুব খিদে পেয়েছে।

সিংহ। না রে—এখন আর খিদে নেই।

মেষশাবক। কেন ?

সিংহ। যা—তুই চলে যা! আমার সামনে থেকে। ব্যাটা— আমার মনটা ভাল নেই—

মেষশাবক। মনটা—

সিংহ। কথা বলবি না, যা সূয্যি ডুববে এখনি ! চলে যা তোর মা বাবার কাছে—আমাকে একা থাকতে দে— (দূর থেকে কোন এক পাখির সুমধুর সঙ্গীত ভেসে আসতে লাগলো।)



সমীর চট্টোপাধ্যায়

অংকমালার দেশে

মঞ্চ নির্দেশ

[প্রেক্ষাগৃহের আলো ধীরে ধীরে নিভে গেল। পর্দার উপর আলো এসে পড়ল। আবহ সংগীত। নেপথ্য থেকে ভেসে এল কণ্ঠস্বর]

বছর শেষ হয়ে এল। আনন্দ বালিকা বিদ্যালয়ের পরীক্ষার ফল বেরোলো আজ। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরদল পাসের আনন্দ নিয়ে যে যার বাড়ি ফিরে গেল। আজ যে তাদের কী আনন্দ! নতুন বছর, নতুন ক্লাস, নতুন নতুন বই আর নতুন পড়া—কী মজা! আজ যে তাদের মন নতুন খুশির স্বপ্নে ভরা। কিন্তু মিষ্টি ছোট্ট বোনটি মৌ, তার মনে কিন্তু একটুও খুশি নেই। আজ ওর সব হাসি আর খুশি এক নিমেষে যেন শূন্যে হারিয়ে গেছে। স্কুলের ক্লাস ফোরের ঘরটায় সবাই যখন রেজাল্ট বইখানা নিয়ে খুশিতে চীৎকার করে উঠেছে—কী মজা পাস করেছি! মৌ কিন্তু তখন কাঁদতে কাঁদতে এগিয়ে গেল দিদিমণির কাছে, রেজাল্ট বইখানা এগিয়ে দিয়ে শুধু বলল, দিদিমণি, দিদিমণি! আমি পাস করিনি?

রেজাল্ট বইখানার পাতা উল্টে দিদিমণি শুধু বললেন, মৌ

অংকে তুমি একশ এর মধ্যে শূন্য পেয়েছ। তোমার ক্লাশে কেউ পায়নি শূন্য। তুমি পাশও করনি, প্রমোশনও পাওনি। সারা বছর অংকে ফাঁকি দিয়ে এখন শুধু কাঁদছ! যাও, বাড়ি চলে যাও। এবার থেকে একটু ভাল করে অংক করো।

দিদিমণি এমন করে বলবে মৌ ভাবতেও পারেনি। ছ'গাল বেয়ে তার চোখের জল গড়িয়ে পড়তে লাগল। ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদতে লাগল মৌ। শুধু তার একটি দুঃখ কেউ বুঝল না। তার মনের কথা। আমার সব ভাল লাগে, সব বিষয়ে আমি ভাল নম্বর পেয়েছি, কিন্তু অংক ভাল লাগে না। কিন্তু কেন, কেন আমার ভাল লাগে না সে কথাতো কেউ বলবে না। শুধু বলবে শূন্য পেয়েছিস! ফেল করেছিস! ভাল করে অংক কর।

একে একে তার সাথীরা পাসের খুশি আঁকা রেজাল্ট বইখানা হাতে নিয়ে যে যার বাড়ি চলে গেল। কেউ কেউ মৌকে সান্ত্বনা দিতে এগিয়ে এসেছিল, বলেছিল,—মৌ কাঁদিস না, চল আমাদের সঙ্গে। বাড়ি চল। তুই তো আমাদের চাইতে কত ভাল মেয়ে। অংকে পাস করলে তুই তো ফার্ষ্ট হয়ে যেতিস। এবার থেকে অংক একটু ভাল করে কর। সামনের বছর দেখবি তুই ফার্ষ্ট হবি। —না, না আমি বাড়ি যাব না। আমি কোথাও যাব না। কান্নায় ফেটে পড়ে মৌ। শূন্য স্কুল বাড়িটা ছেড়ে সাথীহারা মৌ রাস্তায় পা বাড়াল। সকালের নতুন সূর্যের দিকে তাকাতেই যেন মৌ দেখতে পেল একটা বিরাট শূন্য তার দিকে তাকিয়ে আছে। গাছের পাতার ফাঁকে ফাঁকে যেন হাজার হাজার শূন্য তাকে হাতছানি দিয়ে ডাকছে। শূন্যে ভরে গেছে আজ

মৌ-এর মন। ও যে শূন্য পেয়েছে এ কথাটা যেন কেমন করে সবাই জেনে ফেলেছে। রেজাল্ট বইটার মাঝেও একটা শূন্য তার দিকে কেমন চেয়ে আছে। মৌ তাই শুধু কাঁদছে আর কাঁদছে। ওই দেখ, মৌ রেজাল্ট বইটা দেখছে আর কাঁদছে।...

মঞ্চ নির্দেশ

ধীরে ধীরে পর্দা উঠে গেল। মঞ্চের এক কোণে মৌ তার বই হাতে নিয়ে কাঁদছে। ভোরের নতুন সূর্যের আলো ফুটে উঠল। আবহ সংগীতের তালে তালে শূন্য মঞ্চে প্রবেশ করল। চলতে চলতে শূন্য শুনতে পেল কান্নার শব্দ, দেখতে পেল মৌকে। এগিয়ে গেল মৌ-এর কাছে।

শূন্য। এ কী তুমি কাঁদছ কেন? তোমার সব সাথীরা যে যার বাড়ি চলে গেছে। তুমি কেন এখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদছ? জানতো আমি যেখানে যাই সেখানে কেউ থাকতে পারে না। যেখানে কেউ থাকে না সেখানেই আমি থাকি। তুমি বাড়ি চলে যাও।

মৌ। না না আমি বাড়ি যাব না। আমি কোথাও যাব না। আমি অংকে শূন্য পেয়েছি। আমি ছাড়া আর কেউ পায়নি শূন্য, কেউ না।

আমার ছোট ভাই রাংলু। দুদিন আগে ওর পরীক্ষার ফল বেরিয়েছে। ক্লাস থ্রি থেকে ফোরে উঠেছে, ফার্স্ট হয়েছে। অংকে কত পেয়েছে জানো? একশ-এর মধ্যে একশ পেয়েছে। বাবা বলেছে, রাংলুকে একটা স্প্রিং দেওয়া ডল কিনে দেবে। বড় হলে ঘড়ি কিনে দেবে। আর আমাকে! আমার রেজাল্ট বইটা দেখলে বাবা ছুঁড়ে ফেলে দেবে। তাড়িয়ে দেবে বাড়ি থেকে। শুধু বলবে, মৌ তুমি শূন্য পেয়েছো! মা রেগে বলবে শূন্য পাবে না তো কী পাবে! ও কী অংক করে যে অংকে পাশ করবে! আর রাংলু ছুটে এসে বলবে, এ মা দিদি, তুই শূন্য পেয়েছিস! কেউ বোঝে না আমার মনের দুঃখ। আমার অংক ভাল লাগে না কেন, এ কথাটা কেউ বলবে না।

আচ্ছা তুমি বলতে পার আমার অংক ভাল লাগে না কেন?

শূন্য। ভারী মিষ্টি নাম তো তোমার। কেঁদোনা তুমি। আচ্ছা, শূন্যকে তোমার ভাল লাগে না! একটুও ভাল লাগে না! একটুও ভালবাস না শূন্যকে!

মৌ। না না শূন্যকে কেউ ভালবাসে না। শূন্যের কী ছাই কোন দাম আছে? একটুও দাম নেই শূন্যের। শূন্য-শূন্য। একও না, দুইও না। শূন্য শুধু শূন্য। এই শূন্যের জন্যেই তো আমার যত দুঃখ।

শূন্য। আচ্ছা অংকে একশ এর মধ্যে একশ পেলে তো তুমি খুব খুশি হতে!

মৌ। তাহলে আমি ফার্স্ট হয়ে যেতাম। এতক্ষণে বাড়িতে কী মজাটাই না করতাম। কত বায়না করতাম বাবা মার কাছে। [একটু থেমে] কিন্তু জানো, আমি কোনদিন

অংকে একশ পাব না। আমার যে অংক ভাল লাগে না।

শূন্য। একশ পেলে ফার্ষ্ট হয়ে যেতে! কিন্তু ওই একশ এর মধ্যে তো দুটো শূন্য আছে। একশ পেলে শূন্যকেও তোমার ভাল লাগত তাই না?

মৌ। না না শূন্য আমার ভাল লাগে না। শুধু শূন্যের কোন দাম নেই। একশ লিখতে দুটো শূন্যের বাঁ দিকে এক আছে বলেই তো দুটো শূন্যের দাম। শুধু শূন্যের কোন দাম নেই। শুধু শূন্য পেয়েছি বলেই ত আমার এত দুঃখ। শুধু শূন্যকে কেউ ভালবাসে না, কেউ না।

শূন্য। আচ্ছা মৌ, তুমি আমাকে ভালবাস না! আমি যে শুধু শূন্য। আমার কোন দাম নেই! আমায় কেউ ভালবাসে না! তবে কেন আমি অংকমালার দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছি। আচ্ছা মৌ, তুমি শুধু বল তুমি আমাকে ভালবাস। জানো, তোমার এত দুঃখের শূন্য, সে ত আমি। আমার জন্যেই তো তোমার এত দুঃখ। আমি যেখানে যাই-সেখানে কেউ থাকে না। আমায় দেখে সবাই যায় হারিয়ে। আমি বুঝেছি আমার কোন দাম নেই। [একটু ভেবে] আচ্ছা মৌ, আমার কোন দাম নেই? তুমি আমায় একটুও ভালবাস না?

মৌ। না না আজ আমি কাউকে ভালবাসি না। [কাঁদতে কাঁদতে] আমায় ঘিরে শুধু শূন্যের হাতছানি। ওই যে মস্ত বড় একটা শূন্যের মত সূর্য গাছের পাতার ফাঁকের হাজার শূন্য, আমার রেজাল্ট বইয়ে আঁকা শূন্যটা, তোমার জামায় আঁকা এতগুলো শূন্য আমার দিকে কেমন করে চেয়ে আছে।

না না আমি তোমাদের ভালবাসি না। তোমাদের কোন দাম নেই। শুধু শূন্যের কোন দাম নেই। [কাঁদতে লাগল]

শূন্য। শূন্য পেয়ে মৌ তুমি কাঁদছ। আমায় দেখে তুমি কাঁদছ! [আদর করে] মৌ কেঁদো না। আর কেঁদো না।

আমি বুঝেছি আমার কোন দাম নেই। আমার জন্যেই ত তোমার এত দুঃখ। বুঝেছি শুধু শূন্যের কোন দাম নেই, কোন দাম নেই।

মঞ্চ নির্দেশ

[আবহ সংগীতের তালে তালে শূন্য দর্শকদের কাছে এগিয়ে এল। নেপথ্য থেকে ভেসে আসা গানের তালে নেচে নেচে শূন্য বলে চলল তার দুঃখের কথা।]

গান

শূন্য। শূন্য আমি ওগো
আমায় কেউ বাসে না ভালো।
অংকমালার দেশে আমার
নেই যে নিজের আলো।
আমায় দেখে কেউ হাসে না
কেউ জ্বালে না আলো
কেউ খেলে না আমার সাথে
কেউ বলে না ভালো।
কেউ বলে না ঘরে এসে
খুশির প্রদীপ জ্বালো।
শূন্য সাজার মূল্যে আমি
এই পেয়েছি ফল

আমায় দেখে ছোট্ট শিশুর
চোখে আসে জল।
[মৌ-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে]
তোমার ব্যথায় আমি ব্যথী
তুমিই আমার শূন্য সাথী
আজকে তুমি আমার মনে
জ্বাললে নতুন আলো।
শূন্য আমি
আমায় কেউ বাসে না ভালো।

[শূন্য মৌ-এর কাছে এগিয়ে গিয়ে]

শূন্য তুমি আর কেঁদো না। আর দুঃখ কোর না। তোমার দুঃখ তো আমি। আজ তোমার চাইতে আমার আরো বেশি দুঃখ। আমার কোন দাম নেই! আমায় পেয়ে, আমায় দেখে তোমার মত মিষ্টি শিশুর চোখে জল!

কিন্তু এতদিন তো আমি বুঝিনি আমার নিজের কোন দাম নেই। আমার রাজা তো আমায় কোনদিন বলেনি,—শূন্য তোমার নিজের কোন দাম নেই। আজ তোমার চোখের জলের মাঝে দেখতে পেয়েছি আমার মূল্যহীন ছবি। তোমার কান্নার শব্দে শুনতে পেয়েছি বারে বারে একটি কথা—শূন্য তোমার দাম নেই। তোমার কোনও দাম নেই। আজ আমার কত দুঃখ। আমি শূন্য। আমার কোন দাম নেই। আমায় কেউ ভালবাসে না, কেউ না।

[কাঁদতে লাগল শূন্য]

মৌ। একী তুমিও কাঁদছ! তুমিই আমার রেজাল্ট বইয়ে আঁকা শূন্য!

না-না তুমি কেঁদো না। কী সুন্দর তুমি নাচতে পারো, গাইতে পারো। সত্যি বলছি, তোমায় আমার খুব ভাল লেগেছে। আমি তোমায় খু-উ-ব ভালবাসি।

শূন্য। মৌ, আজ এই দুঃখের দিনে তুমিই আমার একমাত্র সাথী। তোমার অংক ভাল লাগে না! কেন, কেন তোমার অংক ভাল লাগে না। এ প্রশ্নের উত্তর আমি, আমিই খুঁজে বার করব। এই অসীম শূন্যের মধ্যে আমি খুঁজে বেড়াব— কোথায় লুকিয়ে আছে আমার মিষ্টি মৌ-এর ভাবনার উত্তর। [একটু ভেবে] পেয়েছি, পেয়েছি মৌ। এক্ষুণি তুমি চলে যাও আমার রাজার কাছে। রাজার কাছে গিয়ে বল, —রাজা, রাজা আমার অংক ভাল লাগে না কেন? আর আমার রাজা যদি বলতে না পারে, সে তার আদরের শূন্যকে আর খুঁজে পাবে না। আমি আর যাব না অংকমালার দেশে। তখন দেখবে কী মজাটাই না হবে। [খুশি হয়ে] কেউ আর শূন্য পাবে না। শূন্য ব্যথায় কেউ আর কাঁদবে না। মৌ, মৌ তুমি চলে যাও আমার রাজার কাছে।

মৌ। না-না আমি রাজার কাছে যাব না। আমার না একটা রূপকথার বই আছে। তাতে কত রাজার গল্প আছে। রাজার ছবিও আছে তাতে। কী বিরাট চেহারা! কী বিরাট গোঁফ! জমকালো পোশাক। মাথায় মুকুট। কোমরে বাঁধা তরবারি। ভয়ংকর তার মেজাজ। একটুতেই রেগে যায়। না-না আমি রাজার কাছে যাব না। আমি করব রাজাকে প্রশ্ন! আমাকে টুকরো টুকরো করে কেটে ফেলে দেবে না!

শূন্য। না-না মৌ, এ রাজা সে রাজা নয়। এ রাজা অংকমালার

রাজা। আমার রাজা নিয়ম দিয়ে গড়া। আমার রাজা নিয়ম দিয়ে গড়া, নিয়ম ছাড়া কিছু যায় না করা। আমার রাজার কোমরে বাঁধা নেই তরবারি। মন তাঁর খুশিতে ভরা। মুখে তাঁর মিষ্টি হাসি, মিষ্টি কথা। রাজাকে দেখলে তোমারই ভাল লাগবে। তুমি রাজার কাছে চলে যাও।

মৌ। কিন্তু তোমার রাজার কাছে কেমন করে যাব! সে পথ তো চিনি না। কোন্ পথে গেলে সে রাজাকে খুঁজে পাব?

শূন্য। [একটু ভেবে] বেশ আমি গান গেয়ে গেয়ে অংকমালার দেশের নিশানা এঁকে যাচ্ছি। তুমি শিখে নাও গান, যে গান গেয়ে চলতে থাকলে পোঁছে যাবে অংকমালার দেশে, দেখতে পাবে নিয়মগড়ার রাজাকে। তুমি নিজেই চিনে নিতে পারবে আমার রাজাকে।

মৌ। বেশ, বেশ তুমি শিখিয়ে দাও আমায় সেই গান, যে গান আমায় খুঁজে দেবে তোমার রাজাকে। রাজার কাছে আমি ঠিক খুঁজে পাব আমার ভাবনার উত্তর।

মঞ্চ নির্দেশ

[নেপথ্য থেকে ভেসে আসা গানের সাথে নেচে নেচে শূন্য বলে চলল অংক-মালার দেশে যাবার নতুন পথের কথা।]

গান

শূন্য।
এক দুই তিন চার
বলি মনে বার বার।
পাঁচ ছয় সাত আট
এরা সবাই অংকমালার পাঠ।
নয় দশ এগারো বারো
যেতে হবে আরো আরো।

তের চৌদ্দ পনেরো ষোলো
নতুন পথের কথা আমায় বলো
এগিয়ে চল শুধু এগিয়ে চল।
তাই বলি বার বার
এক দুই তিন চার॥
এ যে অংকমালার এক দেশ
সংখ্যাগুলো খেলছে খেলা
গড়ছে শুধু অংক মেলা
এদের নেই যে কোন শেষ
এরা আছে বেশ আছে বেশ॥
অংকমালার এই দেশে
খেলবো খেলা এদের সাথে
এদের ভালবেসে
তাই বলি বার বার
এক দুই তিন চার॥
পাঁচ ছয় সাত আট
রাজার কাছে নেব এবার
অংক খেলার নতুন পাঠ।
নয় দশ এগারো বারো
রাজার কাছে শিখবো আরো।
তের চৌদ্দ পনেরো ষোলো
এগিয়ে চল শুধু এগিয়ে চল।
তাই বলি বার বার
এক দুই তিন চার॥

মঞ্চ নির্দেশ

[মৌ শূন্যের গানের তালে তালে গান ও নাচ শিখে নিল। শূন্যের গান শেষ হতেই মৌ এগিয়ে গেল শূন্যের কাছে।]

মৌ। শূন্য, শূন্য! তোমার মত গান গাইতে গাইতে চলতে থাকলে ঠিক পৌঁছে যাব অংকমালার দেশে! খুঁজে পাব নিয়ম গড়ার রাজাকে! কিন্তু শূন্য, তুমি কিন্তু আমায় একা ফেলে চলে যেও না। একা একা আমার ভয় করবে যে!

শূন্য। না-না তোমার কোন ভয় করবে না মৌ। আমি এই অসীম শূন্যের মধ্যে লুকিয়ে থাকব। যখনই তুমি আমায় ডাকবে আমি ছুটে আসব তোমার কাছে। তুমি যে আমার একমাত্র সাথী।

মৌ তুমি গাইতে থাক। গেয়ে গেয়ে চলতে থাক। দেখতে পাবে তোমার মনের পাতায় ফুটে উঠেছে অংকমালার দেশের ছবি। দেখতে পাবে রাজাকে।

মঞ্চ নির্দেশ

[মৌ শূন্যের কাছে শেখা গান গাইতে লাগলো। শূন্য মঞ্চ থেকে হারিয়ে গেল। মৌ এর গান শেষ হতে না হতেই নেপথ্য থেকে ভেসে আসা গানের তালে তালে ১, ২, ৩…৮ মঞ্চে এসে হাজির হোল। ৯ এসে যোগ দিল পরে। সকল সংখ্যা মিলেমিশে গাইতে লাগল সংখ্যামালার গান। নাচতে লাগল গানের তালে তালে। মৌ এক কোণে দাঁড়িয়ে এদের দেখতে লাগল।]

গান

মৌ।

এক দুই তিন চার
বলি মনে বার বার।

পাঁচ ছয় সাত আট
এরা সবাই অংকমালার পাঠ।
নয় দশ এগারো বারো
যেতে হবে আরো আরো।
তের চৌদ্দ পনেরো ষোল
নতুন পথের কথা আমায় বলো
এগিয়ে চলো শুধু এগিয়ে চলো।
তাই বলি বার বার
এক দুই তিন চার॥

মঞ্চ নির্দেশ

(মো এর গান শেষ হতে না হতেই নেপথ্য থেকে ভেসে আসা গানের তালে তালে ১, ২, ৩, ৪...৮ এবং পরে ৯ নাচতে নাচতে মঞ্চে এসে হাজির হোল। নাচের তালে তালে তারা বলে চলল তাদের কথা।)

১ ২ ৩ ৪ ৫ ৬ ৭ ৮ এবং ৯

গান

এক দুই তিন চার
পাঁচ ছয় সাত আট
আমরা সবাই অংকমালার পাঠ॥
নয় নয় নয়
আমি নয়, আমি নয়, আমি নয়
অংক দলে আমিই বড়
বড় মানের জয়—
আমি নয়, আমি নয়, আমি নয়॥

অংক মজার এই দেশে
আছি মোরা সংখ্যা বেশে
খেলছি শুধু অংক খেলা
গড়ছি মোরা অংক মেলা
সবাই ভালবেসে।
নয় নয় নয়
শূন্য ছাড়া সব কিছু নয়, নয়
শূন্য হারা হয়ে আমার লাগছে বড় ভয়
আমি নয়, আমি নয়, আমি নয়॥
শূন্য মোদের এগিয়ে চলার গান
শূন্য মোদের এই ভারতের দান।
আমরা আছি সবার মাঝে
ঘুরে বেড়াই সবার কাজে
ছন্দে সুরে নাচে গানে
খেলা ধূলায় মধুর তানে
মোদের দিয়েই সবার হোল মান॥

মঞ্চ নির্দেশ

[মৌ এক কোণে দাঁড়িয়ে অংকমালাদের নাচ, গান দেখতে লাগল। অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের মাঝ থেকে এগিয়ে এল নিয়মগড়ার রাজা। মঞ্চের কাছে আসতেই আলো এসে পড়ল রাজার মুখে। রাজা মঞ্চে উঠে এল। অংকমালাদের মাঝে শূন্যকে না দেখতে পেয়ে রাজা বলল—

গান

রাজা। শূন্য শূন্য শূন্য
কোথায় আমার শূন্য!

শূন্য ছাড়া সব কিছু মোর
লাগছে যে ভাই শূন্য ॥
এক দুই তিন চার
পাঁচ ছয় সাত আট নয়
আর নয়, আর নয়
শূন্য আমার চাই
কোথায় তাকে পাই !
শূন্য আমার কোথায় গেল
তোমরা সবাই জান ?
যাও চলে যাও তোমরা সবাই
খুঁজে তাকে আনো।

মঞ্চ নির্দেশ

[রাজার গান শেষ হ'তে না হতেই এক থেকে নয় সংখ্যাগুলো শূন্যের খোঁজে মঞ্চের আড়ালে হারিয়ে গেল। মৌ এগিয়ে এল রাজার কাছে।]

মৌ। রাজা, রাজা আমি পেয়েছি শূন্য।

রাজা। তুমি, তুমি কেমন করে পাবে আমার শূন্যকে !

মৌ। কেন এই দেখ [মৌ তার রেজাল্ট বইয়ে আঁকা শূন্য দেখিয়ে দিয়ে] আমি অংকে শূন্য পেয়েছি।

রাজা। কিন্তু আমার শূন্য কোথায় গেল ! তুমি জানো কোথায় আমার শূন্য ?

মৌ। জানি, কিন্তু বলব না। আগে তুমি আমায় আমার একটা প্রশ্নের উত্তর দাও। তুমি যদি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে পারো, তবেই তোমার শূন্যকে খুঁজে এনে দেবো।

রাজা। কী তোমার প্রশ্ন ?

মৌ। রাজা, আমার অংক ভাল লাগে না কেন ?

(রাজা মৌ-এর প্রশ্ন এড়িয়ে যাবার ভান করে)

রাজা। আচ্ছা, তোমার নামটি কি শুনি তো !

মৌ। আমার নাম মৌ।

রাজা। তোমার ক'টা নাম ?

মৌ। আমার একটা না-ম ; না-না আমার দুটো নাম। বাড়িতে মৌ, আর স্কুলে মৌ চাটার্জী।

রাজা। ভারী সুন্দর নাম তো তোমার। আচ্ছা, তোমার নাম লিখতে ক'টা অক্ষর লাগে বলতো !

মৌ। আমার নাম লিখতে? (একটু ভেবে) বাড়িতে (হাতের কর গুণে) মৌ একটা। স্কুলে (কর গুণে) একটা, দুটো, তিনটে চারটে…চারটে। [একটু ভেবে] আচ্ছা রাজা, 'র্জী' অক্ষরকে একটা ধরবো না দুটো ধরবো ! একটা ধরলে চারটে অক্ষর, আর দুটো ধরলে পাঁচটে।

রাজা। তুমি তো বেশ অংক জানো।
আচ্ছা অংকতো তোমার ভাল লাগেনা, কী তোমার ভাল লাগে ?

মৌ। আমার ! নাচতে ভাল লাগে, গান গাইতে ভাল লাগে। ছড়া পড়তে, ছবি আঁকতে, আবৃত্তি করতে, ইতিহাস, ভূগোল, বাংলা, ইংরেজী সব পড়তে ভাল লাগে। কিন্তু [একটু ভেবে] অংক করতে ভাল লাগে না। দেখ, দেখ [রেজাল্ট বই দেখিয়ে] আমি সব বিষয়ে ভাল নম্বর পেয়েছি। শুধু অংকে…। রাজা, রাজা আমার না মজা করতে খুব ভাল লাগে।

রাজা। মৌ তুমি নাচতে পারো? আমার না নাচ দেখতে ভারী ভাল লাগে। তুমি আমায় একটু নেচে দেখাও না!

মৌ। এই ক'দিন আগে মা না আমায় নাচের স্কুলে ভর্তি করে দিয়েছিল। একটু একটু নাচ শিখেও ফেলেছি এর মধ্যে দেখবে, দেখবে আমার নাচ?

এক দুই তিন চার
পাঁচ ছয় সাত আট
নয় দশ এগারো বারো
তের চৌদ্দ পনেরো ষোলো।

রাজা। বাঃ বাঃ তুমি তো ভারী সুন্দর নাচতে পারো। কিন্তু মৌ, এ নাচ তো অংক দিয়ে বাঁধা। এক, দুই, তিন, চার কেমন সুন্দর নাচ তৈরী করেছে, ওদের তোমার ভাল লাগেনা! আচ্ছা মৌ, বলতো এক পায়ে দাঁড়িয়ে আছে কে?

মৌ। এক পায়ে, এক পায়ে! [চারিদিক দেখে] কেন গাছ।

রাজা। ঠিক বলেছো, মৌ ঠিক বলেছো।
আচ্ছা, বলতো দুপায়ে কে দাঁড়িয়ে আছে?

মৌ। দু'পায়ে! কেন, আমি, তুমি।

রাজা। বেশ বলেছো। আচ্ছা মৌ, তোমার ক'টা নাক আছে বলতো?

মৌ। আমার একটা নাক।

রাজা। আচ্ছা তোমার ডান হাতেই বা ক'টা আঙ্গুল, আর বাঁ হাতেই বা কটা?

মৌ। [প্রথমে ডান হাত পরে বাম হাত তুলে] আমার ডান হাতে পাঁচটা আর বাঁ হাতে পাঁচটা।

রাজা। দু'হাতে, দু'হাতে কটা আঙ্গুল?

মৌ। দু'হাতে! [হাত তুলে] পাঁচটা আর পাঁচটা দশটা।

রাজা। বাঃ বাঃ তুমি কেমন সুন্দর অংক জানো। আচ্ছা মে তুমি গান জান? আমার না গান শুনতে ভারী ভাল লাগে। তুমি আমায় একটা গান শোনাবে?

মৌ। গান, গান! এখন ও ভাল করে শিখিনি। শুধু একটা গান শিখেছি শুনবে, শুনবে রাজা!

(মৌ গাইতে লাগল)

মস্ত বড় বাঘ
বইয়ের পাতায় ঘুমিয়ে থাকে
নেই কোন তার রাগ।
(সে) মস্ত বড় বাঘ॥
খেতে দিলে খায় না কিছু
ছোটেনা সে কারো পিছু
হলুদ কালো রঙ্ দিয়ে তার
গায়ে আঁকা ডোরা ডোরা দাগ।
(সে) মস্ত বড় বাঘ॥
বাঘটি আমার বেজায় ভালো
ভয় করে না দিনের আলো
আমার দিকে তাকিয়ে থাকে
নেই মুখে তার ডাক।
(সে) মস্ত বড় বাঘ॥

রাজা। বাঃ বাঃ তুমি তো সুন্দর গাইতে পারো। আচ্ছা মৌ, তোমার কটা বাঘ? তোমার বাঘের গায়ে কটা ডোরা ডোরা দাগ আছে জানো!

মৌ। আমার ওই একটা বাঘ। আমি গুণে দেখেছি রাজা।

আমার বাঘের গায়ে না সাতটা ডোরা ডোরা দাগ আছে। ভারী ভাল আমার বাঘটা। দেখতে ভারী সুন্দর। কী সুন্দর রঙ্ তার! আমার বইটা খুলে রোজ আমি তাকে দেখি।

রাজা। আচ্ছা মৌ, তুমি জ্যান্ত বাঘ দেখেছো?

মৌ। একবার চিড়িয়াখানায় গিয়েছিলাম সেখানে দেখেছি। আমাদের এখানে সার্কাস হয়েছিল, সেই সার্কাসে বাঘের খেলা দেখেছি।

জানো রাজা, ওদের আমার একটুও ভাল লাগে না, ওরা কেমন করে তাকায়। কেমন ডাকে। আমার ভয় করে।

রাজা। চিড়িয়াখানায় ক'টা বাঘ আছে বলতো? আর সার্কাসে সার্কাসে ক'টা বাঘের খেলা দেখেছো?

মৌ। চিড়িয়াখানায়! চিড়িয়াখানায়···তেরোটা। সার্কাসে, সার্কাসে! দুটো, দুটো, ছুটছিল আর লাফ দিচ্ছিল। আমার সেদিন কী ভয় করছিল। যদি লাফ দিয়ে আমাদের দিকে চলে আসে! রাংলুর কী সাহস জানো রাজা! রাংলু না উঠে দাঁড়িয়ে হাতে তালি দিচ্ছিল,— আর চীৎকার করে বলছিল—বেড়ে মজা, বেড়ে মজা। আচ্ছা রাজা, বাঘটা যদি রেগে তেড়ে আসতো কী হ'তো বলতো! আচ্ছা বাঘটা রেগে আসতে পারে না? রাংলুকে বারণ করলে বলে—দিদি তুই বড্ড ভীতু!

রাজা। আচ্ছা মৌ, সব মিলে ক'টা বাঘ দেখেছো? চিড়িয়াখানায় সাদা বাঘ দেখনি?

মৌ। সব মিলে, সব মিলে! চিড়িয়াখানায় তেরটা আর সার্কাসে দু'টো। হাতের করগুণে তের, চৌদ্দ পনেরোটা। না না

ষোলটা। পনেরোটা জ্যান্ত বাঘ আর আমার বইয়ের শান্ত বাঘটা। জানো রাজা, চিড়িয়াখানায় না দুটো সাদা বাঘ আছে। বড় বড় দুটো বিড়ালের মতো। ভারী সুন্দর দেখতে।

রাজা। আচ্ছা ওই দুটো সাদা বাঘ বাদে কটা বাঘ দেখেছো, বলতো!

মৌ। কেন, ষোলটা বাঘ থেকে দুটো সাদা বাঘ বাদ দাও। (হাতের বার গুণে) ষোলটা বাঘ থেকে দুটো সাদা বাঘ বাদ দিলে, বাদ দিলে [একটু ভেবে] চৌদ্দটা, চৌদ্দটা।

রাজা। বাঃ বাঃ তুমি তো দেখছি যোগও জান, বিয়োগও জান। আচ্ছা মৌ তোমার মাথায় কটা চুল আছে বলতো ?

মৌ। কী যে বল রাজা! মাথার চুল গোনা যায় নাকি! আমার মাথায়, আমার মাথায় কত চুল! অনেক অসংখ্য।

রাজা। ঠিক বলেছো।

আচ্ছা মৌ, রোজ রোজ তো সূর্য ওঠে। দিনের আলো ছড়িয়ে দেয় পৃথিবীর বুকে। ক'টা সূর্য আছে বলতো ?

মৌ। কেন একটা সূর্য। ওমা তুমি এও জাননা! তুমি ভূগোল পড়নি ? ভূগোলে আছে মহাশূন্যের মধ্যে সূর্য আছে, আর তার চারিদিকে পৃথিবী ঘুরছে। [একটু ভেবে] জানো রাজা, মহাশূন্য বলতে গিয়ে আবার (রেজাল্ট বই দেখে) শূন্যের কথা মনে পড়ে গেল।

আচ্ছা রাজা, আমার অংক ভাল লাগে না কেন ?

রাজা। অংক ভাল লাগে না ? কে বলেছে তোমার অংক ভাল লাগে না! গান গাইতে ভাল লাগে ? তোমার গানে একটা বাঘ তার গায়ে সাতটা ডোরা ডোরা দাগ। তার ছন্দ

কেমন সুন্দর অংক দিয়ে বাঁধা। সুর তার অংক দিয়ে বাঁধা। নাচ! নাচ অংক দিয়ে বাঁধা। ভূগোল? ভূগোলে অংক। চারিদিকে অংক। তোমার মধ্যে অংক, আমার মধ্যে অংক। সব কিছুর মধ্যে অংক। মৌ মৌ চারিদিকে চেয়ে দেখ, শুধু অংক আর অংক। খেলতে যাও অংক, পড়তে যাও অংক। সব কিছুতে অংক। পৃথিবীটা ঘুরছে অংকের তালে তালে। সময় চলছে অংকের তালে। ওই আকাশে অংক—এই মাটিতে অংক। চারিদিকে শুধু অংক আর অংক। সব কিছুতে অংক আছে ছড়িয়ে। তোমার অংক ভাল লাগেনা? তাহলে বল, এদের কাউকে ভাল লাগেনা। তোমার নাচ, গান, খেলা, চিড়িয়াখানা, সার্কাস, তোমার বাঘ, ইতিহাস, ভূগোল, গাছপালা, ফুল, ফল কোন কিছু ভাল লাগে না?

মৌ। একটু ভেবে না-না রাজা, আমার ওই অংকের বইটা ভাল লাগে না। ওর মধ্যে শুধু যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ দশমিক ভগ্নাংশ আরও কত কিছু। আমার একটুও ভাল লাগে না।

রাজা। আচ্ছা মৌ, তুমি তোমার অংকের দিদিমণিকে বলনি, কেন তোমার অংক ভাল লাগে না?

মৌ। হ্যাঁ। দিদিমণি বলেছে অংক করলেই নাকি অংকের মজা পাওয়া যায়। তখন শুধু অংক করতেই নাকি ভাল লাগবে।

কিন্তু রাজা, আমার আমার অংক করতেই ভাল লাগে না।

রাজা। তোমার তো মজা করতে ভাল লাগে। বেশ চলো, তোমাকে মজার দেশ ঘুরে ঘুরে দেখাই। ওই মজার দেশে

তুমি তোমার প্রশ্নের উত্তর তুমি নিজেই খুঁজে বার করতে পারবে। চলো, চলো মজার দেশে চলো। একটু ভেবে কিন্তু মৌ! শূন্য ছাড়া মজায় দেশে যাব কেমন করে! তুমি আমার শূন্যকে ফিরিয়ে দাও।

মৌ। না না রাজা। আগে তুমি আমাকে মজার দেশে নিয়ে চল। অংকের মজা খুঁজে পেলে আমি তোমার শূন্যকে ফিরিয়ে দেব।

রাজা। কিন্তু মৌ, আমরা ত ন'পা এগিয়েই থেমে যাব। শূন্য না এলে দশ হবে কেমন করে! মজার দেশে পৌছাব কেমন করে! সে দেশ যে অনেক দূর! শূন্যকে তুমি নিয়ে এস। মজার দেশে অংকের মজা খুঁজে না পেলে শূন্যকে তুমি নিয়ে যেও। যে অংকমালার দেশে ছোট্ট শিশুরা মজা খুঁজে পাবে না, সে দেশের রাজা হয়ে কী করব আমি, আমিও যে মজা করতে ভালবাসি মৌ।

মৌ। বেশ আমি তোমার শূন্যকে ফিরিয়ে দিচ্ছি। তুমি আমাকে মজার দেশে নিয়ে চল, যেখানে আমি খুঁজে পাব অংকের মজা।

(মৌ দর্শকের কাছে এগিয়ে গিয়ে অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের দিকে লক্ষ্য করে)

শূন্য, শূন্য তুমি একটি বার চলে এসো। তুমি না এলে আমি মজার দেশে যাব কেমন করে! রাজা বলেছে, ওই দেশেই নাকি লুকিয়ে আছে অংকের মজা!

মঞ্চ নির্দেশ

অন্ধকার প্রেক্ষাগৃহের দর্শকদের মাঝ থেকে শূন্য মঞ্চে উঠে এল। রাজা শূন্যকে দেখে খুশি হয়ে বলল—

রাজা। শূন্য, শূন্য! তুমি কোথায় ছিলে শূন্য! তোমাকে হারিয়ে আমার সব কিছু শূন্য লাগছে শূন্য!

শূন্য।

গান

রাজা রাজা বল রাজা
কী আছে মোর দাম
শূন্য সাজার মূল্যে আমার
এই কী পরিণাম
আমার নেই নেই যে কোন দাম!
বল বল বল রাজা
শূন্য কী মোর ব্যর্থ সাজা
ছোট্ট শিশুর কাছে আমার
নেই যে কোন দাম।
সাথী হারা শূন্য আমি
কেউ বলে না শূন্য দামী
সংখ্যা লিপির মাঝে তবে
কেন হল আমার আবিষ্কার!
আজকে তুমি বলো রাজা
বলো পরিষ্কার।
মূল্যহারা হয়ে আমি
করবো নাকো কাজ

শূন্য মাঝে হারিয়ে যাব
ঘুচাব মোর শূন্য লাজ।
বলতে যদি না পারো রাজা
কী আছে মোর দাম,
থাকবো না আর তোমার দেশে
কোর নাকো শূন্য নাম॥

রাজা। শূন্য, শূন্য! কে বলেছে তোমার দাম নেই! এই ভারতবর্ষেই তোমার জন্ম। এই ভারতেই তোমার প্রথম আবিষ্কার। এখান থেকেই তুমি ছড়িয়ে পড়লে দেশ বিদেশে। অংক-মালার দেশে জ্বাললে তুমি নতুন আলো। তোমায় পেয়ে সবাই হলো কত খুশি।

জানো শূন্য। এই পৃথিবীর সঙ্গে যদি তোমাকে গুণ করে দেই, এই পৃথিবী এক নিমেষে হয়ে যাবে শূন্য। আমার এই সংখ্যা মালার সঙ্গে তুমি গুণ হলে সবাই হয়ে যাবে শূন্য। আমি রাজা, তোমার সঙ্গে আমার গুণ হলে আমি নিমেষে হয়ে যাব শূন্য। গোটা অংকমালার দেশ হয়ে যাবে শূন্য। তোমার দাম নেই!

তুমিই তো আমার এগিয়ে চলার গান। তুমি না এলে ওই স্কুলগুলোর ক্লাস নয়, নয় হয়ে থাকতো। এই পৃথিবীটা নয় মূহুর্ত ঘুরে থেমে থাকতো। তুমি এসেই তো দশ করো। দশে দশে এগিয়ে চল অংকমালার দেশে। যা কেউ পারে না, তা তুমি করতে পারো। নিমেষে সবাইকে করে ফেলতে পারো শূন্য। তোমারই তো সেরা দাম শূন্য। তোমার দাম নেই!

শূন্য। (খুশি হয়ে) রাজা, রাজা আমার এত দাম! এত দাম!

শূন্য।

গান

(জানো) আমার কত দাম!
(আমার) নাই বা থাকুক নাম।
আমার গুণে সবই আমি
শূন্য গুণে শূন্য দামী
এর যে কত দাম
(আমার) নাইবা থাকুক নাম॥
আমার গুণে শূন্য রাজা
রাজা আমার পাবে সাজা
এ যে নতুন দাম
(আমার) নাইবা থাকুক নাম।
শূন্য যোগে সংখ্যা চলে
শূন্য কথা সবাই বলে
শূন্য পেয়ে সংখ্যাগুলোর
পূর্ণ মনস্কাম।
(আমার) নাইবা থাকুক নাম॥

রাজা। খুশি হয়ে শূন্য, শূন্য! আমাদের ছোট্ট বোন মৌ এর অংক ভাল লাগে না। ওর মজা করতে ভাল লাগে। চল, ওকে মজার দেশ ঘুরে দেখাই। ওই মজার দেশে অংকের মজা হয়ত ও খুঁজে পেতে পারে। চল, চল এগিয়ে চল।

মঞ্চ নির্দেশ

রাজা মৌ এবং শূন্যকে সঙ্গে নিয়ে অংকমজার দেশে এগিয়ে চলল। রাজার গানের তালে তালে ১, ২, ৩,…৯ সংখ্যারা মঞ্চের অপর প্রান্ত থেকে নাচতে নাচতে মঞ্চে এসে হাজির হ'ল এবং যোগ চিহ্নের আকারে দাঁড়িয়ে নাচতে লাগল। রাজা।

গান

এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো এগিয়ে চলো
অংকমালার দেশে শুধু এগিয়ে চলো।
অংকমালার এই দেশে
সবাই আছে সংখ্যা বেশে
খেলছে খেলা ভালবেসে
বলছে অসীম চলার শেষে॥
করছে খেলা ওরা সারা বেলা
খেলছে বসে শুধু অংকের খেলা
তুমি কিন্তু ভাই কোর না হেলা।
সংখ্যাগুলো নিয়ে খেলছে যারা
খুশির খেলায় তারা আপন হারা
যোগ বিয়োগ গুণ ভাগ খেলছে খেলা
গড়ছে বসে শুধু অংক মেলা।
তুমি কিন্তু ভাই কোর না হেলা॥
ওদের কথা শুধু মনকে বল
এগিয়ে চলো শুধু এগিয়ে চলো
চলার পথের সীমার নেই যে শেষ
সংখ্যাগুলো তবু চলছে বেশ
অসীম পথে ওরা দিচ্ছে পাড়ি
অসীম বলেই মোরা অংকে হারি।

সংখ্যাগুলো শুধু এগিয়ে চলছে
এগিয়ে চলার কথা শূন্য বলছে।
তাই তো বলি শোন এগিয়ে চলো
এগিয়ে চলো শুধু এগিয়ে চলো ॥

মঞ্চ নির্দেশ

রাজার গান শেষ হতে না হতেই আবহসঙ্গীতের তালে তালে যোগ (+ মঞ্চে এসে হাজির হোল। নেপথ্য থেকে ভেসে আসা গানের তালে তালে যোগ বলে চলল যোগের কথা—

যোগ। গান

এই পৃথিবীটা যোগের খেলা
বিন্দু বিন্দু জলের যোগে
গড়ে উঠছে সাগর মেলা।
অণু-পরমাণুর যোগে
উঠছে গড়ে বস্তু মেলা ॥
এই পৃথিবী সূর্য যোগে
তাপ উত্তাপ আলোয় বেলা
এই পৃথিবী যোগের খেলা ॥
সময় যোগে আমরা সবাই
হচ্ছি বড়
যোগে যোগে দেশ বিদেশ আজ
হচ্ছে জড়ো।
উড়ো জাহাজ উড়ে বেড়ায়
দেশে দেশে যোগ করে যায়
মানুষ দিয়ে মানুষকে যোগ
করে চলে—
এই পৃথিবী এগিয়ে চলে যোগের ফলে ॥

মঞ্চ নির্দেশ

গানের কথা তালে তালে তিন, যোগ, ছয় পাশাপাশি দাঁড়িয়ে তিন আর ছয় চলে যায় নিজের যায়গায়। নয় এগিয়ে আসে মঞ্চের সামনে। শূন্য এসে দাঁড়ায় যোগের ডান দিকে। শূন্য আবার চলে যায় দূরে—নয় থাকে দাঁড়িয়ে। মঞ্চের বুকে অংকের যোগ হয় এমনি ভাবে।

তিনের সাথে যোগ করি ছয়
দেখো নয়
শূন্য যোগে নয় কিন্তু ভাই
নয়ই রয়
এক কিন্তু ভাই ন'বার যোগে
হলো নয়।
যোগে যোগে নয় কিন্তু ভাই
অসীম হয়
যোগ করতে তোমরা সবাই
কোর না ভয়
যোগ যে শুধু মজার খেলা
যোগ করে যাও যোগ করে যাও
যোগের বেলা।
যোগে যোগে উঠবে গড়ে একতা
আজকে তোমরা নতুন করে শেখোতো
যোগের দেশে যোগ দিয়েছ
জেনো এটা যোগের কথা
যাও চলে যাও বিয়োগ দেশে
দেখবে শুধু বিয়োগ ব্যথা॥

মঞ্চ নির্দেশ

মঞ্চ থেকে যোগ হারিয়ে গেল। নেপথ্য থেকে ভেসে এল এগিয়ে চলার গান। রাজা, মৌ, শূন্য মঞ্চের একপ্রান্ত থেকে হারিয়ে গেল। অপর প্রান্ত থেকে ১, ২, ৩,...৯ সংখ্যারা হারিয়ে গেল। নেপথ্যে এগিয়ে চলার গান চলতে লাগল। আলো ফুটে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে রাজা মৌ, শূন্য মঞ্চে এসে হাজির হোল। অপর প্রান্ত থেকে ১, ২, ৩···৯ সংখ্যারা নাচতে নাচতে মঞ্চে এসে বিয়োগ চিহ্নের আকারে দাঁড়িয়ে পড়ল। বিয়োগ মঞ্চে এসে হাজির হোল। গানের তালে তালে ৯ বিয়োগের ডানদিকে, বামদিকে ৩ ক্ষণকালের জন্য দাঁড়িয়ে আবার নিজের জায়গায় চলে গেল। ছয় এসে দাঁড়াল। শূন্য ডানদিকে দাঁড়াল, শূন্য হারিয়ে গেল। বিয়োগ ৬-এর পাশে এসে দাঁড়াল।

বিয়োগ। (গান) নয় থেকে তিন বিয়োগ হলো

রইলো শুধু ছয়

এতো কঠিন নয়।

শূন্য থেকে বিয়োগ হলে

বিয়োগ সংখ্যা হয়

এতো কঠিন নয়॥

শূন্য থেকে ছয় বিয়োগ হল

হ'ল বিয়োগ ছয়

এতো কঠিন নয়॥

মঞ্চ নির্দেশ

পাঁচ এসে বিয়োগের ডান দিকে এবং এক বাঁ দিকে দাঁড়িয়ে আবার যে যার জায়গায় চলে গেল। চার এসে দাঁড়ালো সেখানে। এমনি ভাবে মঞ্চে বিয়োগ বিয়োগের খেলা দেখাল।

পাঁচ থেকে এক বিয়োগ হলে

থাকবে শুধু চার

বিয়োগ খেলা তোমরা সবাই

দেখো একটি বার।

শূন্য যদি বিয়োগ হয়
কিছুই নয়
সংখ্যাগুলো যেমনি ছিল
তেমনি রয়।
এতো কঠিন নয়॥
তোমরা সবাই চলে গেলে
দুঃখ পাব
বসে বসে এই কথাটা
বিয়োগ ভাব।
মনের থেকে মলিনতা
বিয়োগ কর
দেখবে তখন সব থেকে ভাই
বিয়োগ বড়
ক্ষুদ্রতাকে বিয়োগ করে
দূর করো
বিয়োগ তখন তোমার কাছে
সবার বড়।
এক থেকে এক বিয়োগ হলে
শূন্য রয়
এতো কঠিন নয়॥
তোমায় ছেড়ে পাচ্ছি আমি
আজকে যে ভাই অনেক ব্যথা
যাও চলে যাও গুণের দেশে
শুনবে অনেক গুণের কথা॥

মঞ্চ নির্দেশ

বিয়োগ মঞ্চ থেকে হারিয়ে গেল। বিয়োগের সঙ্গে সঙ্গে ১, ২, ৩,...৯ সংখ্যারাও হারিয়ে গেল। রাজা, মৌ, শূন্য এগিয়ে চলল।

রাজা। মৌ, মৌ এগিয়ে চল। এ দেশ যে শুধু এগিয়ে চলার দেশ।
এগিয়ে চলো, দেখতে পাবে আরও কত মজা ছড়িয়ে আছে
এই মজার দেশে।

মৌ খুশি হয়ে রাজা, শূন্যের সঙ্গে এগিয়ে চলল। রাজা 'এগিয়ে চল', এগিয়ে চল গাইতে গাইতে এগিয়ে চলল। ১, ২, ৩,...৯ সংখ্যারা গানের তালে তালে নাচতে নাচতে মঞ্চে এসে গুণ (×) চিহ্নের আকারে দাঁড়িয়ে নাচতে লাগল।

গুণ। (গান) গুণ যে যোগের এগিয়ে চলা
গুণ করে যাও গুণ করে যাও গুণের বেলা।
গুণ করি বলে নইকো গুণী
এগিয়ে চলার কথা শুধুই শুনি।
গুণে গুণে শুধু এগিয়ে চলা
এ যে যোগের এক নতুন খেলা॥

গানের তালে তালে ৩ এসে দাঁড়াল গুণের ডান দিকে, ২ দাঁড়াল বাঁ দিকে। ৩ আর ২ যে যার জায়গায় চলে গেল। ৬ এসে হাজির হল।

তিন দু'দুবার যোগ না করে
করছি যে গুণ দুই দিয়ে
সংখ্যাগুলো হারিয়ে গেল
খুশি হোলাম ছয় নিয়ে॥
জেনো এটা ভাই গুণের খেলা
গুণ করে যাও, গুণ করে যাও গুণের বেলা॥
খুশির কথা গুণ কর ভাই
জনে জনে
দেখবে খুশি ঘুরছে তখন
সবার মনে।

তাইতো বলি তৈরী করো গুণের মেলা
গুণ করে যাও, গুণ করে যাও গুণের বেলা ॥

মঞ্চ নির্দেশ

গুণ এবং ১, ২, ৩...৯ সংখ্যারা নাচতে নাচতে মঞ্চ থেকে হারিয়ে গেল। এগিয়ে চলার গান গাইতে গাইতে রাজা, মৌ শূন্য এগিয়ে চলল। ১, ২, ৩...৯ সংখ্যারা নাচতে নাচতে মঞ্চে ভাগ চিহ্নের আকারে দাঁড়িয়ে তালে তালে নাচতে লাগল।

ভাগ। (গান) ভাগ বিয়োগের নতুন খেলা
ভাগ করে যাও ভাগ করে যাও
ভাগের বেলা।
ভাগে ভাগে সব কমে যায়
এ কথাটি সবাই জানে
ভাগের কথা ছড়িয়ে আছে
সাম্যবাদের গানে গানে ॥
সমান ভাগের কথা এখন
জেনে রাখো সবাই ভাবে
তা যদি ভাই করতে পারো
জেনো তবে দুঃখ যাবে।
তাইতো বলি তৈরী করো
ভাগের মেলা।
ভাগ করে যাও ভাগ করে যাও
ভাগের বেলা ॥
এই পৃথিবীর বুকে আছে
নানান ভাগে নানান জাতি
দুটি ভাগে ভাগ চলেছে

গড়ে উঠছে দিবা রাতি

এমনি ভাবে চলছে শুধু ভাগের খেলা

ভাগ করে যাও, ভাগ করে যাও ভাগের বেলা ॥

মঞ্চ নির্দেশ

ভাগের ডান দিকে ৮ এবং বাঁ দিকে ৪ এসে দাঁড়িয়ে আবার হারিয়ে গেল। ২ এসে দাঁড়াল সেখানে। এমনি ভাবে মঞ্চে ভাগের খেলা হলো।

আট থেকে চার কোরনা বিয়োগ

দু' দুবার

আট-কে করি চার দিয়ে ভাগ

একটি বার

দুইকে রেখে হারিয়ে গেল

আট আর চার।

শূন্য যদি ভাগ হয় ভাই

সংখ্যা দিয়ে

খুশি তোমায় হতেই হবে

শূন্য নিয়ে।

বড় দিয়ে ছোটকে ভাগ

দেখতে পাবে

(যখন) দশমিক আর ভগ্নাংশের

দেশে যাবে।

মঞ্চ নির্দেশ

ভাগের গান শেষ হতেই ভাগ মঞ্চ থেকে হারিয়ে গেল। তারই তালে তালে ১, ২, ৩...৯ সংখ্যারাও মঞ্চ থেকে হারিয়ে গেল। মৌও খুশি হয়ে তাদের পিছু পিছু এগিয়ে গেল। ওরা সবাই যখন মঞ্চ থেকে হারিয়ে গেল মৌ তখন মুখে হাসি নিয়ে ছুটে এল রাজার কাছে।

মৌ। বাঃ বাঃ ভারী মজার তো যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগেরা,

১, ২, ৩, ৪...সংখ্যারা। ওদের আমার কী ভয় করতো! ওদের আমার একটুও ভাল লাগত না। ওদের দেখলেই আমার মন খারাপ হয়ে যেত। এখন দেখছি এরা ভারী মজার। এরা কত সহজ, কত সুন্দর! জানো রাজা, এদের না আমার খুব ভাল লেগেছে।

রাজা। মৌ মৌ এই মজার দেশে কত মজা ছড়িয়ে আছে। আমার সংখ্যাদের যেমন শেষ নেই ; এই মজারও তেমনি শেষ খুঁজে পাবে না। এগিয়ে চলো মৌ এগিয়ে চলো।

মঞ্চ নির্দেশ

রাজা, মৌ এবং শূন্য এগিয়ে চলার গান গাইতে গাইতে মঞ্চ থেকে হারিয়ে গেল। নেপথ্য থেকে ভেসে চলল এগিয়ে চলার গান। রাজা, মৌ, শূন্য গানের তালে তালে আবার মঞ্চে এগিয়ে চলল। রাজাকে এগিয়ে চলায় বাধা দিয়ে ছুটে এল ভগ্নাংশ $\frac{১}{২}$ ॥

ভগ্নাংশ $\frac{১}{২}$। (গান) রাজা রাজা অংকমালার রাজা
আমায় নতুন করে সাজা
আমি থাকব না আর এই বেশে
কেউ ডাকে না আমায় ভালবেসে।
এমন বেশে রেখে আমায়
দিসনে আর সাজা
রাজা রাজা অংকমালার রাজা
আমায় নতুন করে সাজা।
ভগ্নাংশের এই উপর নীচে সাজা
না না না আমি চাইনেত আর রাজা
আমায় নতুন করে সাজা।
রাজা রাজা অংক মালার রাজা।

রাজা। আমি নিয়ম গড়ার রাজা ; নিয়ম ছাড়া কিছু যায় না করা। ভাগের নিয়ম আছে আমার কাছে। কিন্তু ছোটকে বড় দিয়ে ভাগ করার নিয়ম'ত এখনও হয়নি গড়া। নতুন করে তোমায় সাজাব কেমন করে! তুমি পথ ছাড়ো ভগ্নাংশ। দেখছনা মৌ-কে নিয়ে অংকমজার দেশে এগিয়ে চলেছি।

ভগ্নাংশ $\frac{2}{3}$। (রাজাকে বাঁধা দিয়ে ভগ্নাংশ $\frac{2}{3}$ আব্দারের সুরে বলল—)

না না না অংকমালার রাজা
আমায় নতুন করে সাজা।

মৌ। আচ্ছা রাজা! তুমি তো রাজা। তুমি তো সব পার। ওকে একটা নতুন জামা দিতে পার না। রাজা, রাজা তুমি ওকে একটা নতুন জামা পরিয়ে দাও।

রাজা। না না মৌ আমি নিয়ম ছাড়া কিছুই পারিনা করতে। ভাগের নানান নিয়মের মজাতো তুমি দেখলে। কিন্তু ছোটকে বড় দিয়ে ভাগ, তার নিয়ম, তার নিয়ম! (চিন্তিত ভাবে পায়চারী করতে লাগলো)

মঞ্চ নির্দেশ

'রাজা দশমিকের' কণ্ঠস্বর শুনতে পেয়ে ফিরে তাকালো রাজা। শূন্য বেষ্টিত রাজা দশমিক অপর প্রান্তে মঞ্চে হাজির হয়ে গানের তালে নেচে নেচে রাজাকে বলল—

রাজা দশমিক। (গান) বলছি তোমায় আজকে রাজা
বলছি তোমায় ধিক,
আমি রাজা দশমিক ॥
দশের প্রথায় চলছে হিসাব
চেয়ে দেখো চারিদিক।
নিয়ম গড়ার কাজে তুমি
দিচ্ছ কেন ফাঁকি ?

আমার প্রচার করতে হবে
নেই যে সময় বাকী।
তাই তোমায় বলছি রাজা
আজকে তোমায় ধিক্।
একেকে ডাকো, ভাগকে ডাকো
দুইকে ডাকো পরে,
শূন্য এসে ভাগ মিলাবে
দশমিকের বরে।
ভগ্নাংশের রূপ বদলে
নিয়ম দেখ ঠিক,
আমি রাজা দশমিক ॥

রাজা। বেশ রাজা দশমিক, ছোটকে যদি বড়র সমান করে দিতে পারো বা ছোটকে যদি বড়র বড় করে দিতে পারো তাহলে আমি ভাগ করে দিতে পারি এক নিমেষে। ভাগের নিয়ম তো আমার কাছে। তাহলে মেনে নিতে পারি তোমাকে।

মঞ্চ নির্দেশ

রাজা দশমিকের গানের তালে তালে এক, ভাগ, দুই এসে পর পর দাঁড়াল। রাজা দশমিকের ডাকে শূন্য এসে এক এর পাশে দাঁড়াতেই সবাই গেল হারিয়ে। ছুটে এল পাঁচ, দাঁড়িয়ে পড়ল রাজা দশমিকের বাঁ দিকে।

রাজা দশমিক। (গান) আয় চলে আয় এক
আয় চলে আয় ভাগ
দুই চলে আয় পরে
শূন্য এসে ভাগ মিলিয়ে যা
দশমিকের বরে।

ভগ্নাংশ $\frac{১}{২}$।

(ভগ্নাংশ $\frac{১}{২}$ তাই দেখে খুশি হয়ে রাজাকে বলল—)
রাজা, রাজা! এই সাজটা ভারী সুন্দর! তুই আমায় এই সাজটা পরিয়ে দে রাজা, এই সাজটা পরিয়ে দে।

মঞ্চ নির্দেশ

রাজা ভগ্নাংশের জামা খুলে দিতেই দ্বিতীয় জামায় দেখা গেল ৫ অক্ষর, ভগ্নাংশ তার নতুন সাজ দেখে খুশি হোল।

ভগ্নাংশ $\frac{১}{২}$। (খুশি হয়ে) রাজা, রাজা আমার এই নতুন সাজে নতুন নাম কী হোল?

রাজা। ভগ্নাংশ, এখন হলে তুমি দশমিক পাঁচ। দশমিক পাঁচ তোমার নাম।

মঞ্চ নির্দেশ

দূরে অপর প্রান্তে রাজা দশমিক মঞ্চে হাজির হয়ে গর্বের হাসি হাসতে লাগল। 'রাজা দশমিককে' লক্ষ্য করে রাজা রেগে বলল—

রাজা। রাজা দশমিক, রাজা দশমিক! এ ভাগ তো মিলে গেল। মেনে নিলাম তোমাকে। কিন্তু যখন ভাগ মিলবে না, তখন, তখন কী হবে?

রাজা দশমিক। যতদিন তোমার ভাগ মিলবে না, ততদিন আমি একটি একটি করে শূন্য দিয়ে তোমার ছোট সংখ্যার আকারকে বড় করে রাখব। তুমি ভাগ করে যাবে। ভাগের নিয়মত তোমার কাছে।

রাজা। কিন্তু রাজা দশমিক, আমার সংখ্যারা যে অসংখ্য।

রাজা দশমিক। রাজা, আমার শূন্যরাও যে অসংখ্য।

মঞ্চ নির্দেশ

শূন্যরা মঞ্চের এ প্রান্ত থেকে ও প্রান্তে নাচতে নাচতে হারিয়ে গেল। সঙ্গে সঙ্গে রাজা দশমিকও গেল হারিয়ে।

রাজা। মৌ, মৌ এমনি কত মজা দিয়ে গড়া এই অংকমালার দেশ। মৌ এগিয়ে চল। এই মজার দেশের কী শেষ আছে!

মঞ্চ নির্দেশ

রাজা, মৌ, শূন্য, দশমিক পাঁচ রাজার এগিয়ে চলার গানের তালে তালে এগিয়ে চলল। মঞ্চ অন্ধকার হয়ে গেল। অন্ধকার মঞ্চে ১, ২, ...৯, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ, রাজা দশমিক পাঁচটি শূন্য যে যার জায়গায় দাঁড়িয়ে পড়ল। নেপথ্য থেকে এগিয়ে চলার গান ভেসে এল। আলো ফুটে উঠতেই সবাই মজার গান গাইতে লাগল। রাজা, মৌ, শূন্য, দশমিক পাঁচ মঞ্চে এসে হাজির হোল। রাজা শূন্য, দশমিক পাঁচ সবাইর সঙ্গে মজার নাচ, গান করতে লাগল। মৌ কিছুক্ষণ অবাক হয়ে সবাইকে দেখে সবার সঙ্গে সেও নাচতে লাগল খুশি হয়ে।

১, ২, ৩,...৯, শূন্য, রাজা, রাজা দশমিক, দশমিক পাঁচ, যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ সবাই।

গান

মজা মজা মজা
আমরা সবাই মজা।
অংকমালার দেশে
আমরা শুধুই মজা।
এক দুই তিন
চার পাঁচ ছয়
সাত আট নয়
আর কোর না ভয়।
চেয়ে দেখো আমরা সবাই
মজা দিয়ে সাজা।

আমরা সবাই মজা ॥
শূন্য আমি ভাই
মজার গান গাই।
আমি নিয়ম গড়ার রাজা
নিয়ম গড়ে গড়েই আমার
নতুন করে সাজা।
আমি নিত্য নতুন মজা।
যোগ, বিয়োগ, গুণ, ভাগ
তোমরা আর কোরনা রাগ
তোমরা সবাই যোগ দিয়েছ
এই তো যোগ।
মোদের ছেড়ে চলে যাবে
এই তো বিয়োগ।
গুণে গুণে এগিয়ে চলে
ভাগে ভাগে দেখো মোদের
নতুন নতুন সাজা।
মজা মজা মজা ॥
দশমিক যে ভগ্নাংশের
নতুন রূপে সাজা
শূন্য দিয়ে গড়লো আমায়
দশমিকের রাজা
মজা মজা মজা ॥

মঞ্চ নির্দেশ

মৌ মঞ্চের মাঝখানে এসে দর্শকদের দিকে পিছন ফিরে মঞ্চের সবাইকে চীৎকার করে খুশিতে বলে উঠল। সঙ্গে সঙ্গে মঞ্চের সবাই পাথরের মূর্তির মত স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল যে যার জায়গায়। আবহ সংগীত থেমে গেল। শুধু শোনা গেল মৌ-এর কণ্ঠস্বর।

মৌ। শোন, শোন তোমরা সবাই শোন। শোন শূন্য, শোন রাজা আমি অংকের মজা পেয়ে গেছি। আমি আমার প্রশ্নের উত্তর খুঁজে পেয়েছি। কী মজা!

মঞ্চ নির্দেশ

মৌ দর্শকদের দিকে ঘুরে দাঁড়াল। এগিয়ে এল দর্শকদের কাছে। দুহাত তুলে খুশি হয়ে দর্শকদের বলল—

মৌ। তোমরা সবাই শোন, অংকের মজা পেয়ে গেছি আমি। এবার থেকে অংকে ১০০ পাবই পাব। তোমরাও পাবে। কী মজা!

মঞ্চ নির্দেশ

'কী মজা' বলার সঙ্গে সঙ্গে নেপথ্য ভেসে এল মজার গান। সবাই আবার নাচতে লাগল। মৌও তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে খুশিতে নাচতে লাগল।

সবাই। (গান) মজা মজা মজা
আমরা সবাই মজা
অংক মালার দেশে
আমরা শুধুই মজা ॥

যবনিকা